সুতীর্থ

জীবনানন্দ দাশ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ: পৌষ, ১৩৭৩

প্রকাশক:
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক:
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ: সত্যজিৎ রায়

এক

লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন হয় ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নেড়ে-চেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি—কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখ বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে কোনো অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড় জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজে অনেক দিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে, চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সময় যে না থাকে তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন। পিতৃপুরুষ কোনো দিক দিয়েই এমন কোনো সংস্থান

করে যান নি সুতীর্থের জন্যে যে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ফিরে মন তার সমস্ত দিনের অপব্যবহার ও সমস্ত রাতের দুশ্চিন্তার সংযোগগুলোকে দু চার মুহূর্তের জন্যে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে শিল্প-সাহিত্যের আলো আসে মনে, লিখলেও তা হয়ে দাঁড়ায় যা চাওয়া যায় মোটামুটি তাই। এ কি সম্ভব কখনও? এক আধবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখেছে সে, টের পেয়েছে ক্ষমতা আছে কিন্তু অনেক সহিষ্ণুতার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দু-চার লাইন লিখবার পরেই তাকে অনুভব করতে হয়েছে যে সে একা মানুষ নয় আজ আর, যা লিখেছে সে তা আত্মরতি, কুঁড়ে গোরুর গল্প, এতে চলবে না, এরকম অপবাদ শুনতে হবে তাকে সাহিত্যের নানারকম অপ্রাসঙ্গিক দ্বারপালদের কাছ থেকে ; ওসব অবিশ্যি গ্রাহ্য করে না সে, কিন্তু তার নিজের মনও গ্রাহ্য করছে না যেন আজকাল তার নিজের লেখাকে। তার নিবিদ মন কি বলছে? বুঝতে পারছে না সে। কোনো জিনিস রয়েছে সারাৎসার মন বলে?

'কি হয়েছে, সুতীর্থ?'

'এই যে চা খাচ্ছি।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে—'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'একটু গরম চা পেলেই ভালো হত, মণিকা দেবী, গলায় একটু ব্যথা মনে হচ্ছে—'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চা গরম করে দিতে বলছি। তুমি এই চা-টাই খাবে তো।'

এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে সুতীর্থ বল্লে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাব। কাপসুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন চা তৈরি করে দেবে রামচরণ? আজকাল এক পেয়ালা চায়ের দাম তো—'

'আচ্ছা, আমিই উঠি, নিয়ে আসি ঠিক ক'রে। উনুনে কিছু চড়েছে নিশ্চয়, সেই তো মুশকিল; তুমি বড় দেরি করে ফেল ঘুম থেকে জেগে উঠতে—' বলে মণিকা দেবী বসেই রইলেন তবু।

বল্লেন, 'আমার বাড়ির ভাড়াটা, সুতীর্থ—'

'দিচ্ছি। আমারই দোষ হয়েছে। ও মাসেরটা দেওয়া হয়নি বুঝি। এ মাসও তো ফুরিয়ে এল প্রায়। তা ছাড়া আগের আট দশ মাসেরও বাকি আছে, সেগুলো পরে দেব। টাকা যে নেই তা নয়, কিন্তু—'

চায়ের কাপটা ছিল পুরোনো একটা খুব সম্ভব টিক কাঠের চেয়ারে ; কাপটাকে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে মণিকা বল্লেন, 'এইখানেই বসি। গিঁট ধ'রে গেছে রে বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। বড্ড শীত পড়েছে আজ—'

বসে পড়তে পড়তে কিছুটা সময় লাগল দোহারা বিলাসী শরীরের মানুষটির। চেয়ার উল্টে পড়েছিল প্রায়, সামলে নিতে গিয়ে চায়ের কাপটা হঠাৎ মণিকা মজুমদারের পায়ের ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে গড়াতে লাগল।

'ও কিছু না, হকচকিয়ে যেও না তুমি। ঠিক করছি—আমি ঠিক করছি সব—' বলে সুতীর্থ পা বাড়িয়ে পেয়ালাটাকে একটু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল মাত্র। কাপটা আগে ভাঙে নি, এবারেও ভাঙল না, ভাঙলেও কারুর কিছু এসে যেত না : এমনই চা চায়ের কাপ চায়ের নেশার শীতের সকাল সুতীর্থ গুপ্তের ভাড়াটে ঘরে।

'তোমার কপালে চা নেই, সুতীর্থ—'

মণিকা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন। বয়স তাঁর চল্লিশ হয়েছে ; চেহারা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিরে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়ি পঁচিশে। অথচ সত্যিই বয়স হয়েছে : তেমনি মর্যাদা , চল্লিশটাই ঠিক, কুড়ি-পঁচিশের ইচ্ছাস্বর্গ যেন ঘিরে রয়েছে তাঁকে—খুশিমতন ঢুকে পড়লেই হয়।

'আগের দশ মাসের হিসেব পরে হবে, তা ছাড়া তোমার তিন মাসের ভাড়া বাকি।'

সুতীর্থ মেঝেব ওপর চায়ের ছড়াছড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বল্লে, 'তাই বুঝি। তা হবে। হিসেব তোমারই ঠিক তো।'

'কেন, তোমার খেয়াল নেই ? কাকে কি দিতে হবে সেটা ভুলে গেলে মন অবিশ্যি বেশ ঝাড়াঝাপ্টা থাকে। কেউ কেউ স্বভাবতই ভুলে যায়—তারাই জ্ঞানী কবি। অন্যদের টনটনে বুদ্ধি আছে বলেই তারা ভোলে। সুতীর্থ, তুমি যে তিন মাসের ভাড়া দাও নি সেটা যে লুকোচুরি করে দাও নি তা' আমি বলতে চাই না। সত্যিই তোমার খেয়ালই নেই হয়তো। কিন্তু—'

মণিকা সুতীর্থের শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন ; বোতামের ওপরের মানুষটির মুখের দিকে সহসা তাকাতে গেলেন না আর।

'কবি, জ্ঞানীর জাত আলাদা, তোমার মতন নয়।'

'কি রকম ?'

'সে আরেক দিন বুঝিয়ে দেব।'

তোমার মুখে শুনে ভালো লাগবে, জ্ঞান বাড়বে ; বোলো একদিন ; এখন এই হিসেবটা বুঝে নাও।' বলতে বলতে সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে যে টাকাটা মণিকার হাতে দিল, তাতে পুরো দু মাসের ভাড়াও দেয়া হয় না।

'এখুনি রসিদ দিতে হবে ?'

'দিয়ে দেবে যখন সুবিধে হবে, এখুনি কি দরকার।'

'দু মাসের ভাড়ার রসিদ দেব ? পনেরো টাকা বাকি রইল যে।'

'দিয়ে দেব টাকাটা—আজ কালই—'

'উঠি সুতীর্থ।'

'আচ্ছা, এসো।'

দু পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ, আজকাল লিখছ-টিকছ না ?'

'না তো।'

'কেন ?'

'যখন আবার লিখব—তখন বলব তোমাকে।'

'কবে লিখবে আর ?'

'এই পালাটা শেষ হলে।'

'হেঁয়ালির মতো কথা বলছ। পালা ? কিসের পালা ?'

'আছে একটা', সুতীর্থ বল্লে, 'সেও পরে বলব তোমাকে মণিকা-দি।'

'আমি দিদি হলাম কি হিসেবে—আমি তো তোমার চেয়ে ছোট।'

'বয়সের উনিশ-বিশ আছে আমাদের। কিন্তু বয়সটা তো খুব সামান্য জিনিস। অন্য সব দিক রয়েছে।'

মণিকা সোজা সুতীর্থের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তুমি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আইবুড়ো, তোমার বয়স পঁচিশ, অফিসের মাইনে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মিছে কথা তো সব সুতীর্থ। তোমার শ্বশুড়বাড়ি তো পাশগাঁয়ে।'

সুতীর্থ ছেঁড়া সোফাটার এক কিনারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'পাশগাঁ আমাকে টানে না তা তো তোমাকে বলেছি।'

'টানে না, ফি মাসে অফিসের মাইনেটা সেখানে যাচ্ছে তো।'

'টাকা না পাঠালে কি খাবে তারা ?'

'তারা ক জন ?'

'আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটি—'

মণিকা কোনো কথা বল্লেন না কিছুক্ষণ, দেয়ালে হাত লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বল্লেন, 'কোথায় চলেছি ? বড় অন্ধকার তোমার ঘরটা—'

'জানালা খুলে দিচ্ছি। বোস, মণিকা দি।'

'না, থাক।'

'কাল সারারাত হাঁপানির বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি অংশুবাবুর ?

'না, কেন ?'

'ভাবছিলুম রুগীর শিয়রে বসে বসে শরীর এলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন কাহিল দেখাচ্ছে—'

'ভাল আছেন। এমনিই ঘুম হয় নি আমার।'

'ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে।'

'দেখি আরো দু এক দিন ; না হলে ওষুধ খাব। কি ওষুধ আছে তোমার কাছে : খুব কড়া ? বিলিতী ?'

মণিকা ওপরে চলে যাবেন, না কিছুক্ষণ বসে কাটাবেন ভেবে দেখছিলেন।

'রসিদ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু পুরো দু মাসের হিসাব দিতে পারব না।'

'পনেরো টাকা বাকি , আচ্ছা, এক মাসের রসিদ দিলেই হবে।'

চলতে চলতে মণিকা বললেন, 'একটা কথা আমি ভাবছি। পঁয়তাল্লিশ টাকায় চারখানা ঘর তোমাকে আমি দিয়েছি। তিন বছর তুমি আছ। এ চারখানা ঘরের জন্যে দুশো আড়াই শো টাকা পেতে পারি আমি আজ ; তা ছাড়া হাজার চারেক টাকা সেলামী তো দেবেই।' মণিকা কথা বলতে বলতে থেমে দাঁড়ালেন। 'বুঝলে, সুতীর্থ ? এত কমে তোমায় আমি কেন দেব ? চার চারটে ঘর তুমি আমার আটকে রেখেছ। অন্য কোথাও দেখ তুমি এখন। আমার কি টাকার দরকার নেই ?'

'বাড়ি পাচ্ছি না তো কোথাও।'

'খুঁজে দেখেছ ?'

'আমার নিজের বড় দুধেল গাইটা হারিয়ে গেছে আমি খুঁজব না ? দিন রাত তো এই নিয়েই আছি।'

'ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো আর কোনো আয় নেই। লেনদেনের

কারবার নেই। বাজার খরচ চলছে না। বাড়ির অভাবে মানুষ কলকাতার ফুটপাতে নাকে খৎ দিচ্ছে আজ। ডাশা ভেঙে যাচ্ছে নাকের। হাঘরে কুষ্ঠে খসে পড়ছে।'

বলতে বলতে মণিকা ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ি ভাড়ার রসিদ এল—পুরো দুমাসেরই রসিদ কেটেছেন পনেরো টাকা বকেয়া নেই। রসিদটা হাতে নিয়ে সুতীর্থ পা দুটো টেবিলের ওপর চড়িয়ে দিয়ে দূরে একটা তেতলা বাড়ির ছাদে লাল ট্যাঙ্কের ওপর এক ঝাঁক কাকের ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মণিকা দেবীর চাকর রসিদগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে, আগের মত অমলাকে পাঠায় নি সে।

দুই

বিকেলটা কাটছিল বিরূপাক্ষদের আড্ডায়। বিরূপাক্ষ লোহালক্কড় কাপড় চাল কাগজ ঘড়ি পেন থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের লেখা সম্পাদকীয় লেখা—সব জিনিসই সরবরাহ করে (যে চায় তাকেই) তবে তার দরদাম ঠিক করা আছে, কালো বাজারের চেয়ে কম রেটে ব্যবসা চালাতে জানে সে ; কাজেই তার ব্যবসা চলছে মন্দ না।

'বিরূপাক্ষ, কি করে হাতিকে হাঁটিয়ে নেওয়া যায় ?' সুতীর্থ বললে।

'সর্দার হাতিকে ? কোথায় ? করাতীদের কাঠ মাথায় চাপিয়ে নদীর দিকে ?' বিরূপাক্ষ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর রেখে দিতে দিতে বললে।

'হ্যাঁ, নদীর দিকে, উজানে ভাসিয়ে দেবে।'

'তোমার দুয়োরে গিয়ে ঠেকবে, আর তুমি কাঠের সওদা ক'রে লাল হয়ে যাবে,—সে কি আর রাতারাতি হয় দাদা।'

'তোমার পাঞ্জার ছাপ পড়লে রাতারাতি হয় বৈকি', সুতীর্থ বললে, 'একটা বাড়ি চাই আমার—নিজের ; তিন কাঠা জমির ওপর হলেই চলে—পাঁচ সাত কাঠা হলে ভালো হয়, বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে বেহালা চেতলা যাদবপুর সোনারপুরে—'

বিরূপাক্ষ আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কোথায় পাবে তুমি অত টাকা?'

'কত চাই?'

'তা চাই কিছু; বেশ ধবধবে ভাগলপুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' বিরূপাক্ষ বললে। সুতীর্থ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললে, 'তা হোক, লাখ খানেক লাখ দেড়েকই হোক না হয়। কি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দাও, বাড়িব ব্যবস্থা কব।'

বিরূপাক্ষ চার জনের জন্যে কফি তৈরি করছিল। ডিশ ভরতি মাখন রয়েছে। আর তিন চারটে ডিশে প্যাস্ট্রি। পাউরুটি স্লাইস ক'রে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুই এত সব চাচ্ছিস তো সুতীর্থ, কিন্তু কোনো বাজারেই তো তোব নাম নেই রে—'

অসিত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'একটা বদনাম থাকলেও হত সুতীর্থবাবু। লোকে এক ভাবে মানুষটাকে চিনে ফেলত।'

বিজন একটু মাচার কুমড়োর মত বিকেলের রোদে গা এলিয়ে বসেছিল। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছু বললে না সে।

'আমাকে তুমি বাজারে নামতে বল বিরূপাক্ষ?'

'হ্যাঁ, টাকা পেতে হ'লে।'

'কিসের বাজারে?'

'তিলের, তিসির, তামাকের টিকের। তোতাপুরী আম চেন? তোতাপুরী আমের।'

'মাটির ভাঁড়ের, টিনের, ক্যানেস্তারাব' অসিত বল্লে 'পুরোনো কোম্পানীর কাগজের—সের দরে—'

'কিম্বা রতি হিসেবে বেনামী খবরের', বিজন তার চুরুটটাকে একটু জিরোতে দিয়ে বললে, 'না হয় ভরি হিসেবে ছাড়বেন, সুতীর্থবাবু, সোনার চেয়ে ঢের বেশি পড়তা।'

'সরকারের পেটের খবর ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভালো', বিরূপাক্ষ বললে, 'আর লাইমজুস, মৌসম্বির রস আর জিন—ড্রাই জিনের—'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যবসার ঘাঁৎঘোঁৎ এমন জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলে তোমরা—আমার আর তর সইছে না, তা' একটু রয়ে সয়ে চলতে হবে তবুও—সম্প্রতি আমাকে কিছু জমি কিনে দাও বিরূপাক্ষ,

বালিগঞ্জে না হোক ঢাকুরিয়া, নিতান্ত না পাওয়া গেলে বেহালা যাদবপুর হলেও চলবে। টাকা আমি কিস্তি হিসেবে দেব।'

বিরূপাক্ষ চার পেয়ালা কফি প্যাস্ট্রি মুচমুচে টোস্ট সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'কিস্তি-বন্দিতে টাকা নিতে আমি অবিশ্যি রাজি আছি। আর কেউ ও সব কথায় কানও দিতে যাবে না। এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এ সব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নীশকুন লাফাচ্ছে।'

'কয় কিস্তিতে টাকাটা দিয়ে দেবে, স্থতীর্থ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'কলকাতার থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি স্থবিধে দরে।'

'তা হয় না বিরূপাক্ষ, ট্রাম বাসের শেষ ডিপো পেরিয়ে এক মাইল দু মাইলের বেশি যেতে পারব না।'

বিজনের নিভু নিভু চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, এক টান দিয়ে বললে, 'জমি কিনবার, বাড়ি তৈরি করবার এত শখ কেন আপনার, স্থতীর্থবাবু?'

'আমি ভাড়াটে হয়ে আর লেপটে থাকতে চাই না,—বড্ড দেমাক আমার বাড়িউলির।'

'তা দেমাক থাকবেই তো। কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, অথচ বন্ধকী নয়—' বিজন বললে, 'আমাদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু ভালো বাড়ি তো নয়। করতে চেয়েছিলুম বালিগঞ্জে, কিন্তু স'রে যেতে হ'ল ঢাকুরিয়ায়। অসিতের বাড়ি অবিশ্যি টালিগঞ্জে, ভালো জায়গায়। বিরূপাক্ষের তিনখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি: একখানা কি জীপ না কি তোমার, বিরূপাক্ষ?'

বিজন নেভা চুরুটে টান দিচ্ছিল; চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এ সবের ভেতর এখন আর তুমি নাক ডোবাতে পারবে না, স্থতীর্থ। সে স্থযোগও নেই আজ আর, সে শক্তিও তোমার নেই। তুমি তো ছড়া লিখেছ এক সময়। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ, স্থতীর্থ যখন ছড়া লিখত, তখন আমরা কলেজে পড়তুম, না? স্থতীর্থের ছড়া পড়েছ তো?'

'পড়েছি', বিরূপাক্ষ বললে, 'ছড়া নয় ও কবিতা লিখত। লিখে-টিখে ও স্থবিধে করতে পারে নি। কে পড়ে ওর পদ্য আজ? ও সব কবিতার লেখক হিসেবে কে চেনে ওকে?'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের অবিশ্যি ভালো লেগেছিল ওর কয়েকটা কবিতা।'

'আমারও ভালো লেগেছিল,' বিজন বললে, 'লেখার চর্চাটা রাখলে পারতে তুমি সুতীর্থ; কবিতা নয়, গল্প লিখলে মন্দ হত না। ব্যবসাবিলির ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে গল্প পড়ি। হ্যাঁ হে বিরূপাক্ষ, তুমি পড় না?'

'আমি পড়ি', বললে বিরূপাক্ষ।

'আমিও পড়ি।' কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে।

'সুতীর্থ, তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি? শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ, কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয় নি, বেশ ভালোই আছেন।'

'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আরও হয়েছে?'

'ওরা তো বলে আর হয় নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাস্ট্রি বেশ নিজের হাতে ছেনে ছিঁড়ে ঢেলে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।

শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সুতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, বারবার তৈরি করছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

'কফি আরো খাবে অসিত? ঠাণ্ডার দিনে লাগে বেশ। অভয় এলে আরো রাসয়ে ঝালিয়ে ক'রে দিত। সিনেমায় গেছে 'রোটি' দেখতে। আজকাল ঠাকুরচাকরের গোলাম আমরা বিজন, ওরা আমাদের মুনিব। তিন বছর ধ'রে তুমি কলকাতায় আছ সুতীর্থ, পরিবার আনছ না কেন?'

'আমার পরিবারকে দেখেছ, বিরূপাক্ষ?

'না, কেমন দেখতে?'

'তুমি দেখেছ, অসিত?'

'না, কি রকম দেখতে তোমার স্ত্রী? সুন্দর? দেখাও আমাদের।'

'তুমি দেখেছ, বিজন?'

'তোমার স্ত্রীকে দেখি নি আমি, কবে বিয়ে করেছ?'

'আমার স্ত্রী ঠিক বলতে পারবে।'

'কাকে বিয়ে করেছে, তাও বলতে পারবে বটে।' বিরূপাক্ষ পটের থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললে।

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে, 'তবুও আমরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকি—কিন্তু সুতীর্থবাবু শুধু তাঁর পুরুষার্থকে কোলে টেনে বেশ ফুঁকে দিলেন দশটা বছর।'

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাছেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে—কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়ে ছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজার। দুশো তিনশো টাকায় এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কর সুতীর্থ'—বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাশগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুর বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে—'

'শ্বশুরবাড়ি যাও না, বউকে কলকাতায় আনো না, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ কেন মিছেমিছি আর? তোমার টাকা তারা পোঁচে? মন কষাকষির টাকা তো।' বিরূপাক্ষ সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

বিজন হেসে বললে, 'আমি এক বাটিতে চিনি আর এক বাটিতে টাকা রেখে দেখেছি পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। সুতীর্থের টাকা তার স্ত্রী খাবে না? কি বল তুমি, বিরূপাক্ষ? কি হ'ল তোমার মাথা ভালো বাজার চোলাই ধোলাই করে? ধুন্দুলের বিচির মত হড় হড় করছে বুঝি মাথার ভেতর, হড় হড় করছে?'

'পোঁচে তোমার টাকা তোমার স্ত্রী?' বিরূপাক্ষ চুরুটের ছাইয়ে টোকা মেরে বললে। খানিকটা ছাই উড়ে বিজনের চোখে গিয়ে পড়ল। ঘুষি জমিয়ে দেবে বিরূপাক্ষের চোয়াল কপালে বিজন? জমিয়ে দেবে? সাত পাঁচ ভেবে চুপ করে রইল সে। রুমাল বার করে চোখে ভাপ দিতে লাগল।

'পোঁচে। রসিদ তো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মতনই। আমার স্ত্রীর সই। স্ত্রীকে কলকাতায় আনা সম্ভব হবে না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে—' বলে বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—'

সুতীর্থের সমস্ত উত্তাল উলোল শরীরের কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে প'ড়ে বিরূপাক্ষ, বার বার বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতর

মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমার স্ত্রী—অন্য কারু তো নয়। কী মুশকিল ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মারছ কেন হা হা বাঁটের বাছুরের মত হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখ না বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ! তু—মি—আ—মা—য়—ছা—ড়—ড—ড়—ছা—ড়—বে—না—আ—আ—আ—' খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার ওপর;—সুতীর্থ তার মস্ত বড লম্বা শরীর ও এলোমেলো ঝাঁকডা চুলের ফিঙের ঠ্যাং ডানার ঝটপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁডিয়ে রইল দু এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষের মত হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তিন

দু তিন দিন পরে সন্ধ্যের সময় বেশ শীত পড়েছে; একটা ছেঁড়া পুরোনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে সুতীর্থ ব্যাগ হাতে করে চলছিল। লোকে দেখে মনে করতে পারে খুব ব্যস্ত ডাক্তার হয়তো চলেছে জরুরী কেসে; গলায় একটা স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে নিলেই হত। চেহারাটা ভারিক্কের চেয়েও বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল। ওভারকোট কাঁধে ফেলে অফিস থেকে বেবিয়েছে তিনটের সময়। বিকেলেই কোট গায়ে জডিয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল—তবুও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেডাচ্ছে সে। কী সে চায়? ব্যাগের ভেতর কী আছে তার?

'এত ঘুরছ কেন, ট্রামে উঠে পড় সুতীর্থ।' কে যেন ভিড়ের ভেতর থেকে বল্লে তাকে।

'ওঃ তুমি—ঘুরেফিরে তোমার সঙ্গেই আজ বারবার দেখা হচ্ছে কেন, ভবতোষ।'

'আমিও তোমারি মতন ঘুরছি যে—'

'এই যে বললে সিনেমায় যাচ্ছ—'

'না ভাই, যাওয়া হল না।'

'টিকিট তো কেটেছিলে—'

'চলো একটা চায়ের দোকানে ঢুকি গিয়ে—'

'আমার সময় নেই, দাদা।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

'কোথাও না, এমনি ঘুরছি।'

'তবে সময়ের অভাব কি হল—' ভবতোষ সুতীর্থের ওভারকোটের কলারে টান মেরে বললে, 'চলো, শেফালীদের কাছে যাই।'

সুতীর্থ কটাক্ষে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সংবেদিত করে নিচ্ছিল ভবতোষকে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন : কাদের কাছে নিয়ে যাবে ভবতোষ ? কারা তারা ? কোথায় থাকে ? সে তো তাদের কথা ভাবছিল না। ইহ পৃথিবীর কারো কোনো কথা মনেই ছিল না তার : এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'হল তো ? এইজন্যেই তো রাতবিরেতে তোমাদের ঘোরাফেরা। রাতচরা বকমারি সে একদিন ছিল, সুতীর্থ, কোথাও গেলে কি আজ আর পাওয়া যায়—নখদর্পণ ছিল আমাদের মত জলি ওল্ড ডাগুজদের—'

'জলি ওল্ড ডাগুজ ?'

'আরে ডাগুজ হস্টেল—উনিশ শো যোলো-সতেরো—ভুলে গেছ সব ?'

'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো এখন—'

'তা হোক, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে বুঝি হে। কেটে যাক—কাটুক, আমার কাটেনি—আমার কাটবে না, একটা চুল পাকেনি, দাঁত নড়েনি। সময় আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আরো একটা সময় আছে যা দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়—যেমন তেল সিঁদুর আসছে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে ; কিন্তু শিবলিঙ্গ—যেদিন চাও যখন চাও তখনই। চলো, ট্রামে উঠি—'

'কোথায় যাবে, ভবতোষ—'

'কফি হাউসে চলো—'

'কোনটায় ?'

'বড়টায়—চৌরঙ্গী প্লেসে—'

'না, অত দূর যেতে পারব না। মাপ করতে হবে। কাছেই একটা চা-কফির দোকানে—'

'সে হয় না,—ওরা সব আসবে কফি হাউসে, আমার আর তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে সব। স্কার্ফ, শাল, কাশ্মীরী, মির্জাপুরী—সিগারেট খায় কেউ কেউ—ক্যামেল সিগারেট—আমরা গিয়ে বসলেই হল—'

সুতীর্থ তামাশা বোধ করছিল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

'চলো ট্রাম এসে নিক্।'

'কিন্তু কফি হাউসে রাত হয়ে যাবে, ট্রামে বাসে ফেরবার উপায় থাকবে না তো। সাড়ে সাতটা আটটার সময় তো ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়—'

'কফি হাউস থেকে ফেরবার দরকার হবে না। ওদিকে ওদেরি কারু বাড়িতে কাটিয়ে দেব রাতটা। বেশি রাতে ট্যাক্সি···ফিটনে···করে বালিগঞ্জে ফেরবার কি দরকার। আসবে না কি ফিরে?'

ভবতোষ গলা খাঁকরে বললে, 'কই টিন বার কর।'

'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, ভবতোষ।'

'আচ্ছা, তবে এই নাও—' বলে নিজের মুখের থেকে ব্রায়ার পাইপটা নামিয়ে সুতীর্থের হাতে গুঁজে দিতে গেল ভবতোষ। জিনিসটা প্রত্যাখ্যান করলে সেটা রাস্তায় গড়াগড়ি খেত, কাজেই পাইপটা হাতে তুলে নিল সে।

'খাও, তামাক খাও, সুতীর্থ।'

'নিবে গেছে যে।'

'জ্বালিয়ে নাও, এই যে দেশলাই—'

'এই যে ট্রাম এসে পড়েছে—'

পাখিদের ডানা গজায় যেখানে সুতীর্থদের শরীরের সেই জায়গাটা আঁকড়ে টেনে ফুটপাতে তাকে চড়িয়ে দিয়ে ভবতোষ বললে, 'নাও, পাইপটা জ্বালিয়ে নাও আগে। ঘাবড়ে যেও না—আকচার ট্রাম আসছে; পালিয়ে যাচ্ছে না। ধাঁই করে একটায় চড়ে পড়লেই হবে।'

ট্রামটা চলে গেল।

'তোমার মুখের পাইপ আমি কি করে খাই?'

'দাও তাহলে', ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো ক্ষেতের কাঁকড়ার মত গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি দেখবে আমার মুখের কফি তিনি কি করে খান।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিল সে। দ্বিতীয় ট্রামটাও চলে গেল, দু-তিনটে বাসও।

'যাবে যদি তবে চলো।'

'সবুর—' পাইপ টানতে টানতে ভবতোষ কথা বলবার সময় পাচ্ছিল না। নিজেকে চাঙ্গা করে নিচ্ছিল, কথা ভাবছিল।

'এই যে বাস— ' সুতীর্থ বললে।

'ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে', মুখের থেকে পাইপ নামিয়ে বললে ভবতোষ, 'বাসে-ট্রামে চড়ে কেউ কখনো দক্ষকন্যাদের সভায় যায়?'

'জলি ওল্ড ভবতোষ—'

'জলি ওল্ড সুতীর্থ, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, একটি মুহূর্তও কেটে যায়নি। আমরা এই ছিলাম ডাণ্ডাজ হস্টেলে, অগিল্‌ভিতে ওয়ানে—চোখের পলক না পডতেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি রাসবিহারী এভেন্যুতে। একই তো সময়, একই প্রবাহ : রয়ে গেছে, রইছে ; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কান্নিক মেরে।'

ভবতোষ পাইপটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টানতে আরম্ভ করল।

'কবে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সুতীর্থ? স্কটিশ থেকে বেরিয়ে দেখা হয়েছিল কি আর?'

'মনে পড়ে না তো।'

'আমাকে চিনলে কি করে—চেহারার কোনো বিষটিষ মরেনি তো? এখনও বেশ লেজে দাঁড়ায়?'

'হ্যাঁ, পুরনো মানুষ দেখলেই চিনতে পারি। এই যে ট্যাক্সি—'

'এনতার আসবে ট্যাক্সি—' ভবতোষ সুতীর্থের আস্তিন ধরে টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'এনতার আসবে জিপ—ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'মেয়েরা উড়ে যাবে কফি হাউস থেকে বেশি রাত হলে? এই ভয়? সুতীর্থ?'

'আমি তো কাজে যাচ্ছিলুম, মিছিমিছি ঠেকালে কেন আমাকে।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ এড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিল : কোথাও সেলুনে কামিয়ে নেবে কি না ভাবছিল।

'কাজে যাচ্ছিলে, আমি ল্যাং মারলুম আর পেঁচোয় পেল বুঝি লালগোপালকে—হেঃ হেঃ ধনগোপালকে—, বেশ তো আমি সরে দাঁড়াচ্ছি, যেখানে

খুশি চলে যাও—' সুতীর্থ লম্বা শরীরে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সাত-পাঁচ ভাবছিল।

'কী কাজ তোমার—কী কাজ আছে এই ব্যাগের ভেতর? পরিবার নিয়ে আছ কলকাতায়? যাচ্ছিলে কোথায় শীত-রাতের লক্ষ্মীপেঁচার মত: কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘ্যাঁট রেঁধে রেখেছে বুঝি? সে ঝপাঝপ করে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মুলে হাভাত করে দেবে?'

পাইপটা নিবে গিয়েছিল ভবতোষের, ফুটপাতের ওপর খানিকটা তামাকের ছাই ঝেড়ে ফেলল সে।

'আমি চলি, ভবতোষ।'

'যাও।'

'নাকি ট্যাক্সি করব?'

'করতে পার।'

'বাঃ, বেশ চুকলি কাটছ তুমি, ভবতোষ।'

পকেট থেকে পাউচ বার করে খানিকটা তামাকপাতা তুলে পাইপের ভেতর ভরতে ভরতে ভবতোষ বললে, 'সাধনা করে ও-সব জিনিস পেতে হয়, আমি তোমাকে এমনিই দিয়ে দেব? ট্যাক্সি করবে কর; বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছি—চলো। কিন্তু মেয়েদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

'চলো একদিকে—বেড়িয়ে আসি—' নিজের গলার শিথিল অনিশ্চয়তা অনুভব করে একটু অপ্রীত হয়ে সুতীর্থ বললে।

'চলো, তোমার স্ত্রীর কাছে যাই।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ ছুঁয়ে একবার তাকাল, একটা চলন্ত ট্রামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে তা হলে?'

'বাপের বাড়িতেই থাকে। এখানে আসে না।'

'এখানে আসে না? কেন, ছেলেপুলে নেই তোমাদের?'

'এক ছেলে, এক মেয়ে!'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালবাসে না।'

ভবতোষ পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'বুঝেছি আমি। আমারও ওই রকমই। তবে আমি শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখিনি, এখানেই আছে; আছে বটে

তবুও না রাত চরলে চলে না আমার। তোমার তো চলবেই না—কি করে চলবে তোমার। চলো, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে যাই—'

'যাবে কফি হাউসে?'

'যেতে পারি', ভবতোষ পাইপ টানতে টানতে বললে, 'কিন্তু সেখানে ওরা অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্যে এত রাতে—ওই হামলাটার পর।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে তার বুকের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে ভবতোষ বললে, 'তা ছাড়া, ওদের দিয়ে এখন আমাদের চলবে না। আমরা চাই সহৃদয় মহিলা। তোমার কথা শুনে আমার মন ভিজে গেছে। ডাকো ঐ ট্যাক্সিটাকে। ভালো ঘরের সুন্দর প্রকৃতিস্থ মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাতে রাত জমানো যায় সে ব্যবস্থা আমি তোমায় করে দিচ্ছি, ওই যে ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সিটা দূরে ছিল—তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ডেকে এনে সুতীর্থ এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল যে ভবতোষ নেই কোথাও; পাইপের ধোঁয়ার গন্ধ হাওয়ার থেকে মিলিয়ে যায়নি যদিও, তবুও মানুষটাকে খুঁজে পেতে হলে আবার তিরিশটা বছর অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

চার

ব্যাগ হাতে করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সে—কোনো পথিক তাকে দেখলে বুঝবে লোকটা অন্যমনস্ক। কিন্তু কি নিয়ে যে সে কথা ভাবছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে নিজেই সে তার কোনো সদুত্তর দিতে পারত না। একটা শূন্যতা আধো-শূন্যতায় নিমেষনিহত হয়ে ছিল তার মন, সেখানে বিশেষ কিছু নেই। বিশেষ কিছু থাকবার প্রয়োজনও নেই। মনটাকে স্থিরভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল তবুও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বলয়।

সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায় যে সে বিয়ে করেছে, তার ছেলেমেয়েও আছে, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পাশগাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি আছে বলে মানুষকে যে সে অহরহ ভাঁওতা দিয়ে চলেছে সে নামে কোনো

গ্রাম আছে পৃথিবীতে? আছে তার স্ত্রী? কবে সে বিয়ে করল যে তার স্ত্রী সন্তান থাকবে?

ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ কেমন যেন একটা ধ্বন্তালোক বোধ করছিল, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে,—সেটা না আলো, না অন্ধকার কেমন একটা আবছায়ার দেশে মৃত্যুকে তার আধো প্রবঞ্চিত করতে ইচ্ছে করছে—জীবনটাকে ভালো লাগছে আধাআধি। হাঁটতে হাঁটতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কোন গলির ভেতর দিয়ে কোন্ সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে খেয়ালই ছিল না তার: ট্রামের শব্দ অনেক দূরে, বাসও কাছে কোথাও নেই। কোথাও এঞ্জিনের হুইসল্ শোনা যাচ্ছে—মহিষ ডাকছে—এক-আধটা মোটর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে আবার। অন্যমনস্কভাবে যে হাতটা চেপে ধরল সেটা রোগা নোংরা মড়ার মত ঠাণ্ডা।

'কে রে তুই?'

ছেলেটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাতে সুতীর্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ ফিরে এল তার দিকে।

ছেড়ে দিন বাবু, আমি করব না আর তোমার পায়ে পড়ছি বাবু।'

'কি নাম তোমার?'

'আমার নাম হারান।'

'বাপের নাম কি?'

শোভান।'

শোভান? মুসলমান? আবদুস শোভান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'শোভান ঘোষ।'

'শোভান? শোভন বল্, শোভনলাল। শোভনলাল ঘোষ।'

ছেলেটা কেঁচোর মতো পাক খেতে খেতে বললে, 'শোভান ঘোষ।'

'পকেটে হাত দিয়েছিলে কেন?'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল; পোয়াটাক মাইল হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের বাড়ির কাছেই সে এসে পড়েছে।

'তোর বাবা কোথায় ?'

'নেই।'

'কেন, কি হ'ল তার ?'

'ছুরি মেরেছিল বাবাকে, ম'রে গেছে।'

'কে মারল ?'

'ঐ দাঙ্গার সময় বেরিয়েছিল একদিন শেয়ালদ'র বাজার থেকে মাছ কিনে বৌবাজারে বিক্রি করবে বলে, আমরা সবাই না করেছিনু, শুনল না—'

'তোরা ক' ভাই ?'

'এক বোন আছে আমার, আর কিছু নেই। মুকে ছেড়ে দাও বাবু, পায়ে পাড় তোমার, কলকাতার মনিষদের ভয় লাগে আমার। আমি তো তাদের কোনো অমান্যি করি নি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। আজ রাতেই মজিলপুর চলে যাব, আর কারুর পকেটে হাত দেব না। কজনকার কাটনু পকেট আমি ? বাবু ?'

'এই দশ-বারো জনের কেটেছিস। মজিলপুর যাবি আজ রাতেই ? পায়ে হেঁটে ?'

'হ্যাঁ কত্তা, সেখানে আমার মা বাবা আছে ?'

'এই যে বলালি তোর বাবা মরে গেছে।'

ছেলেটি কেমন একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা তো ম'রে গেছে, মজিলপুরে আমার মা আর বাবা থাকে।'

'তার মানে ?'

তার মানে অনেক কিছুই হতে পারে। ছেলেটি কিছুই বোঝাতে পারল না, কোনো কথাই সে বলতে পারল না আর।

'কাঁদছিস ? তোর বোন কোথায় ?'

'তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।'

সুতীর্থ যে রকম ছেলেটির মাংসের ভেতর আঙুল বসিয়ে দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল সেটাকে ঢিলে ক'রে নিয়ে বললে, 'তোর সবটাই আজগুবি হায়রান। তোর বাপ মরেছে, তবুও মা বাবা মজিলপুরে। বোনকে কে চুরি করলে রে ?'

'আমার বোনকে মন্তুবাবু।'

'সে কে ?'

'মন্টুবাবু।'

সুতীর্থ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বুঝেছি।'

'মন্টুবাবু এল মেদিনীপুর থেকে। মন্ত্র পড়ে কড়ি উড়িয়ে দিল, কড়ি মাথায় আটকে গেল আমার বোনের। গোখরো সাপের মত কড়ি মাথায় মন্টুবাবুর সঙ্গে চলে গেল বোন মেদিনীপুর।'

'তারপর কি হল?'

'দিন ছেড়ে। আপনার পায়ে পড়ি হুজুর। আমার হাতটা ছেড়ে দিন, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে—'

সুতীর্থ তাকে ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়, ছেলেটার পিছু পিছু ছুটে তাকে ধ'রে এনে দাঁড় করিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তুই এই রকম হারান?' ছেলেটির পিচুটি ও চোখের জলে অবসাদ ও নিরাশা এসে পড়েছে: একটা লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পরিণত করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফেলে রেখেছে।

'তুই ঘুমুচ্ছিস, হারান?'

মাথা নেড়ে সে ইশারায় জানাল জেগে আছে।

'ঘুমুবি?'

'না।'

'খাবি?'

'না।'

'কি করবি তা হ'লে?'

'আমাকে ছেড়ে দিন, এখন যাব আমি মিত্র সাহেবের ওখানে।'

'মিত্রসাহেব? সে আবার কে রে?' সুতীর্থ কৌতুক বোধ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারান একটা ঢোঁক গিলে বললে, 'শোভান মিত্র।'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বললে, 'শোভান ঘোষ না বললি?'

'মিত্রও বলে কেউ কেউ।'

'কোথায় থাকে?'

'আগে মদনপুর থাকতুম আমরা, তারপর আলিপুরে তারপরে বেকবাগানে টালিগঞ্জে, এখন থাকি জানবাজারে—'

মনে মনে এই সব নিরবচ্ছিন্ন ব্যাসকূটের মীমাংসা করতে করতে সুতীর্থ

দা-১২৬৮৪

বললে, 'তবে মজিলপুরের কথা বলেছিলে কেন?'

'সেখানে আমার মা থাকে ; মা বাবা।'

'আর জানবাজারে?'

'বাবা।'

সুরসাল এই পৃথিবী ; পাঁচমিশেলি সব আলোড়ন এসে বিধ্বস্ত করে একে ; প্যাঁচালো মানুষের মন, বিচিত্র এই পৃথিবীর শিশুরা, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার হাত ছাড়ুন, পকেট থেকে পয়সা বের করছি।'

'পয়সা কোথায় পেলি?'

'গাঁট কেটে দু টাকা মতন হয়েছে।'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ধ'রে থেকে বললে, 'আজ কদিন বসে এই রোজগার হ'ল? আজ একদিনেই সব পেলি বুঝি?'

'হুঁ' বলে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললে, 'পাঁচ সিকে দিতে হবে শোভান মিঞাকে, আর বারো আনা মার জন্য রেখেছি এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?'

হারান সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হারান—যদি কোনো প্রাণের গভীর থেকে থাকে তার, তা হলে সেই গভীর থেকেই কথা বলছে, (সুতীর্থের চোখের দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছিল সুতীর্থের। কোনো নারী পুরুষ বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? এসেছিল একবার—একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল, একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ করেছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ 'বারো আনা পয়সা তোর মাকেই দিস, হারান', বললেও হারানের বিশ্বাস হ'ল না। সে আবার কবুল করল।

সুতীর্থ বললে, 'আমার পকেটে তো হাত দিয়েছিলি, ওখানেও কিছু ছিল, যাঃ তোর মাকে দিস্—'

'দেব মাকে?' অবুঝ অবিশ্বাসী ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে কেমন নাক মুখ চোখের বিশ্বস্ততায় পরিণত হতে লাগল হারানের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে পুষব। তুই তো বানরের সঙ্গে

বানরের বিয়ে দেখেছিস, দেখতে দেখতেই শোভান ঘোষের ঘরে জন্মালি। এবার আয়, আরো কিছু দেখবি—' বলতে বলতে সুতীর্থের মন পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরের প্রত্যন্তে চলে গিয়েছিল, হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল তার, ছেলেটি দাঁড়াল না আর, বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে অন্ধকারের সময়প্রসূতির ভেতর ডুবে গেল—সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

যাক, চলে যাক। সেই যে সে একদিন কলে আটকে ইঁদুরটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল সেটা এমন কিছু বৃহৎ নিষ্ঠুরতার কাজ নয়, সেই শিশু যে বাধা দিয়েছিল, সেই বয়স্ক মেয়েটি যে শোভন বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারাও এমন কিছু প্রেমাত্মা পুণ্যাত্মা নয়; এই হারান—এও বা কি। এরা চলে যায়।

তোমরা তোমাদের আধুনিক ও যা আধুনিক নয়—সময় ও কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হও বা না হও সেটা তোমাদের নিজেদের জিনিস। সেই সুন্দর ক্ষুরধার নিশীথ পথে এরা কে? কেউ তো নয়। কেউই কি নয়।

পাঁচ

কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুতীর্থ সেলুনে ঢুকতেই হেড নাপিত তাকে 'আসুন' বলেই আবার তার দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বসুন আপনি, এই এখুনি হয়ে যাবে।'

রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে যে রকম বুক ধড়ফড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল:

'এ সুতীর্থ না? এর সঙ্গে তো গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছিলুম। এতদিন পরে এর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। হয়তো চিনতে পারছে না আজ আমায়; আমিও ধরা দেব না।'

সেলুনে আটটা সিটের সাতটাই খালি ছিল—কিন্তু অসময়ে নাপিতরা কেউই পাদ হাতের কাছে ছিল না। একজন বাজারে—একজন টাকা ভাঙাতে—একজন চা খেতে গেছে। ব্রাশ ক্ষুর কাঁচি পাউডারের বাটি লাইমজুস তেল, পাফ, চুল ছাঁটবার ক্লিপের ছড়াছড়ির ভেতর একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসল সে। সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে 'বলব না আপনি অসময়ে এসেছেন' বলে ফেলে নিজের মনের গহনে একটু জিভ কেটে কি না কেটে মধুমঙ্গল চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেটির টাক মাথার চুলে আরো কিছু কারসাজি প্রায় শেষ করে আনতে লাগল।

'অসময় বই কি তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে তো—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা জোট বেঁধে খাই না। ঐ যে সুবোধ এসে পড়েছে। কি রে, চলতে ফিরতে বুড়ো হয়ে গেলি যে। টাকা ভাঙিয়েছিস্? নে হাত চালা, চৌধুরীবাবুর ড্রেসিংটা করে দে, আমি এই বাবুকে দেখছি।'

সুতীর্থের কাছে এসে হেড নাপিত বললে, 'আমার নাম মধুমঙ্গল।'

'ওঃ।'

'কেমন নাম?'

'ভালোই তো।'

মধুমঙ্গল সুতীর্থের সঙ্গে গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছে, এমনিও ফক্কুড়ি করতে ভালোবাসে খুব, মাঝে মাঝে ঠোঁট কাটা হয়ে পড়ে—যার তার সঙ্গে। সুতীর্থ মধুমঙ্গলের সহপাঠী ছিল, কিন্তু সে সব ইস্কুলী ইয়ার্কি এখন আর চলে না। টেনে মেনে যা চলে যতটা চলে হিসেবে রেখে মধুমঙ্গল বললে, 'কেমন নাম মধুমঙ্গল বললেন?'

'কিন্তু তোমার মুখে বিড়ির গন্ধ মধুমঙ্গল।'

মধুমঙ্গল সুবোধের দিকে ফিরে বললে, 'একটা কথা সুবোধ, বিপিন যদি বাজারে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলিস—' বলে সুবোধের কানের ভেতর একটা কথা ছেড়ে দিয়ে মধু সুতীর্থকে বললে, 'তামাক টানি দিনরাত, বড় বদ অভ্যেস—কিন্তু বিড়ির গন্ধটা খুব নিরেস লাগছিল আপনার?'

'তোমার কাজে মন দাও, মধু।'

'এগুলো তো সুগন্ধি বিড়ি, নাপতেনীরা খুব পছন্দ করে ; সুখটান দিয়ে যে যায় তাকে আর ফেরায়না, স্বর্গের গলা জলে দাঁড় করিয়ে গোন বেগোনের জল হয়ে ছলছল করে ঘিরে থাকে সারা রাত। আপনার চুল ছাঁটতে হবে?'

'কথাই তো বলছ তুমি। বেলা চড়ে গেছে, চার দিককার সেলুনগুলো বন্ধ, সেই জন্যেই তোমার খুব পায়া ভারি—চুল ছাঁট, চুল ছাঁট—'

বেশ নিপুণ ও মোলায়েম হাতে সুতীর্থের বুক পিঠ ঘাড় চাদর নিয়ে মুড়ে নিল, ঘাড় ঘেঁষে কান ঘেঁষে পাউডার পাফের আঘাত করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'এখন আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময়, এ সময় মুরুব্বিরা কেউ আসে না। দোকানটা এখন বন্ধ করেই রাখতুম, তা আপনি এয়েছেন বলেই খুলে রেখেছি। ফাউ কাজে কথা বলবার সময় সারা দিনরাতের ভেতর নেই, কিন্তু এই সময়টিতে মুখ নেড়ে বড্ড সুখ, আ হা হা। মুখ নাড়লেই পর্ব্বত।'

'চুল ছাঁটবে?'

'ছাঁটছি।'

'দেখো।'

'দেখছি।'

'কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে আছে তোমার।'

মধুমঙ্গল কোনো কথা না বলে প্রথমে কাঁচি চালাতে চেষ্টা করল, নিল ক্লিপ হাতে, সেটাকে এক আধ মিনিট চালিয়েই আবার কাঁচি, এবার একটা নতুন ঝকঝকে—

'কোন্ ইস্কুলে পড়েছিলেন?'

'আমি? গালিফপুর ইস্কুলে। কেন ইস্কুলের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'এমনই—' মধুমঙ্গল বললে।

গালিফপুর ইস্কুল। রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে—এবারে পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক রোদ ছড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে। গালিফপুর ইস্কুলের সেই সুতীর্থ না, এই যার চুল ছাঁটছে সে? মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই ইস্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শয়তানী চিপটেনীর নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে;—সুতীর্থ এল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘুমের ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আজকের দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে, যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবের চমৎকার আথ্‌খুটে কোলাহলে উনিশ শো এগারো উনিশ শো বারো। উনিশ শো তেরো-কেই পৃথিবীর শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ করল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মী ছেলে আর

লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁয়ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যার সঙ্গে মধুমঙ্গলের মন।

'মধুমঙ্গল।'

'বলুন।'

'বেশ ছাঁটছ তুমি।'

'হুজুর খুশি হলেই ভালো।'

'কি মিঠে তোমার হাত, কোনো নাপিতটাপিত নয়, আমার মাথার চুল যেন ছিজল শিরীষের পাতা চোত মাসের বাতাসে। চোতের বাতাস তুমি মধুমঙ্গল—'

হেড নাপিত কোনো কথা বললে না। চৌধুরীবাবু কিছুক্ষণ হয় চলে গেছে। সুবোধও বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভেতর কেউ ছিল না আর। মধুমঙ্গল এক মনে চুল ছেঁটে যাচ্ছিল: যার সঙ্গে সে পড়েছে একদিন, যে তাকে চেনে না আজ সেই মানুষটির। এত অবেলায়, কিংবা কোনো সুবেলায়ও এত ভালো করে এত মন দিয়ে কারু চুল সে রকম ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ছেঁটেছে মনে পড়ছিল না মধুমঙ্গলের।

'একটা সিগারেট বের করে নিতে দাও তো হেড নাপিত। এতদিন পরে তোমার কাছে চুল ছেঁটে আমার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদের উমাচরণ নাপিত। তার হাত, চিরুনির আশ্চর্য যাদু—সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবীর থেকে—এখনো যেন আমার চুলে লেগে আছে। ওস্তাদের পোকে খুঁজে না পেয়ে ঘুমিয়েছিল যাদুটা—পঁয়ত্রিশ বছর, তুমি এসে তাকে উমাচরণের মত জাগিয়ে দিয়েছ আবার। তোমার হাতে আমার বগের চুল আর চাঁদির চুল, আমার আজিডাঙার চুল কাজিডাঙার চুল কথা বলে উঠছে মধুমঙ্গল—'

'কি হল উমাচরণের?'

'উমাচরণ নেই।'

'কোথায় গেল?'

'মরে যেতে দেখি নি তাকে, তবে উনিশ শো দশেই আমাদের গাঁ ছেড়ে কোথায় যে সে চলে গেছল, আমরা দেশে থাকতে আর ফেরে নি। এখন কোথায় আছে কে জানে। উমাচরণ আমাকে সতীর্থ বলে ডাকত।'

'আপনার নাম—'

'হ্যাঁ। সুতীর্থ।'

'আপনি আরশির দিকে তাকিয়ে দেখুন তো কেমন হল।'

'দরকার নেই, আমার ভেতরে হয়েছে।'

মধুমঙ্গল বোধ হয় চিরুনি ছুঁইয়েই চুল ছাঁটছিল বিনে কাঁচিতে, মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'আপনার চুল ছাঁটতে বেলা শেষ হয়ে যাবে আমার দেখছি।'

'তা হোক, উমাচরণেরও হত। তুমি ছাঁটছ, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পারে অশোক স্তম্ভের পাশে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব বেশি রাতে, আমাকে ঘিরে দেবদাসীদের নাচ, চুপচাপ, তাদের চুল নিঃশ্বাস ননী মাংস তাদের হাত—'

'বিড়ির গন্ধটা', গলা খাকরে নিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'মিইয়ে এসেছে বুঝি, সুতীর্থবাবু?'

'কই, পাচ্ছি না তো আর।'

'পাবেন না মধুমঙ্গল চুলে হাত দিলেই বাবুদের সিদ্ধির নেশা চড়তে থাকবে।'

'মধুমঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' সুতীর্থের ঠোঁটের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'একটা কথা আপনার কাছে।'

সুতীর্থ সিগারেট টানছিল, কিছু বললে না।

'বলছি আপনাকে', মধুমঙ্গল বললে, সুতীর্থের মাথার চুলের দিকে নিজেকে সে ন্যস্ত করে রাখল কিছুক্ষণ, কাঁচি নেই, চিরুনিই নেই যেন, হাত দিয়ে বিলি কেটে চুল ছাঁটছে মধুমঙ্গল। মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'মধুমঙ্গল—এই নামটা আপনার চেনা চেনা লাগছে?'

সুতীর্থ দু এক মুহূর্ত সিগারেট টেনে, নাপিতের চাদরের ভেতর থেকে হাত বার করে ছাই ঝেড়ে সিগারেট টানতে লাগল, কোনো কথা বললে না।

'শোনেন নি এ নাম আগে কোনোদিন?'

'তোমার কাছেই তো শুনলাম আজ।'

ভুলে গেছে সুতীর্থ। মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা করে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হয়ে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে

সুতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা করে সকলের সামনে তাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিতে পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাৎ বাদাম পেড়ে আর জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জলঠাকরুণদের মত চোখে মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকে হাতের কাছে টেনে নিত। এ সব আজ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের কথা। সময় ও সংসারের হাতে নিরবচ্ছিন্ন মার খেয়ে মধুমঙ্গলের নামের এই ঠাণ্ডা জল ফলের মত ছিটেটুকু ছাড়া কি আর আছে সেই সাবেক কালের? সেই ইস্কুলের ছোকরা মধুমঙ্গলকে যদি এখানে এনে দাঁড় করানো যেত, কপালের ডান দিকের আবটা দেখেও এই হেড নাপিতকে সে চিনতে পারত না আজ। এইটেই দুঃখ কষ্টের কথা—এই কুশ্রী কঠিন পরিবর্তন—বালকের কাছে প্রৌঢ়ের এই নিরেট উৎখাত; মনটা ঠিকই আছে মধুমঙ্গলের হৃদয় ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীচেহারার কোনো মিল নেই যে। এদিক দিয়ে বেশ খানিকটা মিল মিশ রয়েছে সুতীর্থের ভেতরের ও বাইরের। সুতীর্থ বড় হয়েছে বটে, বুড়ো হয়েছে, কিন্তু তবুও সে নিজের যৌবন নিজের কৈশোরের থেকেই বেড়েই বড় হয়েছে; এরা চেনে সুতীর্থকে, কিশোর সুতীর্থকে ধরে আনলে আজকের এই বড়টাকে সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নিতে পারত কিন্তু মধুমঙ্গল তো নিজের যৌবন কৈশোরকে কাল নাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিস্রোতায়—পচা মাংসের ঢোল নিয়ে ফিরে এসেছে ভেলা। কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? মনটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু, আহা, সেদিনকার সমাজ সংসার দিন ক্ষণ রূপ যৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।

'তুমি রসিয়ে রসিয়ে চুল ছাঁটছ হেড নাপিত, আস্তে আস্তে। ভালো। কিন্তু আমার উঠতে হবে তো।'

'বসুন, সন্ধ্যের সময় গিয়ে নাইবেন। চৌবাচ্চায় ধরা জল আছে?'

'না।'

'পাম্পে জল আসে? ইলেকট্রিক পাম্প?'

'হ্যাঁ।'

'পাম্প কার?'

'বাড়ীওলার—' সুতীর্থ বললে।

'বসুন তাহলে', মধুমঙ্গল বললে, 'চুল ছাঁটি আপনার। এত বেলায় কলকাতার বাড়ীওলা পাম্প চালাতে দেবে না।'

'যদি বাড়ীউলি হয় সে!'

'নাঃ', মধুমঙ্গল কাঁচিটা রেখে দিয়ে আর একটা কাঁচি তুলে নিয়ে বললে, 'সে সংগুষ্টির মেয়েও দেবে না। বসুন। এই যে চেঁদো মাথাব ভদ্রলোক বসেছিলেন ওর নাম মহীন চৌধুরী, ওর টাকা সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন আপনি। এত চুল আপনার, অথচ পাকা চুল কোথায়। বয়স কত হল?'

'চল্লিশ পেরিয়ে গেছি', সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, তোমার নিজের খাওয়াদাওয়া নেই, মধুমঙ্গল—কেমন লটকে পড়লে যে তুমিও আমার চুল ছাঁটার অছিলায় মধুমঙ্গল?' মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ হয় ক্লিপ ছেড়ে দিয়েছে। ক্লিপ সে বড় একটা ব্যবহারই করে নি আজ। পাড়াগাঁয়েব উমাচরণের মতন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছিল—ধীরে ধীবে—শান্ত মোলায়েম নিপুণতার সঙ্গে।

'দাড়িটা আপনাব না কামিয়ে ছেঁটে দিলে ভালো হয়?'

'কেন?'

'এ তো এক মাসের দাড়ি আপনাব গালে। সবুব করুন, কাঁচি দিয়ে ঢঙেব দাড়ি বানিয়ে দিই।'

'না না, নূর নয় তো কামাতে হবে। আমি দাড়ি রাখি না কখনো।' সুতীর্থ একটু ঝেঁঝে উঠে বললে।

'কলকাতাব নাপিতের ক্ষুরে দাড়ি কামাবেন?'

'কি হবে?'

'আজই তো দিন চারটে গরমির রুগীকে কামিয়েছি।'

'কে তুমি?' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, কি করে জানলে, তুমি তাদের ও রোগ হয়েছে?'

'সে আমার জানা আছে। আমিও তো রুগী। আমাদের নিজেদের মুখ চেনাচিনি আছে।'

সুতীর্থ আরশির ভেতরে মধুমঙ্গলেব কালো নীল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘরেই আছে?'

'আছে বই কি, আমার সাপ আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে কাটতে পারে। ক্লিপের আঁচড়ে ছড়ে যেতে পারে, ক্লিপ ধরিনি তাই; ঘাড়ের ক্ষুর লাগাব না আপনার। দাড়ি এখানে আপনি বরং নাই বা কামালেন

সুতীর্থ সেলুনের দেয়ালের চারদিকের কিম্ভাকৃতি সব ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, ক্যালেণ্ডারের ছবি আছে, বিলিতি আর্ট আছে, দিশী মহাভারত ও ভাগবত যে সব ছবিতে বিকণ্টকিত হয়ে উঠেছে তা ও মনের ভেতর নেশা কেন্দ্রাসিত করতে না পারলেও উথলে তুলতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে, তন্ত্রে, সুতীর্থ ভাবছিল, সারাৎসারের উপমা প্রতীক হিসেবে প্রথম ও অন্তিম রস কেমন সনিবন্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।

'মধুমঙ্গল আমি দাড়ি কামাব।'

'নাপিতের ক্ষুরে? যদি রক্তে দাঁত হয়?'

'হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'এটা বোকার মত কথা বলা হল।'

সুতীর্থ দেয়ালের একটা ছবিতে মেয়ে পুরুষের খোলাখুলি কেমন একটা আকাট তাৎপর্যের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোনো জায়গায়—চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধে আছে?'

'আছে বই কি।'

'ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্—রাতটাও। দু তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপ চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়—দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা, রাত কোনোদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ; এ ছাড়া ঘুমের কোনো শেষ নেই। এই সব—যা চাচ্ছি—কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'

সুতীর্থ তার কথা শেষ না করতেই ভেতরের ঘর থেকে খন খন করে বেজে উঠল যেন কার গলা: 'হো রে মধু মঙ্গইলা, হো মউধ্যা, তর হইল কী রে—'

'এতক্ষণে বুঝি তোর ঘুম ভাঙ্গল' মধুমঙ্গল গায়ের জামা ঝেড়ে বললে।

'তর সঙ্গে কথা কয় ক্যাডা রে?'

মধুমঙ্গল মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে বসলে, বললে, 'তুই ভাত খেয়েছিস বিপনে?'

'তুই খাইলে তবে তো খাইমু।'

'যা, যা চান করে আয় গে যা, দিক করিস নি—'

'তর লোগ পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথার লওন আছে থোওন নাই মানুষট্যা ক্যাডা? এই তুফুইরভার সময় নি চুল ছাঁটে। চুল ছাঁটতে আইছে না চুলের আঁটি বাঁধতে—দলঘাসের আঁটি—ছলি যদ্দি সইসের লাহান?'

'তুই যদি ফের কথা বলিস বিপনে—তা হলে ক্ষুর নিয়ে আসছি।'

'কি করবি তুই আমার। রোজই তো ক্যাল্লা ছুটাস। তুই আমার বাপ কর্ণ, আমি হইলাম গিয়া রঞ্জাবতীর ছাওয়াল। আয় আয় দাতা কর্ণ আয়, করাত দাও, কুড়াল যা হাতের কাছে পাস হেইয়া দিয়া দে গলা দু ফাঁক কইরা। বাইচ্যা থাইকা আর সুখ নাই।' কাঁচি চিরুনি দেরাজের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মধুমঙ্গল ঝট করে ও ঘরে ঢুকতেই লোকটা আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে কিল চড় ঘুষি লাথি হজম করতে লাগল—একটা টুঁ শব্দও করল না।

ফিরে এসে মধুমঙ্গল দেখল, সুতীর্থ একটা ঝকঝকে কাঁচি তুলে নিয়ে তার ছাটা চুলের ওপর বাহার কাটবার চেষ্টা করছে।

'এটা ভালো করছেন না, সুতীর্থবাবু।'

'কেমন একটা ঝুঁটি রেখেছে তুমি সমস্ত মাথা জুড়ে। এই কি ভালো চুল ছাঁটা হল, মধুমঙ্গল—'

মধু একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'লোকে দেখে কি বলে সেটা আমাকে শুনিয়ে যাবেন—'

'লোকে কি বলে? আর আমি কি মনে করি সেটা কিছু নয়?'

চুলে ড্রেস করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'দাড়ি থাক তা হলে আজ।'

'দাড়ি কামাতেই তো এখানে এসেছি মধু। যে আফিং খায় তাকে খেলে কাল-নাগ 'নীল' হয়ে যায়—' সুতীর্থ নীলের ওপর জোর দিয়ে ঠাট্টা করে এক আধ ফোঁটা হাসি ছিটিয়ে বললে, 'কী করবে আমাকে তোমার রোগ?'

'না, পঞ্চ রং-এ মাতাল আর সাপের বিষে কি করবে।'

'নাও, ড্রেসিং চটপট সেরে নাও। দাড়ি কামাও। তারপর যাব।'

'কোথায়?'

'ঐ যে বললুম।'

'সে গুড়ে অনেক দিন হয় বালি প'ড়ে গেছে, স্যর। আমাদের কোনো চেনা

বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবার জায়গাই নেই। মন্বন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা জুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব ; হাড়গোড়ের ছিবড়ে শুঁকতে আরশোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়-ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং ? দিতে পারি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্ত-মাংস চাইছেন আপনি ? কার আছে ? কে দেবে আপনাকে ?'

দাড়ি কামানো শেষ হলে মধুমঙ্গল বললে, 'দশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি, আপনাকে তো দেখিনি কোনোদিন। এ পাড়ায় থাকেন নিশ্চয়ই সেলুনে চুল কাটাবার দাড়ি কামিয়ে নেবার বেশ এলেম তো আপনার ; এ পাড়ায় সবাই তো আমার সেলুনেই আসে—'

'এখানে আমি আসিনি আগে আর।'

'এখন থেকে আসবেন তা হলে—

'কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয়। আমি থাকি বালিগঞ্জে, ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পার তোমার ঘাট-কামানোর দোকানের ?'

সুতীর্থ পালিশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'পয়মন্ত নাপতেনীর হাত গো তোমার,—সুবিধে পেলেই আসব ; মোক্ষম ; আমার আর কিছু সুবিধে করে দাও না, যা বলছিলুম—'

'মানে উমাচরণকে চাই ?'

'না, উমাকে !'

'সে হয় না।' মধুমঙ্গল কিছুতেই ধরা দিল না।

সুতীর্থ চলে গেল। দাম দিতে ভুলে গেল মধুমঙ্গলকে। সেও চাইল না। দামের জন্যে নয়, দামতো কিছুই নয় লোকটার জন্যেই তার ঠিকানাটা জেনে রাখলে পারত মধুমঙ্গল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না। বালিগঞ্জে যাবে ? উত্তুরে মানুষ সে—সমস্ত দক্ষিণ দিকটার নামই তো বালিগঞ্জ ; ওখানে কে কাকে খুঁজে পাবে ? দশ বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছে ও মুলুকে মধুমঙ্গল ? পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের ইস্কুলের সেই সব ফোর্থ থার্ড সেকেণ্ড ক্লাসের ইয়ারদের কথা মনে করে ঝুম হয়ে থাকবার মত মন মধুমঙ্গলের নয় ! কিন্তু তবুও চান নেই—খাওয়া দাওয়া নেই—মেঝের মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে দেরী হ'ল।

ট্রামে উঠে সুতীর্থ ভাবল, মধুমঙ্গলের দামটা দেওয়া হল না, আর একদিন এসে দিয়ে যেতে হবে, ওকে চিনি আমি ও তো সেই গালিফপুর ইস্কুলেব মধুমঙ্গল চক্রবর্তী, ওকে ভালো লাগত আমার খুব খেয়ালী ছেলে ছিল, পডাশুনো তাস ক্রিকেট অ্যাক্টিং যাতে হাত দিত—বেশ সেঁটে—পাঞ্জা জাঁকিয়ে। ভারি ডাঁটের মাথায় চলত ফিরত, কথা বলত, ভারি তালেবর ছেলে ছিল, নাপিত হয়েও তাই আজ হয়েছে হেডনাপিত, মধুমঙ্গল কি অ্যাসেম্বলির স্পিকার হতে পারত না, কিংবা মন্ত্রী ? দুমাস তালিম করে নেবার সময় দিলে ও সে সব কাজ ঠিক চালাতে পারবে ; ও সবই পাইয়ে দিত আমাকে ইস্কুলে পডতাম যখন। সব জানে সব পারে ; এখনও ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতার হাতীর শুঁড় নড়ছে যেন—এমনই নাডা দিয়েছিল আমাকে যে ওকে বলেছিলাম বেশ একটা নিরবলীন অন্ধকারেব দেশে আমাকে কয়েকদিন কাটিয়ে দেখার সুযোগ দিতে পারে কি না। সেখানে কিছুকাল থাকলে ফিরে এসে তারপর এই সব বাতাসে রোদে কী উৎসাহ পেতুম আমি, কী আলোৎকোসারিত মনে হত এই পৃথিবীকে। কিন্তু মধুমঙ্গল তা হতে দেবে না, ওর বিশ্বাস, যে তা হলে রোগ হবে, নষ্ট হয়ে যেতে হবে ; তা হয় বই কি, কিন্তু সে বোগ হতে দেব কেন, আজ না হয় অকৃতী সমাজেব দোষে নেশার সঙ্গে রোগের নিরেট নিষ্ফলতা মিশে আছে, কিন্তু একদিন এমন নিয়ন্ত্রণ আসবে না কি যখন অন্ধকাব ও আলো, মৃত্যু ও জীবন ব্যবহারের সে ঢের অতল গভীর আনন্দের প্রবাহকে কোনো বোগ কোনো অনারোগ্য অপদর্শন এসে অসফল কবে দিতে পারবে না আব। আজই তো সতর্কতা আছে, ওষধি আছে ; নিরেস গণিকাবৃত্তিও আছে। ওরা যে নারী মা বোন এ রকম মন-সাফাই মনোভাবও আছে। এ সব পথে নয়, কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না শরীরের বা মনের জন্যে, শরীরই শুধু তাগিদ রোধ করবে না, হৃদয়ও—দুজনেরই ; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনকালের জন্যে নয়—হয়তো এক রাত্রির জন্যে, কিংবা সাতটি আলোকিত দিনের জন্যে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি নির্দোষ—রাষ্ট্র খুব বিশেষভাবে উজ্জ্বল না হলে এ জিনিস সম্ভব নয়। কি, অসাধ্যসাধনের জিনিস মধুমঙ্গলের মত বেচারার কাছে চেয়েছিল সে। যে মাত্রাবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল—ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। সাদা চেতনায় মন স্থির হয়ে উঠলে আরো বেশি স্থির হয়ে পড়ে—আজকের এই অপজাত পৃথিবীতে সে স্থিরতা বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয় ; সুতীর্থের

মুখের প্রতিফলিত কেমন যেন তপঃক্লিশহাসির পেছনে প্রকৃত মুখটাকে অর্ধস্থলকে দেখা যাচ্ছিল তার ; কিন্তু ট্রামের কোনো যাত্রীরা দেখতে পেল না কিছু।

ছয়

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতেই সুতীর্থের সঙ্গে প্রায় গা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মণিকা সিঁড়ির কিনারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, চাকরটাকে পাঠিয়েছিলেন একটা ওষুধ কিনতে, কিন্তু সে বড় দেরি করে ফেলেছিল, মণিকা নিজেই একবার নিচে গিয়ে দেখে এসেছেন, ফিরছে না চাকর ; ওষুধ নিয়ে না ফিরলে ওপরে যেতে পারছেন না তিনি।

‘এই যে মানুষ যে—’সুতীর্থ বললে।

‘তাই তো দেখছি, এত রাতে তোমার উদয় যে।’

‘চোখ বুজে চলেছিলাম, তোমার গায়ে লেগে গেল বুঝি।’

‘তুমি ভেবেছিলে পাথর দাঁড়িয়ে আছে বুঝি।’

‘রাত কটা হবে ?’

চাকর ওষুধ নিয়ে সর সর করে ওপরে চলে গেল, মণিকা দেখলেন, সুতীর্থের চোখে পড়ল না। সুতীর্থ সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

‘দয়া করে যে রাস্তার দরজাটা বন্ধ করে দাও নি, ওটা আটকে রাখলে আমাকে দেয়ালের পাইপ বেয়ে উঠতে হত। বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। চলো আমার ঘরে। ঘর খোলা যে ?’ দু এক পা এগিয়ে গিয়ে সুতীর্থ বললে।

‘খোলা রেখে গিয়েছিলে বলেই এতক্ষণ আমাকে আগলে বসে থাকতে হল, এবার আমি চলি—’

‘কোথায় যাচ্ছ ?’

‘ওপরে।’

‘অংশুবাবু কি ফিরেছেন ?’

‘খেয়ে-দেয়ে ওর এক ঘুম হয়ে গেছে।’

সুতীর্থ হঠাৎ প্যাসেজের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে তবে। আচ্ছা, ওপরে যাচ্ছিলে যাও। অংশুবাবুর হয়তো কিছু দরকার হতে পারে।'

'কি আর দরকার হবে এত রাতে।'

'এক ঘুম তো হয়ে এল প্রায়, তারপরেই তো দরকার।'

মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন, মাথার ওপর থেকে ঘোমটা ঠিক নয়, আঁচলটা খসে গেছে খোঁপার ওপর, আঁচল চড়াতেই বাতাসে খসে গেল আবার, গলায় জড়িয়ে নিলেন আঁচল; সুতীর্থের সামনে ঘোমটা দেবার কি দরকার তাঁর, সুতীর্থ দু এক বছরের বড় হতে পারে মণিকার চেয়ে, কিন্তু নিজের ছোটর মতনই তো তাকে দেখেন তিনি। তাই অনুভব করেন না? ভাবছিলেন।

সুতীর্থ নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে বললে, 'বোস।'

'বসব না, ভয় আমার মেয়েটার জন্যে।'

'কে অমলা? ঘুমোয় নি?'

'ঘুমিয়েছে, কিন্তু ছ্যাঁৎ করে জেগে ওঠে তখন আমাকে কাছে না পেলে কাণ্ডই করবে।'

'নিশির ডাকেও হেঁটে চলে না কি অমলা?'

'কাকে বলে নিশির ডাক?'

'ঘুম চোখে যে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর পেরিয়ে যায়, তবুও ঘুম ভাঙে না, জান না, শোন নি?'

মণিকা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, তেমন ঘুম থাকে না কি আবার। কই, শুনি নি তো কখনো দেখি নি তো কাউকে। তুমি দেখেছ?'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'নিশিতে পাওয়া মানুষ? কত কত দেখেছি। আমি নিজেই তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, ঝিল, জঙ্গল তেপান্তর ভেঙে—পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখন—'

'তারপর কি হ'ত?'

'হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে টের পেতুম সব।'

'বড্ড ভয়ঙ্কর জিনিস তো, ঘুমের নেশায় হেঁটে চলা; এখনো আছে নাকি এ রোগ তোমার?'

'না, কলকাতায় এসে সেরে গেছে, পনেরো বিশ বছর আগে দেশ গাঁয়ে থাকতে নিশির ডাকে চ'রে বেড়াতুম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছ মণিকাদি বোস—জলচকীতে কেন কুশনে বোস।'

কুশনে নয়, একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে মণিকা বল্লেন, 'চা খাবে ?'

'না।'

'টিনটা তো বের করেছ সিগারেটের অনেকক্ষণ। খাও, আমি উঠি।'

'বোস, সিগারেট রেখে দিচ্ছি। ও আমি খাই না, এমনিই নাড়ছিলুম টিনটা।' সুতীর্থ সিগারেট বের করল না, দেশলাইটা সরিয়ে রাখল, লঙ কোটের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শীত করছে না তোমার ?'

'কই না তো, গরম হয়ে আছি।'

'কলকাতায় বেশ একটু শীত পড়েছে এবার।'

'কলকাতায় শীত নেই' সুতীর্থ পকেটের ভেতর থেকে হাত বার করে এনে বল্লে।

'কোটের নিচে শার্ট নেই তোমার ?'

'না এ তো লঙ কোট।'

'গরম ?'

'গরমের দিনে পরা যায়।' সুতীর্থ বল্লে।

মণিকা বেতের চেয়ার থেকে উঠে একটা সোফায় ঠিক হয়ে বসে বল্লেন, 'হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পার। তুমি অন্তত একটা চাদর গায়ে দাও না কেন ? বোস, তোমার জন্যে একটা ধোসা নিয়ে আসছি।'

'এখন তো ঘরে ফিরেছি। বেশ গরম লাগছে ঘরের ভেতর। যখন বাইরে বেরুব তখন দিও ধোসা।'

'তোমার লেপ নেই ?'

'কম্বল আছে।'

'লেপ তৈরি করাও না কেন ?'

'আগে পরিবার এসে নিক।' সুতীর্থ সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে নিল।

'রাত হয়ে গেল উঠি।'

'অংশুবাবু তো ডাকবেন জেগে উঠেই, তখন গেলেই হবে। পৌঁছে দেব তোমাকে—'

'তার মানে ?'

সুতীর্থ সিগারেট জ্বালিয়েছিল, কিন্তু না টেনেই নিবিয়ে রাখল, টানবার

ইচ্ছে ছিল না তার, মণিকা দেবীও মুখোমুখি বসে আছেন ; টানবার রুচি নেই , সিগারেটটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

মণিকা বল্লেন, 'মুটিয়ে গেছি, শরীরে বাত ধরেছে, ওঠানামার পথে একজন লোক চাই বুঝি আমার ? তোমার আগে কুতবমিনারের মাথায় চড়ব গিয়ে আমি, সুতীর্থ তুমি নিচে পড়ে হাঁপাতে থাকবে। চলো, যাবে নাকি !'

'কোথায়—কুতবে ?'

'চলো অক্টারলোনিতে।'

'ওঠা যায় নাকি ওটায় ?'

'চলো দেখে আসি—কে আগে ওপরে ওঠে—মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউডগা , কে কাকে ছাদে পৌঁছিয়ে দেয়, মাটিতে নামিয়ে আনে—রকমটা দেখে আসা যাক আশ মিটিয়ে—'

'চলো, দেখে আসি.' সুতীর্থ বল্লে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মণিকা মজুমদার। তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে বেতো বলেছি, তা নয় ; তোমার বাত নেই, বেশ সুন্দর ছেঁচা শরীর, বেশ লম্বা ছাঁদ। ছিপছিপে চেহারা হলেই অনেকের ভালো লাগে। আমার দেখে শুনে রয়ে সয়ে লাগে : খুব খারাপ হতে পারে, আমাদের দেশে প্রায়ই মড়াদের ওরকম চেহারা হয়। সুস্থতা না থাকলে সুন্দরী হওয়া যায় না কোনো দেশেই, আমাদের এ দেশে তো নয়ই। তোমাকে ওপরে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলুম—অন্য কারণে। চলো, তাহলে—'

'কোথায় ?'

'অক্টারলোনি মনুমেণ্টে—'

'এত রাতে ?'

'তুমি যাবে বলছিলে ?'

'ট্রাম বাস্ তো চলছে না এত রাতে।'

'ট্যাক্সিতে চলো।'

'ওপরে একটা শব্দ শুনছ না ?'

'কই না তো।'

'আমার মনে হয় জেগে উঠেছেন—'

সুতীর্থ মণিকার চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে নিচ্ছিল সে চোখে ঘুম ঘনিয়েছে না আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার ইচ্ছে—ওপরে না গিয়ে সুতীর্থের এই নিচের ঘরে বসে থেকে।

'নাকি অমলাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল। শুনলে না তুমি?' মণিকা বললেন।

'ও কিছু নয়, তোমার মনে ধাঁধা। এই বারে শীত পড়েছে।' সুতীর্থ র‍্যাকের থেকে একটা জহর কোট নামিয়ে গায়ে চড়াল।

'সারা রাত তোমাকে জাগতে হয় বুঝি মণিকা দেবী, অংশুবাবুর হাঁপানির টান, তোমার মেয়ের—'

'মেয়ের জন্যেই আমার ভাবনা বেশি। কি যে সব বাজে বকে ঘুমের ঘোরে সারা রাত। তা ছাড়া ওর হার্ট ভালো না লাংসও খারাপ। একটুতেই সর্দি-কাশি ধরে যায়, একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অ্যাঞ্জার্স খাওয়াচ্ছি।'

'অ্যাঞ্জার্স তো পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। পেলে আমিও খেতাম।'

'তুমি? কি রোগ হল তোমার? সর্দি-কাশির ধাত নয় তো। অ্যাঞ্জার্স কালো বাজারে পাওয়া যায়। আমি অবিশ্যি কন্ট্রোলে যোগাড় করে দিতে পারি। তোমার চাই?'

'অংশুবাবুর ধরে অ্যাঞ্জার্সে?'

'ধরা ধরি' একটা ক্লান্ত রক্তকণিকা যেন আস্তে মোচড় খেতে না খেতেই নিটোল দিব্য হয়ে বেরিয়ে এল মণিকার নিঃশ্বাসে; বললেন, 'উনি ও-সবের বাইরে চলে গেছেন।'

'ওর হাঁপানি কি কিছুতেই সারানো যাবে না?'

'এ তো সারবার রোগ নয়। ও'র যা বয়স, ও বয়সে এ রোগ সারে না আর। সব রকম চিকিৎসাই হয়েছে, দৈবী ওষুধও যেখানে যা খোঁজ পাওয়া গেছে—মানুষ সেধে দিয়ে গেছে। মানুষের হাত পা ধরেও কত কি যোগাড় করে নিতে হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিতিয়ে গেছে সব—' বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাং হাঁকড়ে উঠেছে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল সেই কুৎসিত ক্লিষ্ট প্রাণী, পটের সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার পটের অন্তঃকৌমুদীর আলো নিয়ে ফিরে তাকালেন মণিকা দেবী।

'তোমারও ঠাণ্ডা লাগল'—সুতীর্থ বললে।

'না, এটা ঠাণ্ডার কাশি নয়।'

তা নয় হয়তো: অংশুবাবুর জন্যে বা আর কারো জন্যে সত্যমিথ্যে আবেগে

অভিভূত হতে থাকলে শরীরের ভেতর কাজকর্মে একটু বাধা পড়ে, বুক ভারি হয়ে ওঠে কিছুটা গলায় শ্লেষ্মা আটকে যায়, কাশতে হয় , ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসো।'

'দাও, কিন্তু তুমি',—কম্বল জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'তোমার শীত করছে না ? লং কোট জহর কোটে মানাচ্ছে ?'

'খুব। আমি তো এখন ঘুমুচ্ছি না,' সুতীর্থ বললে, 'তোমার মেয়ে অমলাকে আমি একদিন দেখেছিলুম। তুমি কিছু মনে করবে না চমৎকার চেহারা ওর, কিন্তু ভেতরে যে জিনিস থাকলে পাঁচী পটলীও ছোকরাদের গুণ করে রাখে—' সুতীর্থ কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'অমলাব তা নেই। ওর বাপের কাছ থেকেই এ সব পায়নি বলে মনে হয়।'

মণিকা দমে গেছেন মনে হল না, অপ্রীতও কি হয়েছেন ? সুতীর্থের এসব কথা গায়ে মাখবার মতো মনে কবেন বলে মনে হয় না। বললেন, 'ওর বাবা আমার চেয়ে ঢের উঁচুদবেব মানী লোক ; যা জান না সে বিষয়ে কথা বলতে যাও কেন ?'

সিগারেটটা কোটেব পকেটে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ একদৃষ্টে মেঝের একটা অকিঞ্চিৎকব ছকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি উঠলে ?'

'তোমার কম্বলে বড্ড বেশি গরম।'

'তাই তো এরই মধ্যে ঘামিয়ে উঠেছ দেখছি।'

কম্বলটা সরিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে মণিকা বললেন, 'মেয়ে কি মার কিছু পায়নি ?'

'পেয়েছে বই কি।'

'কি পেল ?'

'তোমাব রূপের অনেকটা। সবটা নয়। গোড়ার দিকটা অন্তত। ভবিষ্যতে এ রূপ কেমন হয়ে ওঠে দেখবার জন্যে আমি থাকব না। সত্যি গরম লাগছে। বড় নচ্ছার এই কলকাতার শীত। শীত যাকে বলে তা তো নেই—'

'কোটটা খুলে ফেললে ?'

'আমাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।'

'এত রাতে ? কিছু খাবে না ?'

'না।'

'আমি তো তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের রান্নাঘরে, চাপা আঁচে চড়িয়ে রেখে এসেছি সব। বেশ গরম আছে।'

'কি আছে খাবার?'

'ভাত ডাল মাছের তরকারী—সবই—'

হাত পা খানিকটা কালিয়ে আসছে অনুভব করে সুতীর্থ কোটটা আবার এঁটে নিতে নিতে বললে, 'না, খাব না বেশি জিনিস কিছু। দেরাজে কমলা লেবু আছে, এক কাপ চা চাই।'

'দই আর চা খেলে হয় না, সুতীর্থ?'

'কম্বল গায়ে দিচ্ছ যে আবার? শীত করছে?'

'কটা বাজল?'

'সাড়ে এগারো। একটার সময় চা হলে চলবে।'

'অত রাত অব্দি কার উনুনে আঁচ থাকে?'

'ইলেকট্রিক স্টোভটা—'

'কিচেনে নেই। সেটাকে তো সরিয়ে নিয়েছি।'

'কোথায়?'

'অমলার বাবার বিছানার কাছেই একটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়েছি। রাতে ও'র পিঠে কোমরে সেঁক দিতে হয়; সারা রাতই। একটার সময় তুমি কেন চা খাবে?'

'তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাক। একটা দেড়টা নাগাদ।'

'আমাকে এখুনি উঠতে হবে—' মণিকা বললেন। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মণিকা দেবীর চোখের ভেতরে কতখানি উঠবার উপক্রম রয়েছে, কতটুকু আরো দু-চার মুহূর্তে বসে থাকার সঙ্কল্প—

'ভাড়ার কথা বলব ভাবছিলুম তোমাকে। পনেরো টাকা বাদ দিয়ে দু-মাসের ভাড়া দিয়েছ তুমি। কিন্তু আগেকার আরো কয়েক মাসের ভাড়া বাকি আছে।' মণিকা বললেন।

'এই রকমই বাকি পড়ে থাকবে আমার।' সুতীর্থ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'দু শো আড়াই শো টাকায় ভাড়াটে বসাতে পারি সেলামী পেতে পারি।

আজকাল আমাদের টাকার দরকার। ওঁর ভালো চিকিৎসা করাতে হবে—হয়তো চেঞ্জে যেতে হবে। ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো উপায় নেই কিছু; কোনো দিক দিয়ে কোনো আয় নেই আর।'

এবারেও সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যেই যেন জ্বালিয়েছিল সুতীর্থ, কিন্তু নিবিয়ে দিল না, ধীরে ধীনে টেনে যেতে লাগল। মণিকা বসেই ছিলেন—সুতীর্থ কোনো কথা বলবে কি না বলবে সে সবের প্রতীক্ষায় নয় হয়তো—এমনিই একটা অপরূপ হেতুপ্রভব অহেতুকতার পরিমণ্ডলের ভেতর।

'আমি তা হলে চলে যাই মণিকা দেবী—'

'কোথায়?'

'কলকাতা ছেড়ে।'

'কলকাতা ছাড়তে হবে কেন? চাকরী ছেড়ে দিয়েছ নাকি? দেও নি? তা হলে কি—বাড়ির অভাব? তা কলকাতায় কে বাড়ি পায় আজকাল। একটা কাজ কর তুমি। মণিকা হাতের পাশের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি আজকালই অমলার বিয়ে দিতে চান, তুমি একটি ছেলে যোগাড় করে দাও।'

সুতীর্থ সিগাবেটে দু-চাবটে টান দিয়ে চুপ করে ছিল, নিষ্ক্রিয়তায় রাতের ঠাণ্ডায় নিবে গেছে সিগাবেটটা। সেটাকে হাতেব কাছে দেরাজের ভেতর ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ও রকম ঘটকালি করে কি ভালো বিয়ে হয়?'

'আমাদের তো হয়েছিল।'

তা হয়নি যে তা সুতীর্থ জানে, মনকে চোখ ঠার দিয়ে অংশুবাবুর সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছেন মণিকা দেবী। এঁদের দুজনের বিবাহমিলন তাসের বাড়ি নয়, তবে খুব শক্ত বাড়িও নয়। নানারকম ভূমিকায় চিড় খেয়ে আসছে; সে রকম কোনো বিষম ধাক্কায় কি হয় কে জানে। সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় স্বর্গে কোনো শস্য ফলায় না।

'তোমার আর অংশুবাবুর বেলায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে, মানতে হবে; কিন্তু আগেকার সে সব দিন কোথায় এখন আর? তারপরে তো আরেক পৃথিবী এসে পড়েছে—'

সুতীর্থের কথায় কান না দিয়ে মণিকা বললেন, 'অমলার জন্যে ভালো বর জুটিয়ে দেবে। পারবে তুমি। এ বিয়েতে উনি এত খুশী হবেন যে, এ তিনটে

ঘর তোমাকে আগেকার প্রি-ওয়ার রেটে ছেড়ে দেবেন; দু-চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলেও খুঁৎ-খুঁৎ করবেন বলে মনে হয় না।'

জানালা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা আসছিল—শীতের রাতের হাঁকরা মুখ থেকে উদ্গারিত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কখন যে খুলে ফেলেছে গায়ে কোট ছিল না সুতীর্থের হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল যেন তার; বললে, 'আমি কি করে অমলাকে বিয়ে করি মণিকা দেবী, সে কি আমাকে ভালোবাসে?'

উত্তর দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিতে গেল সুতীর্থ। ফিরে এসে মণিকার মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ভালোবাসে না যে তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ সুতীর্থ?'

'ওর বয়স কুড়ি আমার চল্লিশ বেয়াল্লিশ পেরুল। কি করে ও আমাকে ভালোবাসবে?'

'তুমি তো ওকে ভালোবাস।'

'তাও তো বলতে পারি না। আমার পরিবার রয়েছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে সুতীর্থের জন্যে চা এল ওপর থেকে খুব ভালো চা অবিশ্যি, টি পট সুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দুধ চিনিও যা চাই সবই আছে। কিন্তু যে চাকরটা দিয়ে গেল তাকে হয়তো লাথি মেরে ঘুম থেকে ওঠানো হয়েছে—এমনই বিরস বেপরোয়া মুখ তার।

কী করবে সুতীর্থ। সারা রাত বসে চা খেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।

সাত

বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।

অফিসে যেতে হবে। বেশ চেপে দাড়ি গজিয়েছে, কিন্তু সে সব গ্যাঁজ ট্যাজ কামানো দরকার মনে করল না। চান করল না। মাথা ধুয়ে মুছে চুল আঁচড়ে কাপড়-চোপড় বদলে নিল; ঘরদোর খোলা রেখেই বেরিয়ে যাবে ঠিক করল: কী আছে তার ঘরে। দু একটা লেখার খাতা ছাড়া; আর যদি কিছু চুরি যায়, বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে সে সব, কিন্তু মাঝে মাঝে মন

স্থির করে জীবনের খুব পরিষ্কার মুহূর্তে যা সব লিখেছে সুতীর্থ সেগুলোকে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেলে—কিন্তু কে সরাবে ?—কিন্তু কেউ সরিয়ে নিলে—কিন্তু কেউ সরাবে না—কিন্তু কেউ সরিয়ে যদি নেয় তাহলে ওরকম সব পরিচ্ছন্ন প্রকাশের সুযোগ আসবে কি তার জীবনে আবার ; আসতে পারে হয়তো ; কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে ; সেটা আর ফিরে আসবে না ; নতুন কিছু আসবে ; কিন্তু পুরোনোটারও দরকার ছিল।

নীচে নামবার সময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলেছে, এমনিই তেতলার দিকে চোখ পড়তেই অমলাকে দেখা গেল—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ;—সুতীর্থকে দেখেও সরে গেল না, চোখে চোখ পড়ল ; মেয়েটির অবসর ছিল—হয়তো ফুরোবার নয়। কিন্তু সুতীর্থকে কাজে যেতে হবে ; মেয়েটির মা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে কাজে ফাঁকি দেবার কথা ভেবে দেখতে পারা যেত। কিন্তু মণিকা কোথায়, সে কি আর শীগগির দেখা দেবে। সংসার ও সময়েব নিয়মে স্ত্রীলোকটি আজ মা, অংশুবাবুর স্ত্রীও, কিন্তু বয়সে মনের গডনে সুতীর্থের নিকটতর আত্মীয় তো মণিকা ; সময়ের কণিকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রবাহে খানিকটা তাল কেটেছে, তা না কাটলে কুড়ি বছর আগে মণিকাকে আরেক নির্ণয়ের ভেতর পাওয়া যেত খুব সম্ভব—সময়ের সব রকম সমাবেশ একই আনন্ত্যে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যদিও। অমলাকে কেন গেঁথে দিতে চায় সুতীর্থেব সঙ্গে মণিকা ? আঠারো উনিশও হয়নি অমলার ; আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে, অব্যর্থ, অলজ্য বিষয়বুদ্ধি তাদের ; কিন্তু অমলা সে জাতের মেয়ে নয়, ওর মন দশ বারো বছরের শিশুর মত।

অমলার সঙ্গে কথা বলে দেখেছে সুতীর্থ ? না, তা দেখেনি। দরকার বোধ করেনি। সহমিলনের জন্যে এ মেয়েটিকে খানিকটা স্পষ্ট মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো অন্তরঙ্গতার জন্যে নয়। কিন্তু সবরকম মিলনের স্পৃহা যে চরিতার্থ করতে না পারে তার সঙ্গে কি করে প্রেম হয়।

বাস ধরতে হবে। পোয়াটাক মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সুতীর্থ হন হন করে হাঁটতে লাগল। কাল অফিসে সে যায় নি, আজ যাবার কথা ছিল এগারোটার সময়, কিন্তু এরি মধ্যে আড়াইটে বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাস দাঁড়ায় সে জায়গাটা কি যে অখাস্ত ; পাশের ফুটপাতে সিমেন্ট নেই, সবই কাদামাটির ; কাছেই একটা মস্ত বড় বিশ্রী সরকারী কিচেনের উটের মত

উনুনগুলো দিনরাত জ্বলছে, কিংবা ক্রমাগত নতুন কয়লা খেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। ফুটপাতের ওপর টিনের চেয়ারে বসে চব্বিশ ঘণ্টা শিখদের আড্ডা, চা খাওয়া, সৎ শ্রীআকালের একান্ত উপলব্ধির মত স্থিরতা কখনো—সেটায় জিগিরের মত কেমন একটা বিদঘুটে কটকটে ভাব মুখে চোখে অন্য অন্য সময় ; দড়ির খাটিয়ায় বসে শুয়ে এদিকে শিখদের ওদিকে পশ্চিমাদের হল্লা। অনবরত কিচেন থেকে ফেন নোংরা জল পচা রাবিশ গডিয়ে ছিটকে সমস্ত জায়গাটাকে প্যাচপেচে আস্তাকুড় করে রেখেছে। কলকাতার বিরাট হিক্কার থেকে ওগরানো গরু মহিষ ষাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল। এই ভাগাড়ের ভেতর দাঁড়াবার মত কোনো একটা জায়গা বেছে নিলেও এদের তাডনায় সেখান থেকে হুডকে পডতে হয়—নোংরা বাঁচিয়ে কাদা বাঁচিয়ে। অথচ বাসগুলো ঠিক এই জায়গায় এসেই দাঁড়ায়। এই সব রাবিশ ভেঙ্গে একটা মস্ত বড গলগলে নর্দমা টপকে বাসে উঠতে হবে।

সমস্ত কলকাতা শহরটাকে খুব ভাল করে ঢেলে সাজানো দরকার ; কলকাতায় সব কিছুই তো হচ্ছে, কিন্তু একটা খাণ্ডবগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে না—লণ্ডনে যেমন হয়েছিল ; তারপর উদয় হল ক্রিস্টোফার রেণের নতুন শহরের। এখানে অগ্নিকাণ্ড অতিবিলম্বিত হচ্ছে , স্বাধীনতা আসছে হয়তো, কিন্তু খুব বড আগুন বা বড় বিপ্লব না এলে রেণ আসবে না কলকাতার রাস্তা ঘাট অলিগলি ঘরবাড়ি ব্রণ খচিত এই বিরাট দুর্মুখেরও পতন হবে না তা হলে। বীথি—ঝাউ দেওদার শাল বকুল সিসু শিরীস অর্জুন সাগুদানার গাছের বীথি—পরিচ্ছন্নতা দেখার নিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপ্তি নিরিবিলিভাব শত শত মাইল জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ঝর্ঝরে নির্মল নগরীগুচ্ছের ভেতর বিতরণ একটি নগরীর,—এ রকম হলে হত, (মন্দের ভালো হিসেবে অন্তত) মনে হচ্ছিল তার। বাসস্ট্যাণ্ডের নিঘৃণ আবর্জনার থেকে দূরে সরে একটা চলন্ত বাসে উঠতে চেষ্টা করল সে। পডেই যেত—চাপা পডে হাড মাংস ছিবড়ে হয়ে যেত, কিন্তু হাতল চেপে ধরে ছুটন্ত বাসটার সঙ্গে কায়দা বেকায়দায় অদ্ভুতভাবে লড়ে হঠাৎ কখন সার্কাসের ওস্তাদের ডিগবাজিতে শরীরটা তার বাসের ভেতর ঢুকে গেল—কতগুলো প্যাসেঞ্জার হা হা করে তার পিঠ চাপড়ে তাকে সব বুঝবারই অবসরই দিল না।

'বড্ড বেঁচে গেছেন ভটচার্য্যি মশাই।'

'এই যে আসুন, যাত্রামোহনবাবু।'

'যাত্রাভঙ্গবাবু বল।'

'পরমাইর জোর আছে—'

'তা আছে বটে, তবে একটু অদলবদল হল।'

'লালমোহনের আগা কেটে মোহনলাল হল।'

বাস হু হু করে ছুটে চল ; হু হু করে ছুটে চল।

বাসে ক্বচিৎ বসবার সুযোগ পায় সুতীর্থ। আজও হন্তদন্ত গলদঘর্ম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে সে সব মানুষদের সকলেরই তিনটে হাতের প্রয়োজন। এক হাতে মাথার ওপর রড ধরে আছে, আর এক হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ পোটলা সিগারেট খাওয়া, কিম্বা সে হাত নিজের জামা, চাদর, বিশেষ করে, পকেট বাঁচাতে ব্যস্ত ; তৃতীয় হাতে তবু যথাস্থানে ঢুকিয়ে যথাসময়ে পয়সা বেব করে দিতে হয় কণ্ডাক্টারকে টিকিটের জন্যে। বিড়ির গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া, আগুনের দানা কণা,—ভালো চাদরটা বুঝি গেল, পাঞ্জাবিটাকে ঝরঝরে করে দেবার ফুটকি ফুলকি জ্বলছে চারদিকে। ও লোকটাব সমস্ত মুখে সদ্য বসন্তের দাগ—খোসা উড়ছে। এ লোকটার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যায় না, এমনই দুর্গন্ধ মুখে না গায়ে না কোথায়, তবুও লেপটে দাঁড়াতে হচ্ছে লোকটার মাংস ঠেসে—পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে, মানুষের গায়ের ঘষায়। ভারী আরাম পেয়ে শিব দৃষ্টিতে বাসেব চাতালের দিকে তাকিয়ে আছে ও লোকটা। ডান দিকের মানুষটার গরমির রোগ, সমস্ত গায়ে মুখে দাঁতের মাড়িতে কি সব চাকা চাকা দাগ ; মাড়ি কেলিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে লোকটা, হাসলেই মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, হাসছে কারুর কথার ফোড়নে নয় হয়তো—এম্নিই, জীবনের সৌকর্য উপলব্ধি করে ; বাসের মেয়েমানুষদের শ্রী ছন্দও হাসি জোগাল তার ? এ পাশের এই ফড়ফড়ে টিকি ওড়ানো লম্বা বেহারী কুর্মী না মাহাতোর সমস্ত শরীরটা কম্প জ্বরে ভেঙে পড়ছে , পুরু কালো ঠোঁট, ইঁদুরের মত ব্যাঙের মত কালো দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে, কোনোটা আছে, কোনোটা নেই, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে—কী রোগ এই মানুষটার ?

দেহাত ছেড়ে কেন কলকাতায় ? কেন বাসে চড়েছে ?

মেয়েদের সিটে মেয়ে দুটিকে অসুন্দর বলা যায় না। এদের ভেতরে একজনের অন্তত চেহারার গড়নে ভারী মনোরম মোড় রয়ে গেছে ; চোখে লাগে ; তাকিয়ে থাকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে ওঠে মানুষের নাড়ী, মানুষের মন।

কিন্তু এই মেয়েটিকে অন্তশ্চক্ষে সত্যিই অবদানের মত পাওয়া সহজ হলেও এর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করা কঠিন—এমনই অন্তর্বিরোধ রয়ে গেছে সমাজের—মানুষের মনের লেনদেন বিনিময় বিশ্বাস ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে। এ মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন আর দেখা হবে না। মণিকা দেবীর চেয়ে মেয়েটি বরনীয়া নয় অবিশ্যি, অমলার চেয়ে সুন্দর নয়, পথে ঘাটে যে নারীর সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ভালো লাগে, সে রকম আবেগ সাচ্ছল্যের একেবারে উল্টো অন্য এক পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই মেয়েটিকে দেখে সুতীর্থের ভালো লেগেছে—সত্যিই, মনে হয়েছে এর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এলে জীবনের দু একটা আবছায়ার ঘোরে আলো এসে পড়ত। অন্য কারু কারু নানারকম সব খোড়লে, খিচে আলো ফেলছে হয়তো মেয়েটি। সেখান থেকে যুগপৎ সুতীর্থকেও আলো দেবে? সমাজসম্মত হবে না, সুসঙ্গত হবে না। সব মানুষের সঙ্গেই সব মানুষের কথা বলবার নিয়ম নেই। ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য দিকে তাকাল সুতীর্থ। আরো ভিড়, ঠেলাঠেলির ভেতরে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যে মেয়েটি বাসে আছে কি নেই বুঝবারও উপায় রইল না তার। মেয়েটি চোখের আড়ালে যেতেই চুম্বকের টান কমে গেল বুঝি তার; তা হলে বয়সই হয়েছে সুতীর্থের, মেয়েটির সম্পর্কে বিতর্কশক্তিও ঢিলে হয়ে যেতে লাগল সুতীর্থের মনে। এ মেয়েটি কিছু নয়, মনে হল তার; একে এখুনি ভুলে যাবে সে। চলাফেরার মত সহজ স্বাভাবিকতা ছাড়া আর যে কোথাও কিছু ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। কে যেন পা মাড়িয়ে দিল, আরো চেপে মাড়িয়ে দিয়ে গেল সুতীর্থের বাঁ পায়ের গেঁড়টা; পাঁজরের ওপর কনুইটা এসে পড়ছে যেন কার বারবার; আস্তে সরিয়ে দিতে গেলে সে লোকটাই চোখ রাঙায়; পিছ থেকে যারা ঠেলছে সুতীর্থকে তারা মেয়েমানুষ নয়, কিন্তু সুতীর্থেব সামনে যে কালো ঢ্যাঙা বদমায়েসটা সুট পরে দাঁড়িয়ে আছে (অফিস পাড়ার একজন খানদানী অফিসার হবে) সুতীর্থ ছাড়া কেউই আর তাকে ঠেলছে না যেন এমনই ভাবে দাঁত কিড়মিড করছে সে, লোকটার বিরাট পশ্চাদ্দেশে বলাৎকারজনিত উল্লাস দেওয়া ছাড়া সুতীর্থের আর কোনো কাজই নেই যেন পৃথিবীতে অনুভব করে কী ভীষণ মরীয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

কয়েকজন লোক নেমে গেল, সুট পরা ধুমনো সামনের সিটে জায়গা পেল। বাসটা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি থামতেই মেয়ে দুটো নেমে গেল। দুপুর বেলা এই বাঙালী মেয়েরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে? যুদ্ধ শেষ

হয়ে গেছে, বিদেশী সৈনিক ও নাবিকেরাও আজ সরে পড়েছে অনেকেই—হয়তো সকলেই—নিজেদের সাগর পারে। মন্বন্তর মিলিটারী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায় সব ব্যাপারেই মৌতাত অনেকদিন হয় মিইয়ে গেছে। মেয়ে দুটো পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে চলছিল। তাদের চলে যাওয়ার ট্রিম লাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল নিতান্ত জীবনমরণের কাজের ব্যাপারেই চলেছে, কোনো নিরবলম্ব চারণায় নয়।

মেয়ে দুটির পরিত্যক্ত জায়গায় সুতীর্থ গিয়ে বসেছিস। বাস কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াতেই—এইখানেই বাস প্রতিদিন দাঁড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে—এই ভীষণ মানুষঠাসা গাড়ির ভেতর যাত্রী প্রবেশ করতে লাগল—একজন সাহেবও ঢুকল। সাহেবটি যুবক, বোধ হয় স্কচ—ছিপছিপে ছোট মানুষ—স্যুট টাই হ্যাট সবই রয়েছে, ক্লাইভ স্ট্রিটের মহাজন না ভেবে সুতীর্থ একে পাত্রী বলে ঠিক করল তবুও—স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর—একে সুতীর্থ আগেও দেখেছে যেন কোথাও। অধ্যাপক পাত্রীব মত মুখে একটা সঙ্কুল স্বয়ংতুষ্টির ভাব এব সম্প্রতি কেমন যেন একটা বিমর্ষ নিষ্ফলতার ধরণ-ধারণে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এর কারণ সুতী2র্থর কাছে অস্পস্ট মনে হল না। আজ সকালবেলার খবরেব কাগজেই সে পভেছিল যে বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেণ্ট জওহরলাল ও জিন্নাকে মেলাতে পারল না, কংগ্রেস ও লীগ যে পরস্পরের অমৃতত্ত্ব নিয়ে সমান্তবাল সেটা টের পেয়ে তারা থ হয়ে গেছে; রয়টার খবর দিয়েছে যে,

দ্য ব্রিটিশ ফীল হেল্পলেস অ্যাণ্ড থরোলি ডিজঅ্যাপয়েণ্টেড; সেই অন্তর্বেদী বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের সৎ সহজ সূচিমুখ নিয়ে হাজির এই সাহেব। কিছুক্ষণ আগেই এই বাসের ভেতয়েই একটি মেয়ে ঈষৎ অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল সুতীর্থকে, এইবারে এই সাহেবের দুটো কটকটে রাঙা কান থিতোনো কেমন একটা বিমর্ষতায় বিভোর হয়ে আগেকার কথা একেবারেই ভুলে গেল সুতীর্থ। হোটেল কণ্টিনেণ্টালের কিনার ঘেঁষে উঠেছে সাহেব—চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে—অথচ কাজ তার স্কটিশ চার্চ কলেজে নয় কি?

'আপনাকে আমি এগজামিনার্স মিটিঙে দেখেছি হয়তো'—সাহেবকে বল্লে সুতীর্থ—' ইংরেজিতে।

'আমাকে।' সাহেবটি বিস্মিত হয়ে আপাদমস্তক সুতীর্থের দিকে তাকাল, বাংলায় কথা বল্লে, উচ্চারণও অস্পষ্ট নয়—

'আপনি ভুল করেছেন—' সাহেব বল্লে।

এগজামিনার্স মিটিঙ কাকে বলে সুতীর্থকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এগজামিনার্সদের মিটিঙ,' বল্লে সুতীর্থ।

'ওঃ, সেই কঠা' কানের নাকের গালের মুলো পীচ টোমাটোর মত রক্তাক্ততার কণিকাগুলোকে আস্তে মচড়ে হাসিয়ে সাহেব বল্লে, 'আমার ভ্রাটা স্কটলাণ্ডের গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমি নই, আমার ভ্রাটার সঙ্গে হনেকে আমার আকৃটির ভুল করে ঠাকে।'

'আপনি কি স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, বর্টমানে গ্ল্যাসগোটে আছেন।'

'আপনি কি ফাদার ফরদিন্সেল ফার্গুসন ম্যাক কার্কম্যান নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা -'

সাহেব সুতীর্থকে অবিলম্বেই বল্লে, 'ফাদার ফার্গুসন নামে কোনো ফাদার কলিকাটায় আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। আমার ভ্রাটার নাম হোরেস উইলিয়ামসন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক নন, তবে অধ্যাপক বটেন—'

'আপনি কি অধ্যাপক নন মিঃ উইলিয়ামসন?'

'আমি অধ্যাপক নহি, উইলিয়ামসন নহি, হামার নাম ব্যামসে ম্যাকগ্রেগব।'

'ম্যাকগ্রেগর?' সুতীর্থ ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বল্লে, 'তা হলে আপনার ভাই কি করে উইলিয়ামসন হন?'

'বাই দ্য বাই, স্কটিশচার্চ কলেজ আজকাল কি রকম চলছে?'

'বেশ ভালোই।'

'আপনি অধ্যাপক আছেন?'

সুতীর্থ বল্লে, সে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছে, সেখানেই কাজ করে।

'আমিও ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছি। By the by, these professors—I mean British professors in Indian colleges—'

'Are you one of them?'

'Of course, not. I have already told you as much. There's is a peculiar lot—'

'The British feel helpless & thoroughly disappointed.'

'Yes, they do.'

'I hope you have seen today's paper.'

'I have. The British have done all that they had to do in the circumstances, They can't do any more.'

সহসা একটা প্রবল ধাক্কায় সমস্ত বাসটা ধেনে-কেটে ধিভিঙ্গেটডে উঠল কেন—বাঁই বাঁই, করে ঘুরে নেচে শূন্যে লাফিয়ে কী যে হয়ে গেল বুঝবার আগে সাহেবের সঙ্গে সুতীর্থের আলিঙ্গন সহমরণ শীৎকার দুর্দান্ত হামলার আকার ধারণ করল। টুপি ছিটকে পড়েছে—চশ্‌মা উড়ে গেছে—

ফুটন্ত গরম জলের ডেকচিটা যেন জীয়ন্ত হাঁস মুরগি হরিয়াল মরাল নিয়ে আট খেয়ে চীৎকাব ক'রে উঠছে—একটা বাস হয়ে গেছে ডেকচিটা ; ঝলসে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠছে মানুষের মাংস রক্ত কঙ্কাল সৃষ্টির অপর পিঠের বিরাট অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে। সুতীর্থ গলা ছেড়ে রোল করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো—'

'পাকড়ো পাকড়ো শালা শূয়ারকা বাচ্চাকে পাকড়ো'—ম্যাকগ্রেগর সাহেবের গলা কেমন যেন বিকট বখাটের মত হাউ-মাউ করে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল ম্যাকগ্রেগর ভয় যা পেয়েছে তার চেয়ে তামাশা অনুভব করছে ঢের বেশি ; বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেবার কোনো তাগিদ তার না থাকলেও জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবেই আয়ত্ত করে ফেলেছে সে ; কিন্তু তবুও নিজের মনের খেয়াল-খুশিতেই যেন জিনিসটাকে নিয়ে শেয়াল বেড়াল হায়নার রগড়ে গর্জন করে উঠবার সাধ জেগেছে তার স্কচ কেল্টিক হৃদয়ে—

একটা দুর্বার দামাল খোকার মত ম্যাকগ্রেগরের চিৎকার শুনতে শুনতে সুতীর্থ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল : ব্রিটিশের স্বভাব তো এরকম নয়, এ রকম কি ? এ লোকটা কি খাঁটি ব্রিটিশ ? মজা করছে ? বিপদের মুখে এমন ফুর্তিবজ্জাতি হয়তো স্পেনিশরা করে কিংবা ফরাসীরা—ব্রিটিশরা থাকে তো একটা দানবীয় নেঃশব্দ্যে পাথরের সানুর মতন উঁচিয়ে।

একটা মিলিটারি লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল সুতীর্থদের বাসটার। দুজন লোক মারা গেছে ; জখম হয়েছে কজন এখনও তার হিসেব পাওয়া যায়নি। আর্তের মতন চিৎকার করে উঠেছে অনেকেই ; কাঁদছে ; বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে—ভয়ে না বিভীষিকার অভিজ্ঞতায়, না হাড়গোড় হৃদয়, ভেঙে গেছে বলে—বোঝা কঠিন।

ম্যাকগ্রেগরের কিছু হয় নি—সুতীর্থেরও না। সাহেব সুতীর্থের বগলের ভেতর তার নিজের হাত ঠেলে চালিয়ে দিয়ে বল্লে, 'চলো—'

'কোথায় ?'

'হেঁটে যাওয়া যাক। বাস ঠেকে হামরা খি করে বাহিরে এলাম—' এডের মট আমরাও টো মরে যেটে পারটাম—'

'দুজন মরেছে শুধু, মরেছে কিনা ডাক্তার না এলে বোঝা যাবে না। আপনার হাড মাস কার্টিলেজ সব ঠিক আছে তো ম্যাকগ্রেগর ?'

'ঠিক আছে—'

'ডুজন প্রাণী মরে গেছে আই বিলিভ'—ম্যাকগ্রেগর 'মৃত' লোক দুটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ভয়ে—হার্ট খারাপ ছিল—শক—মে বি ব্রেণ হেমারেজ—'

'এ গাড়িতে কোনো মেয়ে ছিল না ?'

'না।'

'কোনো শিশুও নেই ?'

'থ্যাঙ্ক গড, নো।'

'আগুন জ্বলে উঠেছে।'

'এখনি ফায়ার ব্রিগেড আসবে।'

'এইসব লোকদের কি হবে ?'

'নন অব আওয়ার কনসার্ন—রেডক্রশ টেকস আপ—'

সুতীর্থকে তবুও অনর্থক এইসব মড়া আধমড়াদের সেবা শুশ্রূষা সঙ্গতির একটা বিমূঢ় প্রয়াসের ভেতর জড়িয়ে পড়তে দেখে ম্যাকগ্রেগর সাহেব চলে গেল ; যাবার আগে সুতীর্থকে নিজের কার্ড দিয়ে গেল, সেই ঠিকানায় যে কোনোদিন—সনডে একসেপটেড—সুতীর্থের সঙ্গে রাত আটটার পর সে দেখা করতে রাজি।

অতএব আজ আর অফিসে যাওয়া হল না। পরদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থের ঘরে ঢুকে বল্লে, 'আপনি আজ এসেছেন দেখছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছি ; না আজও দেরি হয়ে গেল ? বসুন।'

'বসব না আমি।'

'সিগারেট ?'

'সিগারেট সাধছেন আপনি আমাকে, বেয়াদবী হচ্ছে ।'

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বেকুবি হচ্ছে আমার মল্লিক সাহেব ।'

'তার মানে ?'

'এ ঘরে এত চেয়ার থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন ?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চারদিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ারও দেখল না, বসবে না বটে সে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে আর বাগড়া দেবে ব্যাটাচ্ছেলে—কিন্তু তবুও—চেয়ার নেই কেন ?

সুতীর্থ উপলব্ধি করে কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল ।

'বেছে একটা ছারপোকা টারপোকা নেই এরকম একটা চেয়ার নিয়েসো তো হে মনোমোহন ।'

'চেয়ার নেই কেন এ ঘরে সুতীর্থবাবু ?'

'আনছে মনোমোহন ।'

'চেয়ার নেই কেন আট দশটা এই ঘরে ।' হাঁকড়ে উঠল মল্লিক ।

'আনছে মনোমোহন ।'

'মনোমোহন কটা আনছে ?'

'কটা চাই আপনার ?'

'কটা চাই আমার ? আমার চাই কটা ?' মল্লিক টেবিলের ওপর দমাদম ঘুষি মারতে মারতে বল্লে, 'আমার কটা চাই ? এটা আপনার অফিস ? আপনি দিচ্ছেন ?'

'অফিস আপনার । আপনি আমাকে দিচ্ছেন ।'

'পথে আসুন । তাহলে কী করে আপনি আমাকে চেয়ার দিচ্ছেন ?'

'আমি দিলুম কোথায় মনোমোহন দিচ্ছে ।'

'মনোমোহন দিচ্ছে ?' কেদোর মত চোখে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে মল্লিক দাঁতে দাঁত ঘষার ভাব দেখিয়ে বল্লে, 'আর আপনি কি করছেন ?'

'আমি আপনাকে বসতে বলেছি ।'

'আমাকে বসতে ? আপনি ?'

'এই যে মনোমোহন চেয়ার এনেছে । বসুন । খুব বেশি ছারপোকা আছে এই চেয়ারে মনোমোহন ?'

'হুজুর না—' গালে হাত দিয়ে মাথা কাৎ করে হেসে ভেঙে পড়ল মনোমোহন।

সুতীর্থ বল্লে, 'মনোমোহন তুমি যাও, অত হেসো না তুমি। মনোমোহন। কি আছে হাসবার? আমরা বড্ড গলদঘর্ম হচ্ছি। যাও যাও যাও—'

মনোমোহন চলে গেলে সুতীর্থ বল্লে, 'দাঁড়িয়েই তো রইলেন মল্লিক সাহেব—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করব আমি।'

'কেন?'

'এটা আমার অফিস, মুখ সামলে কথা বলবেন সুতীর্থবাবু—'

'কি বলেছি আমি?'

'মুখ সামলে কথা বলতে বলেছি আপনাকে।'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবার—'

'একথা এখন থাক, ওটা আমার জিনিস—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবেন, তা করুন, কাল আবার তাকে কাজে বহাল করে দিলেই হবে।'

'কে করবে?'

'আপনার অফিস, আপনিই করবেন। বসুন।'

ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিয়ে সুতীর্থের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে, 'যাকে আমার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিই, তার কান কেটে তাড়িয়ে দিই। সে দুকান কাটাকে আবার কাজে বহাল করব আমি? কে দু কানকাটা আছে এই অফিসে মনোমোহনের সঙ্গে এক জোয়ালে না যুতে দিলে পেট ফুলে ওঠে?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কান কাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'আর তার যদি গণেশের মত ছটা মুখ থাকত, তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মত দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহলে কটা কান কাটা হক ?'

সুতীর্থের এ প্রশ্ন যেন বাতাসে উড়ে গেছে কানে পৌঁছয়নি এমনিভাবে চুরুট টানতে টানতে মনোমোহনের চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল মল্লিক।

'এটা আমার অফিস, আমি যাকে খুশি রাখব, তাড়াব, যখন খুশি বসব, দাঁড়িয়ে থাকব। এসব বিষয়ে কারু কোনো হাত দেবার অধিকার নেই আমার অফিসে।'

'আপনি তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন ?'

'আমার খুশি আমি দাঁড়াব। আমার যখন নিজের মর্জি তখন বসব। আপনি আমাকে বসতে বলতে পারেন না তো।'

'বসুন।'

'সুতীর্থবাবু।'

'আজ্ঞে—'

'কি বল্লেন আপনি এইমাত্র ?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়েই দেবেন ? তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'আমাকে বসতে বলছিলেন না ?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

মল্লিক কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট টানছিল, চুরুটের মুখে পুরু ছাই জমেছে সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে ফেটে পড়ে বল্ল, 'ভদ্রতা করে আপনাকে আমি আপনি বলি। আপনি আমার অফিসে আমার তাঁবে কাজ করেন। আমার তাঁবেদার—আমার অফিসের গোলাম আপনি।' বলতে বলতে খানিকটা রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে, আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বুঝতে পেরে মল্লিক সংক্ষেপে সেরে দিয়ে বল্ল, 'সাব-অর্ডিনেট আপনি, মুখ ছোট আপনার, গালবাদ্যি বাজবে না। অথচ সেটাই বাজাতে চান আপনি। বড্ড বদ রোগ আপনার। বিদ্বান মানুষ হতে পারেন, কিন্তু আমার অফিসের গোলাম ছাড়া কিছু নন তো আপনি। বিদ্যে ধুয়ে বাইরে গিয়ে জল খাবেন, এ অফিসে নয়—'

সুতীর্থ নানারকম ফাইল নিয়ে বসেছিল। ফাইল নাড়ছে, চাড়ছে, লিখছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা তবুও তার কানে যাচ্ছিল, কিছু বলতে গেল না সে। মল্লিক চুরুট টানতে টানতে পায়চারি করছিল ঘরের ভেতর; কি

যেন বলবে বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলা হয়ে উঠছিল না তার। চিঠি লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'এই যে মিঃ মল্লিক, আপনি আছেন এখনও, আমি ভেবেছিলুম চলে গেছেন—'

'আমার সামনে আপনি সিগারেট খাবেন না সুতীর্থবাবু।'

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বল্লে 'এই তো—হয়ে এল।'

'দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি ?'

'দাঁড়িয়ে আছেন, জীউকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিঃ মল্লিক। বসুন।'

'সিগারেটটা ফেলে দিন।'

'দিতে পারি ফেলে, কিন্তু ফেলে দেওয়ার চেয়ে মনোমোহনকে দিলেই তো ভালো হয়। আস্ত সিগারেটটা ফেলে দেব ?'

'আপনার মুখের সিগারেট খাবে কেন মনোমোহন ?'

'খাবে না মনোমোহন ? মনোমোহন যদি না খায় তাহলে আর কাউকে তো দেখছি, না, কে খাবে আমার মুখের সিগারেট আমার নিজের মুখ ছাড়া ?'

সুতীর্থ কথার ফাঁকে ফাঁকে—হুশ হুশ করে নয়, বেশ আস্তে, আরাম করে পেটের ভেতরে শিবের জটায় ঘুরিয়ে এনে নাকমুখ দিয়ে জোরে ধোঁয়া বার করতে করতে সিগারেট টানছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেবার সময় এসে পড়েছে।

'আসুন, চলুন—'

'কোথায় ?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'আমার ঘরে ; কথা আছে।'

সুতীর্থ গড়িমসি করে বল্লে 'বেয়ারা না পাঠিয়ে নিজে এসেই আমাকে তলব করছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনার এই—'

'আসুন, কথা বলবেন না।'

'আপনি আপনার খাস কামরায় যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে—' সুতীর্থ নিজের কাগজপত্র নিয়ে বসল।

নয়

সুতীর্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাজল সাড়ে এগারোটা। যান আপনার ঘরে গিয়ে অবসর মত একজন বেয়ারা পাঠিয়ে দেবেন আড়াইটার পর—'

'আড়াইটার পর?' বিজনহরির চোখে আগুন ঠিকরে উঠল, নিজেকে তবু সামলে নিল সে, চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি সুতীর্থ?'

সুতীর্থ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'আমাকে তুমি বলে ডাকে আমার বড় সম্বন্ধী—বেয়াইও তুমি বলে—বেয়ানও—আমার কানে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পারবেন বেয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে?'

মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল মল্লিকের।

'এই তো আমাকে আপনি বলছিলেন—'

'বিজনহরিবাবু, আপনাকে আমি তো আপনি বলছি।'

'আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

সুতীর্থ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে —'সকলেই সকলকে আপনি বললে ঠিক হয়, কিংবা সকলেই সকলকে তুমি। তুমি-আপনির পার্থক্যটা রাখা ঠিক নয়। তুমি আমাকে তুমি বলতে পার মল্লিক, কিংবা আপনি আমাকে আপনি বলতে পারেন। মনোমোহন তোমাকে তুমি বলতে পারে বিজনবাবু, কিংবা মনোমোহনকে আপনি বলতে পারেন আপনি। আমার মনে হয় আপনি বাদ দিয়ে স্রেফ তুমি চালানোই ভালো হয়, আপ পিজিয়ের দিন চলে গেছে—তুমি এসে পড়েছে।'

ডাইরেক্টরির একটা পৃষ্ঠায় এসে থেমে সুতীর্থ বললে, 'আমি অবশ্য আপনাকে আপনিই বলব মিঃ মল্লিক, তবে মাঝে মাঝে তুমি এসে পড়বে—যেমন এই একটু আগে এসে পড়েছিল তোমার। বাস্তবিক তুমির দিন এসে পড়েছে, তাই মনে হয় না তোমার?'

'ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো হচ্ছে, এই তো মনে হচ্ছে আমার—'

'রামাছাগল খাবে বলে গোল্লায় যাচ্ছে যব।'

'গোল্লায় যাচ্ছে যব?'

'হুঁ।'

'জবারির কাঁধে চড়ে গোল্লায় গিয়ে উঠছে সব?'

'জবারির কাঁধে?'

'সব রকম হারামজাদারা জড়ো হয় যেখানে সেখানেই জাল পেতে বসে জবারি।'

'জাল পেতে বসে?'

মিঃ মল্লিক চুরুট টেনে যাচ্ছিল, সুতীর্থ কি বলছে তা সে উপলব্ধি করেছে মেজাজ গরম করতে গেলে, একটা কিছু হয়েই যাবে। —এক্ষুনি এই মুহূর্তেই —কিন্তু ছুঁচোবাজির মতনও মেজাজ দেখাতে গেল না মল্লিক।

চুরুটে আরো দু-চারটে টান দিয়ে বল্লে, 'অফিসের কাজে আপনার হাত আছে। বেশ সাফাই আছে মনে করেন আপনি। আপনাকে পেয়ে সুবিধা হয়েছে অফিসের, মাথায় ঢুকেছে আপনার। এ বিষয়ে পরে কথা হবে। কিন্তু অফিসের বাইরে আপনার কথা নিয়ে বলাবলি করে ওরা। বলে চরিত্র নেই।'

সুতীর্থ একটা ডেমি অফিসিয়াল চিঠি ফেঁদে বসেছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে না তাকিয়ে বল্লে, 'ওরা কারা?'

প্যাডের থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে দু-চারবার খট খট করে টেবিলটা ঠুকে মল্লিক চুপ করে রইল, বল্লে, না কিছু।

চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে সুতীর্থ বল্লে, 'ওরা মানে ওরা। ওরা আর কেউ নয়। আমি অফিসের কাজে গাফিলতি করি বলে আমার চরিত্র খারাপ বলে ওরা?'

'অফিসের কাজে আপনি কি খেসারত করছেন তার মীমাংসা আমার ঘরে গিয়ে হবে। ওরা বলে যে আপনার কাবেকটর খারাপ।'

'মদ আমি কিনে খাই না, কোনোদিন খাইনি, তবে সব নিউজ এজেন্সির ধরণী মজুমদার, উনি, মতিস্থির, মতামত কাগজেরও সম্পাদক, মাঝে মাঝে আমাকে বিলিতি হোটেলে নেমন্তন্ন করে দেখিয়ে দেন কি করে পাঁচ পাগড়ী মদ মেরে মাথা ঠিক রাখতে হয়। ওরকম মাথা না হলে খোকা খুকুর কাঁথার নীচে ঠেসে দেবার মত এরকম সম্পাদকীয় পেতাম না আমরা।'

সুতীর্থ আর একটা ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি শুরু করতে করতে বল্লে, 'রকমটা হচ্ছে—পাঁচটে সাদা-গেরুয়া-বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাগড়ী ভরা মদ থাকবে—মজুমদার বান পারতেই পাগড়ী শুদ্ধ, মদ পেটের ভিতর চলে যাবে মজুমদারের,

কিন্তু তক্ষুনি স্বর্গদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আবার টেবিলে এসে হাজির হবে পাঁচটে কড়কড়ে পাগড়ী—আরো পাচ পাঁইট মদের জন্ত। মদে ভর্তি হয়ে মুখের ফাঁদল দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসবে স্বর্গদ্বার দিয়ে। এই রকম খেলা চলবে সারাদিন—কচ দেবযানীর খেলা।'

'মতামতের ধরণীবাবু মদ খান তা আমি জানতুম, কিন্তু মাতলামো করেন না।'

'না, বলেছিই তো আমি কচের মত ব্রহ্মচারী।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'ধরণীবাবুর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব চাই, সত্যি উনি অমানুষ নন. অত মদ মানুষ ছাড়া কেউ খেতে পারে না।'

'কেন, ভামকে মদ খাওয়াতে দেখলে সঙ্গে মদ ছাড়া আর কিছু খাবে না। মাছ ফেলে মদ খাবে।'

'ভাম কি ?'

'ভাম, ভোঁদড়, জানেন না আপনি ?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম ?'

'তবে কি ?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম ?'

'তবে কি ?'

'মাছ ফেলেও ?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নোলা ডুবিয়ে।'

'ভাম, বেড়াল খাবে ওরকম ? তাহলে ধরণী আর খেলেন কি ? কিন্তু'—সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে সুতীর্থ বল্লে—'আছে একদল মেয়েরা মজুমদারকেই পুরুষ মানুষ বলে মনে করে ভাম-বেড়ালকে নয়।'

'ভাম বেড়ালকে তো দেখেনি সে সব মেয়েরা, শুধু মজুমদারকে দেখেছে যে গো।'

ম্যানেজিং ডিরেকটর খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রেখে চুরুট টানছিল, তেমনি টেনে যেতে লাগল ; সুতীর্থের ঘরে ঢুকবার আগে দু-চার বোতল হয়ত নিড়িয়ে এসেছে—রসটা কাজে দিচ্ছে এখন।

ভামের কথা, মদের কথা, মাছের মেয়ে পুরুষ মানুষের কথা বেশ রসিয়ে বলছে বিজনহরি।

'বাংলা দেশে আজকাল বড় মানুষ নেই।'

'নেই।'

'সাহিত্যেও নেই হয়তো।'

'সাহিত্য তো পাত নাড়া, জীবনের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওর, কি করে থাকবে সাহিত্য 'ঝি, ঠাকুরঝি, বরফ চাই বাবু বাড়ীউলি, বাসড়াদের পাত নাড়া ছাড়া আর কিছু ?'

ম্যানেজিং ডিরেকটর বল্লে, 'আপনি বড় খেই হারিয়ে ফেলেন স্থতীর্থবাবু। কথা হচ্ছিল চরিত্র নিয়ে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে। সাহিত্য, মেয়েমানুষ, মদ, মজুমদারের কথা এল কোত্থেকে ?'

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, 'মদ খাওয়া কাকে বলে জানেন ?'

'আমি মজুমদারের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে ফিরি। জানি না।'

'হোটেলবয় আপনি ! ও কোন ছার। আমার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

স্থতীর্থ ফোন করবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে ঘুরিয়ে দিয়ে মল্লিক বল্লে, 'কোথায় ফোন হবে।'

'হনুমানপ্রসাদের কাছে।'

'কিসের জন্যে ?'

'সেই হুণ্ডিটা সম্বন্ধে।'

'আরো কোথাও হবে ?'

'হ্যাঁ শ-ওয়ালেসে।'

'কেন ?'

'সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে।'

'কি বলে ওরা ?'

স্থতীর্থ ভ্রূকুটি করে বল্লে, 'ফোন করে বিশেষ কিছু হবে না অবিশ্যি। আমার নিজেরই একবার যেতে হবে।'

'দরকার নেই।'

স্থতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেকটরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'কেন ?'

'কদিন অফিস কামাই করা হয়েছে ?'

'চারদিন।'

'আমাকে জানানো হয়েছিল ?'

'সময় পাইনি।'

'সময় পাননি—কাজে ফাঁকি দেবার সময় আছে গোলামের মালিককে কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই ?'

'হাতে অনেক কাজ আমার মিঃ মল্লিক, সময় নষ্ট করতে পারি না।'

সুতীর্থ কাজে মন দিতে দিতে বল্লে, 'যে গরু সত্যিই দুধ দেয়, ওস্তাদ গয়লাকে চাঁট মারে না সে, কিন্তু আমাকে মারছে কেন ?'

'কে গরু ?'

'দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে গরুটার, ফুকোর ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'কার গরু ? কোথায় গরু ? কে—গরু কে ?'

'এই অফিসটাই।'

মল্লিক বাঘ হলে সুতীর্থকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলত ডান বাঁয়ে না তাকিয়ে এই মুহূর্তেই। অত ব্লাড প্রেসার না থাকলে নির্ঘাৎ বাঘ হয়ে যেত সে। কিন্তু ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে—রক্ত তো নয়, মৃত্যুরক্ত চড়ে গেছে মাথায়। মল্লিক নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিতে গেল।—

'ম্যানেজিং ডিরেকটরই তো অফিস ?' মল্লিক বল্লে, 'আমিই তো অফিস। অফিস আমি। অফিসটা গরু ? ফুকো দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ? গরুটা যে এঁড়ে বাছুর বিইয়েছিল, সেই বুঝি ফুকো দেবে তার মাকে ? এঁড়ে বাছুর কি ধর্মের ষাঁড় হয় কখনও, সুতীর্থবাবু, না বলদ হয়ে ঘানিগাছে ঘোরে ?'

সুতীর্থ অফিসের প্যাডে দু'পাতা লিখে শেষ করেছে, আরো লিখছিল, একটা জরুরী অফিসী চিঠি ; লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে অবিলম্বেই—তিন কপি—তিন ঠিকানায়।

লিখতে লিখতে সুতীর্থ বল্লে, 'আবার চার ঠ্যাঙে দাঁড় করাতে চাই আমি গরুটাকে। ফুকো-টুকো দিয়ে নয়—আলো, বাতাস, ঘাস, ভালো জাবনা খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠুক। অফিসটাকে দাঁড় করাব আমি।'

সুতীর্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ডানদিকের র‍্যাকের থেকে একটা ব্লু-বুক নিয়ে এল।

'আমিও দাঁড় করাব আপনাকে। কার্ত্তিক মাসের কুকুরের মত দু ঠ্যাঙে দাঁড় করাব। কাল থেকে এ অফিসে আসতে হবে না আর ; আজই চলে যেতে পারেন—ইচ্ছে হলে—এক্ষুনি।'

'তাই আজ্ঞা হোক—' স্থতীর্থ চেয়ারে ফিরে এসে ফাইল নাড়তে নাড়তে বল্লে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সে। কলমটা পকেটে নিয়ে ম্যাকিনটোসটা কাঁধের ওপর ফেলে, ঘাড় কাৎ করে বিনে বাক্যব্যয়ে সে চলে যাচ্ছিল।

'ব্যাপারটা বড্ড রাজকীয় হচ্ছে হে,' মল্লিক বল্লে।

স্থতীর্থকে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যেতে দেখে মল্লিক গলা খাঁকরে বল্লে 'স্থতীর্থবাবু,'

'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা—মধ্যিখানে চর—' স্থতীর্থ এগিয়ে চলছিল।

'চাকরির হল কি আপনার?'

'কাল আসব একবার বিজনহরিবাবু।'

'কাল কেন, আজ কি হল? চাকরি করছেন, কাজ করবেন না? বাকি পড়ে আছে দশ বিশজন ইন-চার্জের কাজ—একা সামলাতে হবে আপনাকে—দেখুন তো ফাইলের ডাঁই। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ব্যাপার আমি নিজে গিয়েই ঠিক করেছিলাম। আস্থন।'

'না, আজ আর নয়।'

'আজ নয়? আজ কি সাঁইবাবা কাজ করে দিয়ে যাবে? এটা কি চীনে চম্রুর গুল্লিচা বাড়ি নাকি স্থতীর্থবাবু, কমার্শিয়াল ফার্ম নয়? আস্থন, সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা বোতল চাই আপনার?'

'একটায় হবে আপনার?'

'কেন? আছে আমার কাছে। অফিসেই আছে।'

'হুইস্কি??'

'খুব পুরোনো স্কচ।'

স্থতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'না—আমি মাঝে মাঝে একটু মোসম্বীর রস খাই, ড্রাই জিন দিয়ে।'

'ভিমটো খান আপনি—খোকা আমার। আস্থন, আমাতে আপনাতে দোর বন্ধ করে—এই ঘরে বসে।'

'অপনি খান,' স্থতীর্থ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বল্লে।

'আমি আন্দাজ মত মিশিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

মল্লিক কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল, হুজুরকে সেলাম করতেই তিনি বল্লেন, 'দু গ্লাস জল চাই।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। মল্লিক ডেকে বল্লে দুটো সোডাই বরং নিয়ে এসো।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, সুতীর্থ বল্লে, 'সোডা নয়, জল দু গ্লাস।'

দুটো সোডা এনেই হাজির করল বেয়ারা, দরকার মত গ্লাস, পেগ।

'ছিপি খুলব?'

'না, যাও।'

লোকটা চলে গেলে মল্লিক বলে, 'কাজ ঢের আছে, কিন্তু আগে মৌতাতটা হয়ে নিক।'

'কাজ হোক তবে, মৌতাতটা থাক।'

'আগে মৌতাত হয়ে নিক।'

'তাহলে মৌতাত হোক, কাজ হবে না।'

'জোর মৌতাত হবে, জোর কাজ হবে।'

'জোর মৌতাত?'

'দশ বারো পেগ হবে—বছর চোদ্দ আগে বড়দিনের সময় কিনেছিলাম বোতলগুলো, অফিসেই আছে সেই উনিশশো বত্রিশ থেকে। বেশ পেকে উঠেছে এখন।'

'বেশ, মৌতাত হোক তাহলে' সুতীর্থ বল্লে, 'কাজ চুলোয় যাক। দুটো ঘাঁৎ সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একটা দিক দেখতে পারি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে—আপনি একটু সরে যাবেন বিজনহরিবাবু, আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

সুতীর্থ নিজেই চেয়ারে এসে বসে বেল টিপতেই মনোমোহন এল।

'এই যে মনোমোহন এই সোডার বোতলগুলো নিয়ে যাও তো।' সুতীর্থ বল্লে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও মনোমোহন, সোডার বোতলগুলো এই টেবিলেই থাকবে।'

মনোমোহন চলে গেল। সুতীর্থ কাগজ পত্র টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসতে গিয়ে টের পেল কাজে মন নেই তার, কোনদিকেই মন নেই, কিছুই ভালো লাগছে না। যখন অফিসে এসে ঢুকেছিল আজ সাড়ে দশটার সময়, তখন তো, এরকম ছিল না, খুব বিশেষ উৎসাহ নিয়ে কাজে বসেছিল আজ, সন্ধ্যে অব্দি—দরকার হলে বেশী রাত অব্দি—রুদ্ধশ্বাসে একটানা কাজ করবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে—করত সে—পারত সে—অনেক অফিসি দায়িত্বের বোঝা লাঘব

করবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তার। কিন্তু হল না কিছু। স্বতীর্থ কলমটার ক্লিপ বুকপকেটে আটকে নিয়ে, কাগজপত্র দেরাজে ফেলে দিয়ে চাবি মেরে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'যাচ্ছি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে—'

'অফিসের কাজে?'

'তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাব।'

'এই অফিসের কাজে?'

'আমার মনপবনের অফিস করবার সময় হয়ে গেছে বিজনহরিবাবু,' ম্যাকিনটোসটা কাঁধে চড়িয়ে স্বতীর্থ বললে, 'চলি।'

'আজ আর কাজ হবে না?'

স্বতীর্থ দেরাজ খুলে দরকারী প্রাইভেট চিঠিপত্রগুলো পকেটে ফেলে দেরাজ বন্ধ করে দিল।

'এত জিনিস যে বাকি পড়ে রইল—'

'সব কাল এসে ঠিক করে দিয়ে যাব।'

'আপনি মনে করেছেন আপনাকে না হলে আমাদের চলে না!' মাঝপথে টায়ার ফাটিয়ে দুরন্ত ট্রাকের মত ফেটে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল।

স্বতীর্থ কোনো কথা না বলে, কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে চলে যাচ্ছিল। সোডার বোতল আর একটু হলেই তার মাথার ওপর পড়ত গিয়ে। কিন্তু সেটা—দ্বিতীয় বোতলটাও দেওয়ালের ওপর এসে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল। স্বতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বললে, 'এইবারে আমি কাজ শুরু করতে পারি মল্লিক।'

'আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে ছাড়া এ ফার্মের কোনো গতি নেই?'

'তা আছে। বোতলভাঙা কাঁচ সরিয়ে নে রে মনোমোহন—'

স্বতীর্থ বেল না টিপে পাড়াগাঁর নদীর এপার থেকে ওপারের পথিক মনোমোহনকে ডাকল যেন, কেমন একটা আশ্চর্য হুঙ্কার তুলে। সমস্ত অফিস স্তম্ভিত হয়ে শুনল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লর্ড কোর্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে—আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল।

দশ

যুদ্ধের বাজারে বিরূপাক্ষ বেশ লাভ করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সকলেই যখন সতর্ক হয়ে গেল, তখন তার মাথায় আরো বেশি লাভের খেয়াল চেপে বসতে সে ইদানীং লোকসান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকসানের হার খুব বেশি নয়—নিয়মিত লোকসানও নয়। তবুও প্রায় সব রকম ব্যবসায়েই তার মন্দা পড়েছিল। কলকাতায় ও আশেপাশে বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছে সে। বালিগঞ্জে তার একটা বাড়ি, লেকের কাছাকাছি আর একটা, দুটোই দোতলা। টালিগঞ্জের বাড়িটা বড় বেশ সুরূপা, ভারি স্নিগ্ধ, অনেকখানি জায়গা নিয়ে; বাড়িটা একতলাই, কিন্তু ছাদে যে ঘরটা আছে সেটাকে চিলে কোঠা বলা যায় না। চমৎকার কারু কারসাজির কামরা সেটা। পরিসরেও খুব বড়, সোফাসেটির অভাব নেই। একটা খাকী রং-এর সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বিরূপাক্ষ। হাত পাঁচেক দূরে একটা কমলা রং-এর গদীআলা কোচে ছিল জয়ন্তী।

জয়ন্তী বললে, 'আমার এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছ তুমি, ভালো করে জিজ্ঞেসও করিনি কোনোদিন,—ইস্কুলেই কি তোমার বিদ্যে শেষ, কলেজে ঢোকনি কোনদিন ?'

'কি ক্ষতি হয়েছে না ঢুকে ?'

'না, ক্ষতি আর কি। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা দাঁতে খড়কে দিয়ে তোমার পা চেটে বেড়াচ্ছে কমার্শিয়াল ফার্মে সিধুবার জন্যে। কিন্তু তবুও তোমার নিজেরও একটা ডিগ্রি থাকলে ভালো হত।'

'আমার নেই, আমার ছেলের থাকবে।' সামনের একটা গদীর ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে ভারি আরামে বললে বিরূপাক্ষ।

'তুমি তো ইউনিভার্সিটির সামনে থুবড়ি খেয়ে পড়লে, কলেজে যেতে পারলে না ম্যাট্রিক পাশ করলে না—'

'কিন্তু আমি তো এম এ এফ পাশ করেছি জয়ন্তী।'

'এম এ এফ কি ? আমেরিকান ডিগ্রি ? যে টাকা দেয় তাকেই দেবে—সেই ?'

'না, এদেশেরই ডিগ্রি।'

'এ দেশেরই? কি এম এ এফ?'

'ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার্ড বাট ফেইলড!' বললে বিরূপাক্ষ।

শুনে জয়তীর হেসে উঠবার কথা, কিন্তু হাসল বিরূপাক্ষ নিজেই, জয়তী অনড় হয়ে রইল।

বিরূপাক্ষ বললে—ম্যাট্রিক দিইনি আমি, কিন্তু উঠেছিলুম বেশ খানিকটা দূর—ক্লাস এইট অব্দি। তবে, ইংরেজি খবরের কাগজ ফি রোজ পড়ে বি-এ এম-এর ইংরেজি আমার রপ্ত হয়ে গেছে।'

'সেই জন্যেই তো এত টাকা করেছ। কত লাখ টাকা হল?'

'এই পঁচিশ লাখ, লেবেনচুষ হল আর কি—হি-হি-হি হিহি'—

'তা হল বটে। তা হল।'

জয়তী টাকার মর্ম জানে। কিন্তু বিরূপাক্ষ যে প্রায়ই belongs to বা belong to না বলে is belonged to বলে, বিরূপাক্ষের সেই ব্যাকরণ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার আছে কিনা তা জানতে চাইল।

বিরূপাক্ষের মনে কোনো খটকা ছিল না। ইংরেজি যা সে বলে তা বলে বটে এমনই একটা সেয়ানা মাহাত্ম্যে জয়তীর দিকে তাকাল সে, 'is belonged সিঙ্গুলার হলে যেমন—This house is belonged to me—প্লুরাল হলে are—'

'আমি ভাবছি যারা লেখাপড়া শেখে তারা প্রামাণিকও বটে কিন্তু অসারও বটে। বানান ঠিক রেখে দলিল লিখতে জানে তারা, অফিসে ড্রাফট তৈরি লেখে খবরের কাগজে বড় জোর বই বার করে—' জয়তী বলছিল।

'বই? সে বই পড়ে কে?'

'আমি অবিশ্যি তাদেরই বই পড়ি মাঝে মাঝে। কবিতা, গল্প, ইতিহাস, মেসমেরিজম, আইনকানুন, ইকনমিকস, দর্শন, কত কি। পড়ে খারাপ লাগে না। তবুও ওসব মানুষদের আমি চাই না।'

আকৃষ্ট হয়ে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বই লিখলে হবে কি—ওরা পরের বাড়ির ভাড়াটে। নিজেদের বাড়ি নেই—গাড়ি নেই।'

'না, ওরকম গরীব মানুষ দিয়ে কি হবে? লেখাপড়া কি হবে কাপড়ে ফুটো বেরুতে থাকলে? তালি মেরে মেরে মরে যায় মানুষের মন। তার

চেয়ে is belonged ঢের ভালো। ব্যাঙ্কে তো লাখ পনের কুড়ি আছে—' জয়তী একটু ঝাল মিটিয়ে হেসে বললে।

সেটা যে কিসের ঝাল বিরূপাক্ষের খেয়াল ছিল না সম্প্রতি।

'কিন্তু লেখাপড়া-অলাদের সকলেই কি গরীব জয়তী?'

'খুব বেশী গরীব হয়তো ওদের সবাই নয়। কিন্তু তোমার মতন বড়লোক ওদের ভেতরে কজন?'

জয়তী ভাবছিল; এ লোকটা সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে। ভোরবেলা মাটির ভাঁড়ে দিশি মদ দিয়েই শুরু করেছে। ঘরে হুইস্কি ছিল, পোর্ট ব্রাণ্ডি ছিল, কিন্তু নিষিদ্ধে মন ওর কঞ্জুষ ওর আত্মা—ও তো সর্বদিক দিয়েই একটা গাড়োল—বেওয়ারিশ—শুধু টাকার দিক দিয়ে নয়। টাকা ওর লক্ষ্মী, ও হাত পাতলেই ওর এঁটো কাঁটা আস্তাকুড় লক্ষ্মীর ঘড়ায় ভরে ওঠে।

'তুমি বড়লোক দেখেই তো তোমাকে আমি বিয়ে করেছি', জয়তী বলল।

'বিয়ে করেছ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'বিয়ে করেছ জয়তী তুমি আমাকে? সব সময় সব কথা খেয়াল থাকে না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ওতোরপাড়ায়—না? গঙ্গার ধারে? সামিয়ানা টাঙিয়ে? যেন মাঘ মাস—না জয়তী? সেটা মন্বন্তরের বছর। কালোবাজারে চাল ছেড়ে বড়লোক হচ্ছিলুম—কিন্তু আমি তোমাকে কি করে বিয়ে করলুম?'

পরদিন বিরূপাক্ষের মদের নেশা কেটে গেছে। মাথা অনেকটা পরিষ্কার। টালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার ঘরে জয়তীকে নিয়ে বসেছিল সে।

'আজ আমার মনে পড়েছে। তুমি এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে—সেটা মন্বন্তরের সময়। অত পড়াশুনো করেও ডানাকাটা পরীর মত চেহারা ছিল তোমার। আমি পড়েছিলুম ক্লাস এইট অব্দি—চেহারা আমার বেশি লম্বাচৌড়া নয়, এই কৌৎকামাছের মত—খুব কালোকালো নয়, ঘাড়ে গর্দানে খানিকটা—যাকে বলে হোঁৎকা—সেই জন্যই আমার বেগ পেতে হয়েছিল—'

জয়তী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আর্ট ও থিয়েটার সম্বন্ধে একটা বিশেষ বই কিনে এনেছিল আজই, পড়ছিল; খুব মন দিয়ে পড়েছিল; বইটা ভাল লাগবার কথা। কিন্তু বুকের ভিতর কেমন ঢিবঢিব করছিল তার।

'কিন্তু জয়তী—'

জয়তী বইটা বন্ধ করল।

'আজকে কেন এসব কথা মনে পড়ছে আমার ?' বিরূপাক্ষ বললে।

জয়ন্তী বই খুলে পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।

'শোন বলি জয়ন্তী—'

'বই রাখ শোন—' বিরূপাক্ষ বললে।

'আমি শুনেছি তোমার কথা।'

'আমি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাই।'

'সে আমি জানি—সে তো অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে—'

'তুমি আমার স্ত্রী—'

'কুড়ি পঁচিশ লাখ তোমার ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্সে। আমার স্ত্রীত্বের প্রমাণ তো সে সব দলিলেই আছে। কটা ইনসিওরেন্স ? ছটা তো ? না নতুন করেছ আরো ?'

'না, ছটাই।'

'পাঁচটা অ্যাসাইন করেছ আমাকে। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সটা তো অ্যাসাইন করা হল না এখনো। কাকে করবে ?'

'তোমাকে।'

'আমি চাপ দিচ্ছি না তোমাকে।'

'চাপ খাওয়ার ছেলে আমি ? ব্যাঙ্কে সব টাকা তোমার নামে জমা দিয়ে রাখতে বিয়ের পরই তো বলেছিলে তুমি ; গত বছরও বলেছিলে ; কিন্তু এ বছর আর বলছ না কেন ?'

'ব্যবসা তোমার, ব্যাঙ্ক তোমার, ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট তোমার, আমার কাছে চেক বই রেখে কি হবে ?'

পাঁচ লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট তো তোমার নামে রয়েছে লয়েডসে।'

'কিন্তু পঁচিশ লাখ তো তোমার।'

'সে তো লাইফ ইনসিওরেনসের টাকাগুলো ধরে। ব্যবসা মার খাচ্ছে, ব্যবসা চালাতে হচ্ছে আমার ; ইনসিওরেনসের মোটা মোটা প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। ব্যবসাগুলো তোমার হাতে গুছিয়ে নিলে সব ব্যাঙ্কের সব টাকাগুলো তোমার হিসেবে লিখিয়ে নিও—' বিরূপাক্ষ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি যে আমার স্ত্রী ব্যাঙ্ক ইনসিওরেনসের দলিলে তার প্রমাণ রয়েছে তুমি বলছ আমরা হিন্দুমতে বিয়ে করেছিলুম, হিন্দু আইন কি বলে তোমার স্ত্রীত্বের কথা ?'

‘যা বলবার তাই বলে।’

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, ‘ইনসিওরেন্সের চেয়ে বড় দলিল হিন্দু আইন?’

‘বড়ই তো।’

‘ব্যাঙ্কের চেয়ে?’

‘হ্যাঁ—বড়।’

বিরূপাক্ষ এই সব কথা শুনতে চায় শুনে কেমন একটা পরিতৃপ্তির সপ্তমে গিয়ে বসে থাকতে চায় সে—নিবিড় ও নিস্তব্ধ হয়ে নয় সে শক্তি বিরূপাক্ষের নেই—কিন্তু এমনিই নড়ে চড়ে, কাত হয়ে উবু উটকো হয়ে জয়তী যে তার স্ত্রী সেই স্ত্রীত্বের কি যেন একটা মর্মাস্তিকভাবে গোপন মধুর মন্ত্রসিদ্ধিকে দুরপনেয় কীটশক্তিমত্তায়—একা কীট সৃষ্টির ভেতরে, একা কীটই যেন সে—একাই পান করতে চায় সে। জয়তীকে যখন সে প্রথম বিয়ে করেছিল বছর তিনেক আগে তখন জয়তী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের কথাও ভাবতে পারত না বিরূপাক্ষ। এ তিন বছরে নানারকম স্ত্রীলোকের কাছে গিয়েছে বটে সে, কিন্তু তিন বছরের ভেতর দু বছরেরও বেশি নিজের বাপের বাড়িতে কাটিয়েছে জয়তী; গত ছ’মাসও জয়তী বাপের বাড়িতে ছিল, মাত্র তিন-চার দিন হল বিরূপাক্ষের এখানে এসেছে। দুর্দমনীয় আসক্তিশক্তি ফিরে পেয়েছে কীট আবার—অমেয় উল্লোল সৃষ্টির।

‘তুমি হিন্দু স্ত্রী, আমাকে ছেড়ে যাবার কোন ক্ষমতা আছে তোমার?’

জয়তী বইয়ের দু-এক পাতা উলটে বললে, ‘আমি কি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি?’

‘বাপের বাড়িতেই তো থাকছ, আড়াইটে বছর কাটালে—’

‘এখন তো এসেছি।’

‘এসেছ তো আসছ যাচ্ছ। চলে যেতে বাধা কি তোমার?’

‘কোথায় চলে যাব?’

‘কেন, তোমার বাপের আস্তানায়। গরীবের মেয়ে তো তুমি নও যে আমার টাকা তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে। তোমার বাবা শুনলুম ও-বি-ই পেয়েছেন—’

‘হ্যাঁ।’

‘ও-বি-ই মানে কি?’

‘মানে ওব্।’ জয়তীর ঠোঁটের কোণে দু-চারটে রেখা—হাসি নয়—দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'ওব্ ?'

'এন-আই-ও-বি ই কি হয় ?' সেই গ্রীক মহামায়ের নাম মনে পড়াতে জয়তী বলল বিরূপাক্ষকেই।

'দাঁড়াও বলছি তোমাকে—দাঁড়াও—কি বললে, এন-আই ? তারপর ?'

'এন আই ও বি ই।'

বলছি তোমাকে—এন আই ও জি ই—নিয়োগী তো নিয়োগী।'

'জি নয় বি, নিয়োগী নয়—। তোমার কুড়ি লক্ষ যদি আমার জন্যে খানিকটা কথা বলে তা হলেই হবে, এটাকে নিয়ে আর ঘাঁটিও না। কি বলছিলে তুমি হিন্দু আইনের কথা ?'

'বলেছিলুম তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতে পার—ঘাঁতঘোৎ তোমার সবই জানা ;—কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে আইনে ঠেকবে।'

'ঠেকবে, না ঠেকবে জানি না কিছু আমি। কিন্তু আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছি কে বললে তোমাকে ?'

জয়তীর মুখ চোখ প্রশ্ন সত্য স্বচ্ছ ঠেকল বিরূপাক্ষের কাছে। মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না—এখন তো নয় ; বিরূপাক্ষের টাকার জন্যে—বিরূপাক্ষের নিজের জন্যেই হয়তো টান আছে জয়তীর। স্ত্রীর মুখের দিকে আবার তাকাল বিরূপাক্ষ ! মুখের ওপর কেমন একটা সত্যার্থের আভাস দেখে ভরসা পেল সে।

'তুমি এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে, বি-এ-তে ইংরেজীতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে। তুমি উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরের মেয়ে, দক্ষিণ কলকাতার বড়লোকের ভাগনী, তোমাকে কে পায় বলো তো দেখি—'

হাতের সিগারেটের আগুনে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিতে গিয়ে এক আধ মুহূর্ত চুপ করে রইল বিরূপাক্ষ। বাইরে রোদ, নীলিমা, ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর দেওয়ালের গায়ে ডানার ছায়া ফেলে অদূর দিগন্তের পুরুষ চিল ও মহিলা পাখির চংক্রমণ ; অনেক দূরে একটা অ্যাকেশিয়া গাছে ফুল ধরেছে। অ্যাকেশিয়া না চেরী অবাক হয়ে ভাবছিল জয়তী। হয়তো অন্য কোনো গাছ। এত শীতে তো অ্যাকেশিয়ার ফুল ধরবার কথা নয়। কবে ফুল ফুটবে, সাদা মেঘ আর নীল মেঘের মত নীল আকাশের গায়ে বিছানো সবুজ কৃষ্ণচূড়ার ? বাইরে অপরিমেয় রোদ, প্রিয় মহানুভবের মত মুখচ্ছবি কত

বড় বিশাল আকাশের পৃথক নিঃশব্দতার মত; মহাপ্রলয়ের স্থিতিতে উৎসারিত করে চলেছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

আশ্চর্য কোনো সংস্রবই নেই যেন বিরূপাক্ষের ঘরের ভেতরের মানুষদের সঙ্গে বাইরের সচ্ছল স্বাধীনের; তিল ধারণের তিল অধিকার করে চারদিককার তিলাতীত যত তিল—আলো-মেঘ-পাখি এখানে—ওখানে—সবখানে; ভাবছিল জয়তী।

আমি তোমাকে পেয়েছি। পেয়েছি বই কি। আইনেও পেয়েছি—এমনিও। তোমার সঙ্গ-টঙ্গ চাই। তুমি আইনত স্ত্রী তো, দিচ্ছ টিচ্ছ কিছু ভালবাসাও চাই। কিন্তু চাইলেই হল? তুমি হওয়ালে তো।'

বিরূপাক্ষ আজো যে এনতার জল খেয়েছে শুধু, মদ খায়নি, বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়তীর। পেটে নির্মল জল ভজভজ করে না কোনোদিন এই লোকটার; আজ একটু বেশি গেঁজে উঠেছে। কোনো দিশপাশ খুঁজে পাচ্ছিল না জয়তী। নিজের হাতের বইয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'আমার মন বলেছে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

'দিশী মদ চাচ্ছে তো তোমার মন; এখন?'

'আজ আমি মদ খাব না।'

'কেন? খোঁয়ারি ভাঙতে হবে?'

'তুমি আবাব বাপের বাড়ি চলে যাবে না তো?'

'তা আমি এখন কি করে বলি?'

'কি বলতে চাচ্ছ বুঝিয়ে বল।'

'দরকার হলে চলে যাব।'

'তিনবছর তো আমাদের বিয়ে, আড়াই বছর তো কাটালে শশধরবাবুর নেকনজরে। এই তো ছ' মাস কাটিয়ে এলে আবার চলে যেতে চাচ্ছ আবার। কেন, আমি কি তোমাকে বিয়ে করিনি?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে টান মেরে ঘর ভর্তি ধোঁয়া জমিয়ে তুলে বল্লে, 'তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

'আমি?'

জয়তী নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে, 'কৈ না তো।'

'মনে হচ্ছিল, তোমাকে হাঁপাতে দেখলে আমার ভয় করে।'

'মিছে ভয়।'

'আমি সিগারেট খাই তাতে কি তুমি দুঃখ পাও ?'

'কেন পাব ?'

'প্রথম প্রথম তো বাধা দিতে আমাকে সিগারেট খেতে দেখলেও। তাড়ি তো খাচ্ছি ; বিলিতি দিশি জল সবই ; আজকাল যে মুখ বুজে থাক তুমি সব দেখে শুনেও ? এটা ভালো লাগছে না আমার। মেঘ যখন জমতে থাকে, আকাশ চুপ করে থাকে। চুপ করে আছ তুমি, মদ খাচ্ছি আমি, মদ খাওয়া ছাড়ব না। কিন্তু মদ খাওয়ার সময় তুমি এসে নথ নেড়ে বাধা দেবে সেটা আমি প্রত্যাশা করি। মদ খাওয়ার সময় তোমার খ্যাংরা খেতে ভাল লাগে আমার—এ হে-হে-হে-হে।'

বিরূপাক্ষ হাতের জলন্ত সিগারেটটাকে শেষ দু'চারটে টানের থেকে রেহাই দিল, অ্যাশট্রেতে না ফেলে মেঝের কার্পেটের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষতে লাগল। এ ঘরের এই চমৎকার জয়পুরী কার্পেটের ওপর ধুলো, সিগারেটের ছাই তো দূরের কথা, এক চিলতে পরিষ্কার কাগজও উড়ে এসে পড়তে দিত না জয়তী একদিন,—আড়াই বছর আগে। কিন্তু সিগারেটের আগুন দিয়ে গালচেটাকে পুড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে সিগারেটের কালি মেড়ে দেওয়া হচ্ছে ? কি বলতে চায় জয়তী ? কিছুই বলছে না। বিরূপাক্ষের আগের কথারও কোনো উত্তর দিল না সে। একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে গালচের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বিরূপাক্ষ।

'মদ খেয়ে শরীর সুস্থ আছে তো তোমার।' জয়তী বল্লে।

'তা আছে। এ কার্পেটটা ইনসিওর করিনি আমি।'

দুটো দেশলাইয়ের কাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়ে কার্পেটে ছড়িয়ে দিল বিরূপাক্ষ।

'বাতাসে নিভে যাচ্ছে তো তোমার দেশলাইয়ের আগুন।'

'অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে গালচে, কেমন দেখাচ্ছে ?'

'বেশ নতুন ধরনের একরকম হল।'

'পুড়িয়ে ফেলব কার্পেটটাকে ?'

'কেরোসিন ঢেলে নিতে হবে দুচার টিন।'

'তাহলে তো বাড়িটাও পুড়তে থাকবে। ফায়ার ব্রিগেড আসবে। পুলিশ আসবে।'

'আসুক, আসবে।'

'কিছু হবে না তাতে ?' জিজ্ঞেস করে একটু থেমে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'বাড়ি তো ইনসিওর করা নয়। বাড়ি তো ইনসিওর করিনি এখনও।'

না করেছে, মিটে গেছে। বাড়িটাকে ইনসিওর করলেও হয়, না করলেও হয়, সেটা বিরূপাক্ষ বুঝবে; জয়তীর মনের প্রেম যেন অন্য কোথাও, অন্য কোন পুরুষ বা বাড়ি আশ্রয় করে না হলেও, এই পুরুষটি ও তার বাড়ির ত্রিসীমার নয় যেন, অনুভব করতে করতে মনের প্রশান্তি ফিরে পেল জয়তী। কিন্তু এও সে জানে, এ বাড়িটা পুড়বে না, গালচেটাও না। বাড়িটা পুড়লেও বীমা করে রেখেছে বিরূপাক্ষ। করেছে।

'মদ খাচ্ছি। খাওয়াটা খারাপ নয় ?'

'তোমার শরীর তো সুস্থ থাকছে। কেন খারাপ হবে ?'

'সুস্থতার কথা নয়; এম্নিই, ওটা ভালো ?'

'খুব সম্ভব ভালো—তোমার পক্ষে।'

'কেন ?'

জয়তীর কিছু বলবার ছিল না। বইটাও পড়া হচ্ছে না। বুজিয়ে রেখেছে হাতের ভেতর। খুলে পড়বে কিনা ভাবছিল।

'মদ খেয়ে আমার লিভার পেকে উঠবে, এই তো চাও তুমি।'

'তোমার লিভার আছে ? না থাকলে তা পাকবে কি করে ?'

বিরূপাক্ষ একটু হেসে বল্লে, 'হাঁ জী, হাঁ হাঁ জী, হাঁ, ইয়ে আচ্ছি বাৎ হ্যায়। যে সব মেয়ের জ্ঞান পবন আছে, তারা স্বামীর মদের গেলাস ভাঙতে যায় না, কিন্তু মোলায়েম হাতে কান টেনে মাথা নিয়ে আসে। তুমি আমার কর্ণমূল ধরে টান দিয়েছ জয়তী। আমি বুঝেছি তুমি আমার মদ খাওয়া পছন্দ কর না। আমি বুঝেছি। গুরুমা তার ছেলেদের ধমকে পিটিয়ে একরকম কথা বলে। মা গোঁসাই তার বড় চেলাকে নিজের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে আর এক ধাঁজে কথা বলে—এই যেমন তুমি বল্লে। বুঝেছি আমি। কিন্তু মদ ছাড়া খুব কঠিন, কিন্তু মদ ছাড়ব আমি। ছাড়ব আমি। মন্মথ, অ—মন্মথ !' বিরূপাক্ষ গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'হুজুর !' বলে মন্মথ হাজির হতেই বিরূপাক্ষ বল্লে 'দু বোতল সোডা, গেলাস, ডিকাণ্টার, পেগ আর ঐ একেবারে কোণার ঘরটার থেকে খুব ভালো বিলিতি যা হাতের কাছে পাও—বিয়ার, ভেরমুথ, জিন, রাম আর রামছাগল ছাড়া—নিয়েসো তো চট করে। আমি আজ খাব মদ কাল খাব, পশু খাব,

তারপর খোঁয়াড়ি ভাঙব, তারপর থেকে আস্তে আস্তে মদ খাওয়া ছেড়ে দেব ভাবছি মন্মথ। জয়ন্তী চাচ্ছে তাই। মদ দিয়ে ধোলাই করে আমার লিভার পাকিয়ে দিচ্ছে জয়ন্তী। বুঝলে মন্মথ—বলি বুঝলে হে মিটমিটে মন্মথ—'

বিরূপাক্ষ মন্মথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে চোখ নাচাল—ডানে বাঁয়ে কান্নি মেরে দুমড়ে তুবড়ে ঠাস করে একটা চড় মারল মন্মথকে।

মন্মথ ভিরমি খেয়ে—নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে দোরগোড়ায় গিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল : হা হা হা হা করে হেসে উঠল বিরূপাক্ষ।

এটা বিরূপাক্ষ মন্মথর একটা খেলা ভালো লাগছে না—জীবনটা কেমন যেন লিম্ব্ হয়ে গেছে মনে হল—হো হো হো হো করে একদল হায়নার মত হেসে ওঠে এরা দুইজন।

এগারো

পরদিন সকালবেলা ছাদের ঘরে বসেছিল বিরূপাক্ষ। কালকের সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের আর্ট ও থিয়েটারের ওপর বইটা পড়ছিল জয়ন্তী ; গ্রীক থিয়েটার সম্পর্কে কি লিখেছে দেখছিল।

বিরূপাক্ষ দূরে একটা কৌচে বসে সিগারেট টানছিল ; বল্লে, আমি তোমাকে যা বলছিলুম—'

মন্মথ গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেল বিরূপাক্ষকে। সিগারেটটা ফেলে দিল বিরূপাক্ষ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের রাস্তায়। গড়গড়ার নলটা আড়ষ্টভাবে টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে দু-একটা আলতো টান মেরে জয়ন্তীর দিকে ভালো মনে করে তাকাতে গেল সে ;—কামনার চেয়ে শুভেচ্ছার প্রেরণায়। কিন্তু সে চোখে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বোবা রসিকতায় লিপ্ত—পাড়াগাঁর বাড়ির আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো রংই ধরা পড়ল না···অনুভব করে কেমন যেন লাগল জয়ন্তীর, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে দূরের রৌদ্র প্রাণবত্তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আমি তোমাকে আমার পেড়াপেড়ির গল্পটা শোনাতে চাচ্ছিলুম আবার। গল্পটা যতবার বলা যায়—পুরোনো হয় না—শোন তুমি বি-এতে সেকেণ্ড ক্লাস

অনার্স পেলে। আমি অত শত জানতুম না। আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ফেডারেশন না কি—তারি একটা মজলিসে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলুম—' বলে তামাক টানতে লাগল বিরূপাক্ষ।

গড়গড়ায় জলতরঙ্গ, হাওয়ায় অম্বুরি তামাকের গন্ধ।

'আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শৈলেন। শৈলেনের কথা মনে আছে? তোমাদের সভাসমিতির ছাত্রছাত্রীদের সে তো একজন বড় স্পনসর ছিল—?'

'স্পনসর?'

'না, কি বলে ওকে? স্পনসর নয়?'

'সভাসমিতির স্পনসর হতে পারে—ছাত্রছাত্রীদের নয়—'

'তা হলে চাঁই বলব?'

'বলতে পার।'

'চাঁই আর স্পনসর এক নয়?'

'না। তুমি বরং ইংরেজি শব্দ নাই ব্যবহার করলে, আমি তো বাংলা জানি—'

'ঠিক বলেছ।' গড়গড়ার নল মুখে না দিয়ে সেটাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সাপছেনালি খেলিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'তুমি এত ইংরেজিনবিশ, অথচ আমি কিছুই জানি না। আমাকে শেখাবে? তোমার মত শেখাতে পারে কে আর বল?'

'ও জিনিস শেখানো যায় না—' জয়ন্তী এক কথায় সেরে দিয়ে বল্লে, তার পরে কথা একটু বাড়িয়ে ফেলে বল্লে, 'যে নিজেই মুন্সী তাকে শেখানো যায় না।'

বিরূপাক্ষ তামাক টানছিল, একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে তামাক টানতে লাগল আবার: যেন হোঁদড়ে হরিণীতে শীত-সকালের কথিকা তৈরি হচ্ছে নদীর এপার-ওপার থেকে।

'শৈলেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেছল বলেই তো তোমাকে দেখতে পেলুম। পরে জানতে পেয়েছিলুম তুমি ইউনিভার্সিটির জয়ন্তী পণ্ডিত। কিন্তু সেজন্যে নয়, তোমাদের বনেদী ঘরের জন্যেও নয়, তোমার নিছক নিজের জন্যেই তোমাকে আমি দেখেই ভালবেসেছিলুম। সেদিনই সঙ্কল্প করেছিলাম পৃথিবীতে যদি বেঁচে থাকতে হয় তা তোমার মত মেয়েমানুষের মিষ্টি জুতো খেয়ে। সে সঙ্কল্প আমি কাজে ফলিয়েছি।'

'কিন্তু যেরকম চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম,' জয়ন্তী একটু

হেসে বল্লে, 'সে চামড়া তো গোরু-ছাগলের পিঠে পাওয়া গেল না—একটু নিরেস লাগছে না জুতোটাকে তাই ?'

জয়ন্তীর বাঁকা কোঁকড়ানো কথাটা একটু সোজা সরল করে নিয়ে বুঝে দেখতে চাইল, কিন্তু কি বলতে চাইল জয়ন্তী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বিরূপাক্ষ।

'কিন্তু মানুষের চামড়ায় তো জুতো বানানো নিষেধ'—জয়ন্তী বল্লে।

জয়ন্তীর মুখ চাপা আঁচের অঙ্গারের মত হয়ে উঠল। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না। তার অনুভূতি উত্তাল লিঙ্গশক্তির প্রকর্ষে জায়গাজমি ঘরদোর গাড়ি তৈরি হয়, মেয়েমানুষও দখল হয়, কিন্তু সে সব মেয়েমানুষের আত্মা যে শরীরটাকে খোলসের মত ফেলে বিদায় নেয়। যখনই বিরূপাক্ষের মত একজন লোকের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়—তা জানে না বিরূপাক্ষ। না জেনে লাভই তার।

শীতের এ কটা রাত শুয়োরের মত সঙ্গ সুখ খুঁজেছে বিরূপাক্ষ : না পেলে আহত হয়েছে—শুয়োরের মত, মানুষের মত নয়।

'তুমি সাইকোলজিতে এম-এ পড়ছিলে। আমাদের দেশে এত রূপ থাকে ? তা থাকে—আমাদের দেশেই থাকে—অন্য কোথাও না, বাঙালীঘরের সেই রূপ তোমার। সকলে বলছিল তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাবে। তোমার ছাঁচি মিছরি খেতে মাছি মশা বোলতা বিষ পিঁপড়ে গাঁধিপোকা ফড় ফড় করছে, কিন্তু—তবুও কি করে মাইফেলে তোমাকে আমি পেলুম জয়ন্তী। এ সংসারে এরকম সফলতা পেতে দুটো জিনিসের দরকার—এক টাকা, আর এক জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা—'

বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, 'টাকা অবিশ্যি আমার চেয়ে কারু-কারু আরো ঢের বেশি ছিল। কিন্তু কালোবাজারে আমি কামিয়ে নিচ্ছিলুম। মন্বন্তরের সময় তখন, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল ; মানুষের হাড়ের—' বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে এক টান মেরে সেটা ফেলে দিল লোক কোলাহলের চলাচলের রাস্তা তাক করে।

'কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে তোমাকে তো আমি কিনে নিতে পারিনি। ওয়ার কন্ট্রাক্টে, ব্ল্যাক-মার্কেটে যত টাকাই করি না কেন, আমি তো ভাগাড়ের শুকনির বাচ্চা—মফঃস্বলে জমিদার সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন—মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন। বাবার কথা বলছি।'

নল মুখে দিল বিরূপাক্ষ।

'তোমার সে সব ধর্মভাইদের ভেতরে এমন অনেক বনেদি ছোকরা ছিল যে আমার আজকের সমস্ত ব্যবসার গুডউইল কড়ে আঙুল দিয়ে কিনে নিতে পারে।'

'কে ছিল সে রকম?'

'তুমি জানতে না?'

'আমি শুনিনি তো কোনোদিন—শমীন, রবি, মনোতোষ, সুব্রত, নীরেন—কার কথা তুমি বলছ?'

'এদের কারু আমার চেয়ে বেশি টাকা আছে জানলে তাকে বিয়ে করতে তুমি?'

'কার আছে সেরকম টাকা এদের ভেতর?'

'এদের সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট জানা আছে তোমার?'

'চার-পাঁচ লাখের বেশি নেই শমীনদের। স্থাবর-অস্থাবর সব নিয়ে লাখ দশের বেশি হবে না। কিন্তু শরিক তো অনেক। শরিক সকলেরই।'

'বাস্তবিক, একেবারে প্রাগে এসে হাত দিয়েছেন শশধরবাবু—যাই বল তুমি। মা বাপ ভাই বোন কেউই তো নেই আমার। আমি ভেবেছিলুম সেইটে আমার দোষ বিয়ের বাজারে। কিন্তু সেইটে আমার গুণ হল। আমার সম্পত্তিটা যে এজমালী নয়। আমার যে শরিক নেই সেটা আমার চেয়েও আগে বুঝে ফেলেছেন শশধরবাবু আর তার মেয়ে। সত্যিই এদিকে মাথা খেলেনি এতদিন আমার। তাই তো—' বিরূপাক্ষ নল মুখে দিয়ে বল্লে, 'আমি তো একা, কোনো শরিক নেই তো আমার।'

'আমি তো আছি।'

'তুমি তো আমার স্ত্রী—শরিক তুমি? শরিক নও তো।'

'তোমার ভাই থাকলে শরিক হত? স্ত্রী হিসেবে সম্পত্তির শরিক-টরিক আমি নই, ঢের বেশি; ওটা আমারও—পুরোপুরি।'

'তা তো ঠিক'? তামাক টানতে টানতে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'আমি মরে গেলে আমার কোনো ওয়ারিশ না থাকলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হয়তো তুমিই পাবে—'

'কারো বাঁচামরার কথা হচ্ছে না; কিন্তু আর কোনো ওয়ারিশ নেই, আমিই পাব সব।'

জয়ন্তী প্রাণের গরমে কথা বলছে টের পাচ্ছিল বিরূপাক্ষ; এরকম নতুন টাকার মত চনচন করে বেজে উঠে জয়ন্তীকে কথা বলতে প্রায়ই শোনা যায় না—আজকাল তো একেবারেই না; কিন্তু তবুও আজ বেশ বোল তুলে কথা বলছে জয়ন্তী। টাকা মানুষকে কথা বলায়, প্রেম নয়, প্রণয় নয়, লালসাও নয়। বিরূপাক্ষ চোখ বুজে নল টানছিল, বল্লে, 'না কেউ পাবে না আর তুমি ছাড়া। তবে ভারি গোলমেলে এই সংসারটা, ভারি গোলমেলে আইন আদালতগুলো—'

'কি করবে আইন-আদালত আমার নামে সব লিখে ঠিক করে রাখলে—'

'হয়তো পঁচিশ লাখের পনের কুড়ি লাখ তোমাকে দিল, বাকি টাকা আটকে রাখল—'

'কি করে আটকাবে?'

'নানারকম ফ্যাকড়া বেরিয়ে পড়ে আইনের। যে মানুষ বেঁচে থেকে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে মরে যায়, সে মরে গিয়ে আর বেঁচে উঠতে পারে না তো। কিন্তু সে বেঁচে ফিরে না এলে আইন খানিকটা গোলমাল করবেই—'

'করবেই? তুমি লিখে দিয়েছ কাউকে সম্পত্তির কিছু?'

'কাউকে না।'

'আমি ছাড়া তোমার ওয়ারিশ আছে কেউ?'

'কেউ না। আমাদের ছেলেপুলেও তো নেই।'

জয়ন্তী বল্লে, 'শমীন, মনোতোষ, নীরেন—ওদের সকলেরই তো ভাগের টাকাকড়ি, সম্পত্তি; ভাগ তো বেড়েই যাচ্ছে, শরিক বাড়ছে কেবলই। ওরা তো চাকরী করে, ভাল ব্যবসা নেই কারু, যা ছিল যুদ্ধের বাজারে সে সব গুটিয়ে ফেলতে হল, এমনই বাঁচার কারবারি সব। না, ওদের টাকা নেই, কিছু, দুতিন লাখের বেশি মাথা পিছু কারুর নেই, অথচ তুমি বলে দিলে তোমার ব্যবসা মেরে নিতে পারে ওদের যে কেউ। মদ তো খাচ্ছ, কিন্তু কোন আড়তের চাল খাচ্ছ বল তো দেখি?'

'বিরূপাক্ষ বল্লে, 'ওরা যদি আমার চেয়ে বড়লোক হত, তাহলে ওদের কাউকে বিয়ে করতে তুমি?'

জয়ন্তী নিজের ঘাড়ের ওপর একটা আঁচিল খুঁটতে খুঁটতে বল্লে, 'শুধু বকলম সেঁটে এত বড় বেনে হয়ে ওঠোনি তুমি, এ ধাঁধাটা তুমি কবে দেখবে।'

'আমি দেখেছি'—বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে।

'কি বার হল কষে ?'

'তুমি শমীনকে বিয়ে করতে তার ত্রিশ লাখ থাকলে।'

'এটা বোকার মত কথা হল।'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে একটা দুটো টান মেরে জানালার ভেতর দিয়ে বাজার গুলজারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা—কিন্তু গুলজার তাতে আরো বেড়ে উঠলো বলে মনে হল না। কারু চেঁদো মাথায় গিয়ে পড়েনি সিগারেট, কারু সিল্কের শাড়ি পুড়িয়ে দেয়নি।

'বোকা কথা বলেছি ?'

'তোমার তো পঁচিশ লাখ আছে। শমীনের যদি পঁচিশ লাখ থাকত, চব্বিশ লাখ, কুড়ি লাখ থাকত তাহলে আমি কি করতাম এই হল ধাঁধা।'

'আর আমার যদি কুড়ি লাখ থাকত, শমীনের পঁচিশ লাখ ?'

'কি করতাম তাহলে আমি ?'

'কি করতে ?'

'কষে বার কর', জয়তী বল্লে।

'বার করেছি'—বিরূপাক্ষ নতুন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে। 'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়। আমাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড করিয়ে তুমি বাপের বাড়ি গিয়ে কি করেছ এ দু বছর আড়াই বছর, বলবে আমাকে ?'

জয়তী অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বইটা তেপয়ের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিল ; সেটাকে বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বল্লে, 'আমাকে বিয়ে করার পর থেকে এ তিন বছর তোমার হালচাল কি রকম জিজ্ঞেস করিনি তো তোমাকে কিচ্ছু আমি।'

'না, তা করনি বটে।' বিরূপাক্ষ ঠোঁট চেপে হেসে ভেতরে তেজ দমিয়ে রাখতে রাখতে বল্লে।

'টাকা তোমাকে শিকেয় টেনে নিয়েছে। আমাকেও দু কান কাটা করেছে তো টাকার লোভ।' জয়তী বল্লে।

বিরূপাক্ষ আর তর্কবিতর্ক করতে গেল না, ব্যাপারটা বুঝল সে। বুঝে বিশেষ কোনো অস্বস্তি এল না তার মনে। বিয়ে করার আগের থেকে পরের থেকে জয়তীকে বুঝে আসছে সে। জয়তী বিরূপাক্ষকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা করার ধার দিয়ে চলাচল করে না। কালক্রমে করবে কিনা বলা কঠিন।

বিরূপাক্ষকে সমীহ করে—মনে মনে একটা দিক দিয়ে প্রশংসা করে খুব জয়তী : একা হাতে লড়ে নিজেরি হিম্মতে পঁচিশ লাখ টাকা বিরূপাক্ষ কামিয়ে ফেলেছে বলে ;—কিন্তু বিরূপাক্ষের টাকার চেয়ে শমীনদের টাকাকেও ভালোবাসে জয়তী—একই কাগজের গভর্নমেণ্ট প্রমিসরি নোট যদিও টাকাগুলো। শমীনদের দোষ এই যে তাদের হিসেব চার পাঁচ লাখ টাকার বেশি উঠতে পারল না। তা যদি উঠত—একটু বেশিই যদি হত—সবই তো হতে পারত তবে। পারল না। হল না সেটা।

'ওরা আসে-টাসে আজকাল তোমার বাবার বাড়িতে ?'

'আসে মাঝে মাঝে।'

'কে কে আসে ?'

'মনোতোষ, সুব্রত, শমীন—সকলেই।'

'প্রায়ই আসে বুঝি ?'

'কেউ না কেউ রোজই।'

'সিগারেটটা খাচ্ছিল বিরূপাক্ষ, গড়গড়ার, নলটা হাতে ছিল, নলটা নেড়ে-চেড়ে বল্লে, সময় বেছে কখন আসে তারা ?'

'সন্ধ্যার পরে।'

'তারপর কতক্ষণ কেটে যায় ?'

'অনেক রাত অব্দি গল্পগুজব চলে—'

বিরূপাক্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, 'এই রকমই চলবে ?'

জয়তী আকাশের রোদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'তোমাকে বিয়ে করেছি বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতে পারব না—একটা কথা হল। আজকাল এরকম কড়াকড়ি কিছু নেই।'

'তুমি কি চাও ?'

'তা তো বলেছি। কোনো ওয়ারিশ নেই ; বেঁচে থাকলে সম্পত্তিটা আমি পাব।'

বিরূপাক্ষ দুতিন ঘণ্টার ভেতরেই একটিন সিগারেট ফুরিয়ে ফেলেছে ; যে সিগারেটটা পুড়ে গেছে তার আগুনে আর একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'ওটা তো বিষয়-আসয়ের কথা হল। তবে সব কথাই অবিশ্যি টাকাকড়ির কথা।'

বিরূপাক্ষ একটা ঢেকুর তুলে বল্লে, 'টাকাকড়ির কথা ছাড়। আর কি কথা থাকতে পারে ?'

'আছে।'

'আছে?'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই—বিষয়-টিষয় আছে, বেশ;—কিন্তু আরো কিছু নিয়ে, তা পেতেই হবে।'

বিরূপাক্ষ দুএক মুহূর্ত হতবোধের মত চেয়ে থেকে তারপর জয়তীর কথার ভাবটা বুঝে নিল।

'কিরকমভাবে বেঁচে থাকতে চাও?'

'যেরকম চলেছে।'

'শতকরা নব্বই দিন বাপের বাড়িতে থেকে?'

'সেটা থাকা দরকার তো।'

'বিয়ে করেছে শমীনরা?'

'করেছে কেউ কেউ।'

'তবুও আসে তোমার কাছে? কেন? বিরূপাক্ষকে তুমি বিয়ে করেছ বলে?'

'তাতে তাদের কি লাভ?'

'পঁচিশ লাখের কিছু কিছু তো লাভ।'

জয়তী বল্লে, 'বেশ ল্যাজে গোবরে কথা বলা হল—'

'তা তো হল, বিরূপাক্ষ সিগারেটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে 'কত রাত অব্দি থাকে তারা?'

'আমি কত রাত অব্দি থাকি তোমার ঘরে?'

'তার মানে?'

'তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করলে, আমিও করলুম তোমাকে একটা। এসব ধাঁধার এ ছাড়া কোনো উত্তর নেই। এসো—ওঠো—'

'কোথায় যেতে হবে?' চিতল মাছের ঘাই মেরে অন্ধকারে জলের মত পাক খেয়ে বিহ্বল হয়ে বল্লে যেন বিরূপাক্ষ।

'চলো নিউ মার্কেটে যাই—অনেক জিনিস কিনতে হবে।'

বিরূপাক্ষ মোটরটাকে ঠিক করবার জন্যে নীচে চলে গেল। নিজেই মোটর চালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ, জয়তীকে নিজের পাশে বসবার জন্যে অনুরোধ করল সে। কিন্তু পেছনের সীটে, একা—বেশ আরাম করে গিয়ে বসল জয়তী।

বার

পরদিনও জয়ন্তীকে সেই ঘরে দেখা গেল। কমলা রঙের গদী আঁটা সোফায় বসে। বিরূপাক্ষ তেমনি খাটের ওপর শুয়েছিল।

'আজকাল আর স্টক একসচেঞ্জে যাই না বড় একটা।'

'এক্ষুনি গিয়ে লাভ নেই', জয়ন্তী বললে, 'বাজার অবিশ্যি খুব খারাপ নয়—তবে রাই কুড়িয়ে তাল পাকাতে হবে আর কি।'

'কি হবে চুনোপুঁটির দলে ভিড়ে। আমার হাঙরের খাঁইও মিটে গেল বুঝি। বাজারের ভাল আর মন্দ। আর কেন?'

'আমার টাকা চাই।'

'তোমার নামে উইল করতে বল ; সে তো রেজিস্টার্ড হয়েছে।'

'ক লাখ হল ?'

'বেশি নয়, লাখ দশেক। বাকি পনেরো লাখ আমি কয়েকটা স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, ইউনির্ভাসিটিকে দেব ঠিক করেছি।'

'দশ লাখ ক্যাশ ? স্কুল কলেজ হাসপাতালে যা দেবে ভালোই—'

'না ক্যাশ নয়, জমি, জমা, বাড়ি মোটরকার সব নিয়ে—'

'অ্যাটর্নির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই—'

'তা বোলো, উইল তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি।'

'দেখেছি। একটু আধটু বদলানো দরকার।'

'কি রকম ? কোন দিক দিয়ে ?'

খাটের ওপর গা ছড়িয়ে বসে ঘাড় কাৎ করে বিরূপাক্ষ সিলিঙের দিকে তাকিয়েছিল।

'দশ লাখকে পঁচিশ লাখ করতে হবে।'

'কি করে তা সম্ভব হবে জয়ন্তী ?'

'যে দশ পয়সাকে দশ লাখে উঠিয়েছে সে তা পারবে।'

'তা বটে', বিরূপাক্ষ বললে, 'তা দেখব আমি। কিন্তু তাহলে তো আমার দিনরাত বাজার ঘুরতে হয়—'

বিরূপাক্ষ জয়তীর দিকে তাকাল, সে তাকাল হাতের বইটার দিকে। নিজেকে বললে জয়তী, 'ও নিজের পায় দাঁড়িয়ে মানুষ কিনা সেটা, ঠিক বলতে পারা যায় না; তবে, অনেকটা তাই বটে। ওর টাকার সৌভাগ্য আছে। ও ভাবে ওর জীবনে পত্নীভাগ্যও আছে, কিন্তু তা নেই। কিছুটা দিতে হয়েছিল বটে ওকে—কিন্তু আর দেব না। আমার হৃদয় ও কোনো দিনই পায়নি—এখন তা সবচেয়ে দূরে চলে গেছে। তবুও ওকে আহত করা ঠিক হবে না। ওকে টাকার বাজারে নামিয়ে দেওয়া উচিত আমার; লোকসান দেবে, লাভে হাবুডুবু খাবে, ভাল লাগবে বিরূপাক্ষের, সেই তো ওর পৃথিবী। ও যার উইল রেজিস্টারি করেছে বলছে তাতে আমার বিশ্বাস নেই। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজকে পনেরো লাখ টাকা দেবে বলছে বিরূপাক্ষ; পনেরো টাকাও দেবে কিনা সন্দেহ। ও দেবে ইউনিভার্সিটিকে টাকা, হাসপাতালকে? তবেই হয়েছে। সে টাকা খেতে গেলে হাসপাতালে রুগী বাঁচবে না আর—ছেলেদের মাস্টারদের আর ভাত খেতে হবে না বিরূপাক্ষের টাকা চিবিয়ে খেয়ে। ও আমাকে একটা জাল উইল দেখিয়েছে জানি আমি। ওর নিজের অ্যাটর্নি যে কে—আসল উইলটা যে কোথায় জানাবে না আমাকে—জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ বিরূপাক্ষ কোনো টাকা দেবে কিনা আমাকে; জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ ওর টাকা পেতে হলে বারো মাস ওর বাড়িতে থাকতে হবে, হবে ওর সঙ্গে শুতে বসতে। কিন্তু তারপরেও জানতে পারা যাবে যে বেশ কয়েকটি হত্তেল ঘুঘুনীর ভোগে উইলের টাকাটা বিলি করে দিয়েছে বিরূপাক্ষ। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া-আসা করে তো বিরূপাক্ষ—বেশ বড়ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ওর কারবার। বিরূপাক্ষকে বিয়ে করবার সময় এসব কথা ভেবে দেখিনি। টাকার কথাই ভেবেছিলুম শুধু। কিন্তু যে মানুষ পাই পয়সার থেকে পঁচিশ লাখে উঠতে পারে তার টাকা যে তার স্ত্রীরও প্রাপ্য নয়, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। এসব লোকের স্ত্রী থাকে না তো; কাউর স্ন্যাকস খুলতে হয় আঁটতে হয় শুধু—সারাদিন নানা রকমারি জায়গায়।

জিভ আর পেটের ব্যবহার রয়েছে। অন্য সব লোকের বেলায় বলা হয় চিন্তা ভাবনার চালনা রয়েছে; সূত্র সংকল্পের সন্ধান রয়েছে, কিন্তু জিভ ও পেটেরই নিত্যনিমিত্ত রয়েছে এ কথা বিরূপাক্ষদের দাড়ি কামিয়ে মুখ পালিশ করে ঘুরতে ফিরতে দেখলেই মনে হয়। অন্য কারো বেলা এমন বেয়াড়াভাবে

মনে হয় না। মাথারও ব্যবহার আছে বিরূপাক্ষদের ; স্টক একসচেঞ্জের সেই বাড়িটায় ঢুকে একটা অব্যক্ত পরিভাষায় চিৎকারের ভেতর ; বাঘের গর্জন সিংহের গর্জনও নয় ; যেন নিরবচ্ছিন্ন মড়ার দেশে কালে কালে শেয়াল হায়নায় হল্লোড়। খুবই খাটুনি বটে এতে মানুষের মাথার। খুবই।

ওর সঙ্গে বেশি দিন থাকব না আমি। তবে চলে যাবার আগে কিছু টাকা নিয়ে যাব ; ও দিতে চাইবে না কিছুই। তবুও নিতেই হবে। ওকে বিয়ে করে অসাধ অরুচি ঘেঁটেছি। ওর টাকা নিয়ে চলে যাওয়া সেই জিনিসেরই জের। কিন্তু কি করব, একটা জিনিস আরম্ভ করে মাঝপথ অবধি এসেছি, মাঝপথও ছাড়িয়ে গেছি, এখন মুড়ো দেখে নিতে হবে ; না হলে কোনো ভালো নতুন সূচনার দিকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না।

'শুধু টাকার জোরেই নয়, ধুনোর গন্ধের মত মা মনসার মুখে আমি লেগে লেগে থেকে তবে তোমাকে দখল করেছি। দু'বছর তুমি আমাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়েছ যেখানে সেখানে যখন তখন যার তার সামনে—মনে নেই তোমার ?'

জয়ন্তী কুরুশ কাঁটা দিয়ে কার্পেট বুনছিল, হাতের নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে কাজ করতে করতে বললে, 'কেন থাকবে না বিরূপাক্ষ—'

'তুমি আমাকে বিরূপাক্ষ বলছ যে—'

,ও কিছু না, সুবিধের জন্য বলেছি।'

'তুমি তো আমার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট।'

'বেশ, ডাকব না বিরূপাক্ষ তাহলে।'

'না না, একা ঘরে ঐ নামেই ডেকো যখনই দরকার হয়। জিনিসটা তুচ্ছ নয়। জয়ন্তী আমাকে ডাকছে বিরূপাক্ষ—আমরা স্বামী-স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু তুমি যখন আমাকে বিরূপাক্ষ ডাক, মনে হয় গোয়ানী ফিরিঙ্গি, মানিক জোড়া আমরা। সেবার এক গোয়ানী পর্তুগীজ ছুঁড়িকে ধরেছিলুম—'

—বলতে বলতে বিরূপাক্ষ টের পেল বেফাঁস হাওয়া সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে, কোনো দরকার নেই তো তার।

জয়ন্তী কোনো কৌতূহল বোধ করল না, মনটা আরো বেশি হাতের কার্পেটের নমুনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার, জিনিসটাকে খুব সুন্দর জটিল শুভ্র করে তুলতে হবে।

'একটানা দু-দুটো বছর আমার ছায়া মাড়ালেও তোমার বমি আসত। মানুষ মানুষকে তাড়িয়ে দেয় যেটুকু দম খরচ করে, সেটুকু তাগিদও তোমার ছিল না।—আ হা হা হা হা—?' বিরূপাক্ষ বললে।

'তোমাকে বিয়ে করেছি তো তবুও—?' নিজের জীবনের ফাঁকা কথাটাকে একটু মুখের রস দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে জয়তী মনে মনে হাসতে হাসতে বললে।

'আমি করিয়েছি।'

'তা হবে; তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলুম আমি—ঘড়ির দোলক যেমন একদিক থেকে আর একদিকে দোলে।'

'ঘড়ির দোলক? তোমার কথাটা বুঝলুম না—'

'আচ্ছা, তেজী মন্দা বাজারের উপমা দিই নইলে, তুমি ক্লাইভ স্ট্রীটের মানুষ।'

'উপমা থাক', বিরূপাক্ষ জানালার বাইরের কলকাতার হায়রানি-কলতানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'এমনি মুখের ভাষায় পরিষ্কার করে বল।'

'আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

একটা কথা তবুও বলতে চাই আমি, অনেকবার বলেছি, তবুও বলি। কিছু মনে কোরো না। মনে যা ভাবি মুখে তা না বলে পারি না। তুমি ভয় পেতে আমাকে দেখে—ঘেন্না করতে। রাত দুটোর সময় তোমাদের বাড়ির দেয়ালের পাইপ বেয়ে তোমার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তুমি ঘুমোচ্ছ। তোমার সমস্ত ঘরের ভেতর জ্যোৎস্না, জানালার শিক না ভেঙে ভেতরে ঢোকা যায় না, কিন্তু আমি তো রাহাজানের মত ছেনি হাতে ঢুকিনি ভেতরে ঢোকাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তখনও ভাবতুম ও জিনিস আমার মত মুহুরার ছেলের জন্য নয়। তোমাকে ছোঁয়াটোয়া নয়, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে ত।'

শুনে জয়তা কেমন একটা সেঁকো তিক্ততায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

'তুমি জেগে উঠলে জানালার খড়খড়িতে বিশ্রী শব্দ হচ্ছে বলে; চোখ চেয়ে দেখলে—ভাবলে চোর নাকি চিমড়ে, চীৎকার দেবার ক্ষমতাও হারিয়েছে, এমনই ভয়। তারপর যখন বুঝলে আমি তখন তোমার কোদার নাহান ভয় গোদার নাহান ঘেন্নায় গিয়ে দাঁড়াইল—হ্যা হ্যা হ্যা ঝয়োথি। কিন্তু তবুও—

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'যখন তোমাকে বললুম জানালার

ভেতর দিয়ে একটা চেক রেখে যাচ্ছি আপনার জন্যে, তুমি ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলে—কত টাকার ?'

সিগারেটটা হাতে রগড়াতে রগড়াতে বিরূপাক্ষ বললে, 'বলেছিলুম, পাঁচ হাজার টাকার—'

জয়ন্তী নিজের মনে নিজেকে বললে, 'সেইজন্যই আমি নিয়েছিলুম। কিন্তু নিয়ে হাত পুড়ছিলো আমার। কিন্তু থোক অতগুলো টাকা পেলে নেব না ? আমার কি দোষ ? আমি কি দোষী নারী ? একজন অঢেল টাকা নিয়ে দিনরাত গ্রহণে চড়াতে চাইলে কোথায় সে চাঁদ সূর্য যে এড়িয়ে যেতে পারবে…'

বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটা ভালো করে দেখে নিলে ক্রসড চেক নয় দেখে খুশী হলে ডিজঅনার্ড হবে না তো ঐ উচ্চিংড়ীর মত চোখের ড্যালা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে ; ক্যাশ দিতে পারি কিনা তখুনি, সেই অনুরোধও জানালে ; আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। এক্কেকবালে তাজ্জব মাইরা ভাবছিলাম যে আমিত্তির নাহান প্যাঁচে প্যাঁচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা।'

বিরূপাক্ষ এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার অর্থ জয়ন্তীকে ব্যাখ্যা করতে যেত না, বুঝতেও চাইত না জয়ন্তী এ ভাষাটা বিরূপাক্ষের নিজের জন্যে, স্বগত, একান্তই আত্মরক্ষার ভাষা।

'সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকও দিতে পারতুম। ক্যাশও দিতে পারতুম। তোমার ঘরে কেউ ছিল না। পড়ি কি মরি করে দোতলার শিক ধরে, দেয়ালের পাইপ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলুম—যে কোনো মুহূর্তে টপকে পড়ে যেতে পারতুম—কাছেই ও দেয়ালে একটা দরজা ছিল, তুমি খুলে দিতে এলে না। ভালোই করেছিলে। টাকা তো পাঁচ হাজার দিয়েছিলাম মাত্র। পঁচিশ হাজার দিলেই দরজা খুলে যেত—তোমার বিছানায়ও জায়গা পেতুম—'

'ছি ! ছি !'

'তুমি আমার স্ত্রী জয়ন্তী।'

'ওখান থেকে উঠতে হবে না তোমার। কাছে এসো না। এসো না। বলছি। তাহলে এই জানালার ভেতর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব—'

'লাফ দেবে ? জানালায় তো শিক রয়েছে। কী হল তোমার !' জয়ন্তী গালে হাত দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। সমস্ত শরীর মন তার লেলিহান

আগুনে কঠিন ধাতু পদার্থের মত গলে গিয়ে, বিশম্ভর বরফের গহ্বরে কঠিন নিঃস্পন্দ হয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে আবার।

‘ও, মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল বুঝি। আমি তো কোনো অন্যায় কথা বলিনি। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে কথাটা তাহলে বলে ফেলে লজ্জায় আমি ইঁদুরের গর্তে সেঁধুতাম গো। কিন্তু এখন তো তা হতে পারে না, তুমি যে আমার ঘরের বউ গো।’

বিরূপাক্ষ হেসে দুলে ভঙ্গি করে বরফের দেশের সাদা ভালুকের মত উল্লাস করতে গিয়ে কালো ভালুকের কবলিত ভালুকীর মত হাউমাউ করে উঠল। এ একটা বিশেষ বিশ্রুত খেলা তার বটে—অবসরের সময় চিত্ত তোষণের জন্যে। কিন্তু তবুও জয়তীর কোনো মন বা মুখের পরিবর্তন দেখা গেল না। বিরূপাক্ষের কথা—লীলালাস্য কি তার কানে পৌঁচুচ্ছে না? কিসের ভেতর ডুবে গিয়েছে সে?

‘এ তিন বছরে তোমার সঙ্গে বসবাস করে আমার তিনটি ছেলেপুলে হেসেখেলে হতে পারত। আমিও ভাবছিলুম একে একে হবে সব—কিন্তু তুমি কি করছ কে জানে, যাক, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তবে ছেলেপুলে হলে ভালো হত। আমার পাওনা ছিল—খুব মোটা সুদেই। কসুর তো কিছু করা হয়নি—কোনো পক্ষের থেকেই।’

জয়তী বেরিয়ে যাচ্ছিল।

‘আমিও যাচ্ছি—ক্লাইভ স্টীটের দিকে। যাবার আগে তোমাকে একটা চেক দিলে নেবে—’

জয়তী পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিল।

‘পঁচিশ হাজার টাকার চেক—’

কানে তুলল না জয়তী। নিশির ডাকে বিমূঢ়ের মত কোথাও এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

‘আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার টাকারই কেটে দিচ্ছি। আমার চেক কোনো দিন মার যায় না। এখুনি ক্যাশ করে নিতে পারবে চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়া চায়নার—যদি চাও।’

বিরূপাক্ষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল জয়তীর গতিপথের সীমারেখা দেখা দিয়েছে—সে আর চলছে না, থেমে আছে।

চেক বই হাতে নিয়ে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'এই নাও পঞ্চাশ হাজার, কিন্তু একটা কথা আছে—'

জয়তী হাঁটতে হাঁটতে ছাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আরো হাঁটতে গেলে ছাদ থেকে পড়ে যেতে হয়; অন্য দিকেও মোড় ঘুরতে গেল না সে: চেকটা নেবে কি সে; জয়তী কিছু মীমাংসা করবার আগেই তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে—এমনভাবে যে হাত ঢিল করে ছেড়ে দিলে রাস্তায় উড়ে গিয়ে পড়বে চেকটা গুঁজে দিয়েই সরে গেছে বিরূপাক্ষ; পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক—বেয়ারার চেক—

'আজ রাতে আমার ঘরে শুতে হবে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'তুমি আমাকে জাল উইল দেখিয়েছ।'

'কে বললে?'

'পাকা উইলে কি আছে আমি দেখতে চাই—তোমার অ্যাটর্নি আর আমার অ্যাটর্নির সামনে বসে। দরকার হলে বদলে দিতে চাই।'

'বদলাবে তুমি?—কেন তোমাকে তো দশ লাখ লিখে দিয়েছি।'

পাঁচ লাখ পেলেই যথেষ্ট, কিন্তু পাওয়াটা পাকা কিনা সেটা বুঝে দেখতে হবে। আমার অ্যাটর্নির সামনে।'

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক যে এক্ষুনি দিলুম তোমাকে; মিথ্যে চেক? চলো ক্যাশ নিয়ে আসি।'

'আমি নিজেই ক্যাশ করে আনতে পারব।'

'আচ্ছা বেশ, খেয়েদেয়ে মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চায়না থেকে ভাঙিয়ে আনো। যদি চেক ডিজঅনার না করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তাহলে আজ রাতে আলাদা ঘরে না শুয়ে, আমার ঘরেই ঘুমোবে।'

জয়তী বললে, 'কাল আমার অ্যাটর্নি আনব, তোমার অ্যাটর্নি থাকবে, পাকা উইলের কোথায় কি বদলানো দরকার ঠিক করে নেয়া যাবে।'

তেরো

রাত দশটার আগে সব দিকের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে শেষ হয়ে গেল, বিরূপাক্ষ দেখলে জয়তী তার ঘরে এসে কুশনে বসে আছে; ঘুমোয়নি; কোনো সঙ্কল্প নেই জয়তীর মুখে।

গত ছ'মাস ধরে এ জিনিস ঘটিয়ে ওঠানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাপের বাড়ির থেকে তিন চার দিন হল ফিরে এসেছে, কিন্তু এ তিন চার দিন জয়ন্তী নীচে একটা আলাদা কামরার ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়েছে। বিরূপাক্ষ কেমন একটা ছায়া ছায়া মর্যাদায় আচ্ছাদিত হয়ে কিছু করে নি—কিছু বলেনি জয়ন্তীকে। কিন্তু আজ টাকা দিয়ে কথা বলিয়েছে; এত রাতে বিরূপাক্ষের ঘরে আজ, কাল, একটানা মাস ছয়েক তো খুবই থেকে যাবে জয়ন্তী। মাঝে মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি করে স্ত্রীধন পায় ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা মোটা রকমের লোকসান দিয়ে এসে চিন্তিত ও চমৎকৃত হয়ে ভাবছিল বিরূপাক্ষ। শুয়ে পড়ল সে।

পরদিন বিরূপাক্ষ আর ক্লাইভ স্ট্রীটে গেল না।

দুপুরবেলা আজ সে একটা মাছরাঙা রঙের সোফায় বসেছিল—জয়ন্তী মুখোমুখি কমলা রঙের সোফায়।

জয়ন্তী, কি বই পড়ছ?'

'আর্ট আর থিয়েটারের একটা বই।'

'ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝব?'

'এরকম বই কি সকলে পড়ে?'

'ইংরেজি জানি না বলে বলছ?'

'না তা নয়,' জয়ন্তী বল্লে, 'ভাষা জানা না জানার জন্যে নয়—' বলতে বলতে থেমে গেল।

'আমাকে বুঝিয়ে দিলে বুঝব না?'

জয়ন্তী বইটার দিকে তাকাল। কোথায় পড়ছিল সে? গোড়ার দিকেই তো; বেশি এগোতে পারেনি; সেই গ্রীক থিয়েটার—

'তর্জমা করে শোনাবে আমাকে?'

'শোনাতে পারা যায়। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—এ বইয়ের ভাষায় তোমার বাধবে না তর্জমা করে দিলে। কিন্তু ভাষা কাকে নিয়ে?'

'মানে? কি বলছ, বুঝিয়ে বল।'

'একটা বইয়ের ভাষাই কি সব?'

'তোমার এ প্রশ্নের মানে কি হল?'

জয়ন্তী দূরে শেলফের ওপর সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ওপর একখানা আর আরিস্টটলের পোয়েটিকস দুটো পাশাপাশি বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বই দুটো। এগুলো এখানে এল কি করে? নিজেই এনেছে সে হাতে করে কোনো এক সময়—এবারে নয়, এর আগের বারে যখন এ বাড়িতে ছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষের সাহিত্যিক স্থূলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আলঙ্কারিক, আরিস্টট্‌লদের দিকে তাকানো দরকার ছিল না। আরিস্টটল; এ যেন মশা মারতে কামান দাগানো হল। কিন্তু কামান ওখানে নির্গুণভাবে পাতা রয়েছে; সগুণ হচ্ছে মশাটা। চক্কর মেরে মেরে কি যে ধুম্বন দিচ্ছে। ভনভন করে বলছে বিরূপাক্ষ, 'ও উপন্যাসটা এখন থাক।'

'পাতা থাকুক।'

'যে কোনো পুরুষ মানুষ যে কোনো স্ত্রীলোককে পেতে পারে, জানো জয়ন্তী, দুটো জিনিস থাকা চাই সে পুরুষের—'

অগত্যা বইটা খুলতে হল আবার জয়ন্তীকে।

চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেল।

মেয়েটি দেখতে শুনতে খুবই ভাল হতে পারে; একটা হ্যাংলা ফোকলা মিনসে তবু তাকে লটকাবে, খুব বড় পণ্ডিত মেয়েকে একটা বোকা পাঁঠা এসে চার দিয়ে খসিয়ে নিয়ে যাবে জয়ন্তী, বড জাতের মেয়েকে ছোট জাতের ন্যাকা ক্যাবলা এসে গুণ করে ফেলবে, এমন কি সে রূপসী বয়সেও বড—গুরুস্থানীয়—শিং ভেঙে এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে ভিড়ে যাবে সে। না গিয়ে করবে কি সে। কোনো মানুষ যদি কড়া তাগিদে একটি মেয়েমানুষের ছায়ায় ছায়ায় দিনরাত ঘোরে, তাহলে নিত্য নধর মাছ কাটতে কাটতে এমনই জেল্লা খুলে যাবে আঁশবটির যে পরস্পরকে ছাড়া তাদের আর চলবে না—চলবেই না—'

বিরূপাক্ষ নলটা মুখে তুলে নিয়ে না টেনে হাত ঝেড়ে পর্বতের মত সেটাকে মেঝের ওপর ফেলে দিল।—শরীরটা সাপ খেলিয়ে নাচিয়ে নিল বেশ এক দমক; কেমন একটা আমেজ বোধ করেছে যেন, ভারি ভালো লাগছে। স্নিগ্ধ, রসিক উল্লুক পুরুষের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে নাচিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'প্রেম ছাড়া আর কি শিবরাত্তিরে জয়ন্তীর বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাওয়া? ডাকবে পাখি, ডাক ডাক—ডেকে ওঠ। গা রে পাখি, গান গা, গান গা; কোন গান ভালো লাগে তোর?—গু-গু-গুণমণি দ-দা-দাসী তব পায়! গুণমণি দাসী তব পায়।'

বিরূপাক্ষ মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসে নল তুলে নিয়ে তামাক টানল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে আস্তে আস্তে বলে, 'একটা পাখি লক্ষ বছরে একবার এসে একটা পাথরে ঠোঁট ঘসে যেত। কিন্তু কোটি কোটি বছর পরে দেখা গেল পাখির ঠোঁটঘষায় সে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ একটা—কাল একটা—পশু একটা—তারপর দিন একটা—ছোট ছোট প্রমিসরি নোটের ঘষায় মেয়েমানুষের বিমুখতার ক্ষয় হবে না কেন? তোমাকে বিয়ে করবার আগেও আমি জানতুম যে কোনো একজন স্ত্রীলোকের পেছনে লেগে থাকলে মেগে খেতে হবে না—সেই মেয়ে লোকটিই হবে আমানি। কিন্তু জেনেও ওয়াকিবহাল ছিলুম না। কিন্তু তোমার বাবা মত দিলেন, তুমি মত দিলে আমাদের বিয়ে হল, হিন্দু মতে হল, হিন্দু আইনে হল, হিন্দু নারীর বিয়ে হল, সবই মুঠোর ভেতর এল, আমি বুঝতে পারলুম আমি যা ভেবেছিলুম তাই-ই ঠিক'—বলে মেয়েটির দেবী শরীরের চেয়েও অপরূপ একটা কাম শরীরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে উঠল বিরূপাক্ষের। লোলুপ চোখে গড়গড়ার নল কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে নিজের স্নায়ু শিরায় রক্তের তিরতির ঝিরঝির তিরতির ঝিরঝির স্রোত অনুভব করতে করতে বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল।

'বর্ণভেদ আমি মান, তুমি অবিশ্যি মান না। কিন্তু তুমি ধনী বামুনের ঘরের মেয়ে, আমি হচ্ছি শূদ্রের ছেলে; তবুও তোমাকে পেতে হল আমার।'

নল ফেলে দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল। গড়গড়ার কলকিতে তামাক হয় তো পুড়ে নিভে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ সিগারেটে দু'একটা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর চেপে দুমড়ে ঠেলে দিয়ে বলে, 'তোমার বাবা জানতেন আমি শুদ্দুর তুমিও জানতে, কিন্তু আমার উপাধি রায়, আমাকে সকলের কাছে বামুন বলে ভাঁড়িয়ে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হল। এটা যে কী ল্যাজে গোবর হল বুঝতে পারলুম না। কেন, রেজিস্টারি করে করলেই হত। আমি তো তাই বলেছিলুম। আমি ইস্ট বেঙ্গলের লোক, নমঃশূদ্র, তোমরা এদিককার বনেদী বড় ঘরের বামুন, তোমাদের আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে দেখেননি কোনদিন চেনেন না জানেন না—জানতেও চাইলেন না, তোমরাও ভোগা দিলে বেশ কিন্তু—কালোবাজারের পঁচিশ লাখ ট্যাহা এমন ঘন বাইস্তার থানালোর ব্যাঙের নাহান জাইন্দর দিয়া কথা কয় বোয়রথি!'

চাকর ঘরে ঢুকল।

'হুজুর'।

'তামাক সেজে নিয়ে আয়।'

'হুজুর' বলে সে গড়গড়া নিয়ে চলে গেল।

'অবিশ্যি আজকাল বর্ণভেদের কোন মানে নেই। এ যুগটাও সব দিক দিয়েই মুখিয়ে চলেছে। দাও ধোলাই চোলাই করে সব; একটা ফলাও বিপ্লবের কর্তা আমি। রুধিরের গন্ধে বাঘের মত হয়ে গেছে মন, একটা দুর্দান্ত দিকশূল না ছেড়ে আমি ছাড়ব না। এই পচা সমাজকে পচিয়ে দিতে হবে আরো—লাথি মেরে লোপাট করে দিতে হবে—শুরু হবে এইটিনথ ইণ্টারন্যাশনাল। থার্ড ফোর্থ ফিফথে কিছু হবে না—এইটিনথ।'

চাকর তামাক দিয়ে গেল।

'দোরটা বন্ধ করে যা। মন্মথ কোথায়? বাজারে? দোরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিস শশী।'

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা কাকে বলে শশী তা জানে। সে কুলুপ এঁটে চলে গেল।

'এরকম আটকানো থাকবে?' জয়তী বল্লে।

'থাকুক না।'

'এখন তো দিনের বেলা। আমার বেরুতে হবে তো।'

'কোথা যাবে? এ বাড়িতে কে আছে?'

জয়তী জানালার ভেতর দিয়ে দূর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু কলকাতার বাস্তার বড় ধোঁয়াটে চক্ষুস্থির গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে রইল। যা খুশি বিরূপাক্ষ করুক—করে যাক। কিন্তু এ সব আর বেশিদিন চলবে না। অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু খুব বুঝদার মানুষ। বিরূপাক্ষ লোকসান দিয়ে দেউলে হবার আগেই অবিনাশবাবুর দপ্তরে বসে আইন ঠিক করে নিয়ে গুছিয়ে সরে পড়বে সে। ভাবছিল এই সব জয়তী। কিন্তু তবুও বাইরের পৃথিবীতে নিজের প্রাণের ত্রিসীমায়ও কোথাও কোনো উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। কী হবে জীবন চালিয়ে। টাকা দিয়েই বা কী হবে। বয়সের সবচেয়ে ভালো সময়টাকেই একটা পাখি বানিয়ে আকাশে ছেড়ে না দিয়ে চোখ উপড়ে মাটিতে ফেলে দিল জয়তী; গাইয়ে পাখিটাকে খুপরীতে ঠেলে দিল তারপর: অন্ধকারে ভাল গান হবে বলে। ভালো গান হবে বটে—কিন্তু অধিকতর অন্ধকারের

দরকার—মনস্থিরতর শূন্যতার ; বিরূপাক্ষের ছোঁয়াচের থেকে অনেক দূরে ; তার বাবার ওখানেও নয় ; অন্য কোথাও ; মৃত্যু এসে মানুষকে তার মনস্থিরতম শূন্যতা দান করবার আগে।

'দেয়ালের পাইপ বেয়ে প্রথমবার তোমার সঙ্গে সেলামী দিয়ে দেখা করতে হয়েছিল। তারপর আরও দশ বারো বার উঠতে হয়েছিল আমাকে ঐ পথ ধরেই। অথচ এমনি দুর্দান্ত তুমি যে একদিনের জন্যেও দোর খুলে দাও নি। তোমার এই বুনো ওলের মত ঠেকার দেখেই আমার এই বাঘা তেঁতুলের মত কামড়। জানোয়ারের মতন কিংবা দেবতার মত। দেবতার মতই—তাই তোমার মত দেবীকে—মানে, ইয়ে—দেবিকা রাণীকে লাভ করেছি আমি। নাও এসো বিছানায়।'

বলে খুব সুভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বিরূপাক্ষ। অশ্লীল আগোছালো সে হবে না—যদিও তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অজ্ঞাতসারেই শালীনতার নিগূঢ় অভাবের ভেতর থেকেই জন্মলাভ করেছে—মনকে জন্ম দিয়েছে তার।

'তোমার পরমাইদের কথা মনে পড়ছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'পরমাই' মানে. প্রেমিক—বিরূপাক্ষের ভাষায়; জয়তী শব্দটা শোনেনি; মনে পড়ল তার ; অর্থও মনে পড়ল।

শশী দরজায় তালা মেরে গেছে—রাত আটটা-ন'টার আগে খুলবে কিনা সন্দেহ। আফিং খাওয়া সিংহীর মত ঐ শেয়ালের লালসায় জারিত হওয়ার সময় তার এখন ; সিংহীর মতই প্রতিরোধ করবার সময়।

'তোমার পরমাইদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুতীর্থ মনে পড়ে ?'

সুতীর্থের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে জয়তী। বিরূপাক্ষের মুখে সুতীর্থের কথা শুনে মনে পড়ে গেল আবার। নিজের মনকে বললে জয়তী: আমার চেয়ে বয়সে এত বড় সুতীর্থ ? কী করে তা হলে তার সঙ্গে আমার—থেমে, ঠেকে থেকে, জয়তী তারপর আবার ভাবছিল : আমি তো ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সঙ্গেই মিশতুম, কেউ কেউ আমার থেকে ছোট, কেউ কেউ দু'চার বছরের বড়। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত সুতীর্থের কাছে বসে থাকতে, কথা বলা হত, চুপচাপ বসে থাকা হত, সত্যি সে সব নিস্তব্ধতার ভেতর ওর মাতৃ আর আমার পিতৃগ্রন্থি আর সব নীড়, নক্ষত্র কথা বলে উঠত যেন—সে সব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে আজ।

কোথাও নেই আর। আমি বুঝতাম একদিন, সুতীর্থ বুঝত।

‘আমি তো তোমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। আমি অবিশ্যি তোমার পরমাই ছিলুম না জয়তী, ওসব ভিটকেলেমি আমার ছিল না; খোকার বাবা হতে চেয়েছিলুম কিনা।’ বলে বিরূপাক্ষ একটু চুপ করে থেকে যেন বললে, ‘কিন্তু সুতীর্থ তোমার জন্মে জন্মে ধান খেয়েছে জয়তী; ওর এক আলাদা মায়া। বছর পনেরো কুড়ির বড হলেও সে যেন তোমার বাপের চেয়ে ভাইয়ের চেয়ে গর্ভের ছেলের চেয়ে বেশী এমনিভাবেই মিশেছে তার সঙ্গে। সুতীর্থ কবিতা লিখত।’ বিরূপাক্ষ বললে।

‘লিখত তা কি হত। ছড়া কবিতা দিয়ে কি হবে।’ ‘আমার কিছু হবে না, কিন্তু পরমাইদের তো হয়। আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায়, চেক খায়; চিনি মিশ্রি খেতে চায় না, তবুও মাঝে মাঝে গায়েন বায়েনদের ওখানে উড়ে যায় একটু আধটু সরুচাকলি খাবার জন্য—’

‘সুতীর্থের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছি কেন তোমাকে জান জয়তী?’

জয়তীর দিকে তাকাল না বিরূপাক্ষ। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে অবশেষে ঘরের ভেতর বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের একটা সুদীর্ঘ ফলার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, ভাবছি তাকে নেমন্তন্ন করে একদিন আনব এখানে। অনেক দিন তোমার পুলক দেখিনি। সুতীর্থের সঙ্গে কথায় কথায় লেগে গেলে বুলবুলির লডাই করে কি রকম লাল হয়ে উঠতে তুমি—সে লাল এই তিন বছরের ভেতর কই একদিনও তো দেখি নি আর। অবিশ্যি সেটা ছিল ঝগড়ার—ইয়ে, বিবিছাড় ঝগড়ার পুলক ঝুটিয়াল বুলবুলের সঙ্গে। আমার সঙ্গে তোমাকে পুলকিত হতে হয়েছে বর্ষাকালের নাউক্ষেতের কাঁকড়ানীর মত, আমি ক্যাঁকড়াদের রাজা গো।’

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল।

চৌদ্দ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থকে ডেকে বল্লে, ‘বসুন’

‘আমার ঘরেই চলুন।’

‘না, সেদিন গিয়েছিলুম।’

'হাতে অনেক কাজ বিজনহরিবাবু, চলুন আমার ঘরে, কাজ করতে করতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

'কাজের মালিক কে বলুন'—নিজেরই চেষ্টায় এখন গলার স্বর স্থিত, ঠাণ্ডা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের।

'মালিক অবিশ্যি আমি নই, আপনিও নন, মজুর, মুদ্দোফরাস আর্দালি বেয়ারা থেকে শুরু করে আমরা সকলেই মালিক। এটা মেনে না নিলে কাজ করতে পারব না।'

'পারবেন না? এই তো সম্প্রতি একটা স্ট্রাইক চলছে'—

'স্ট্রাইক? কোথায়?' সুতীর্থ চেয়াব টেনে টেবিলেব ওপর কনুই পেতে মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাল।

'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই', ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতর্কভাবে বল্লে, 'আমাদের কারু কিছু লাভক্ষতি নেই তাতে। এই তো সেদিন ট্রাম স্টাইক হল—'

'ট্রাম স্ট্রাইক—ও!'

'আবার হচ্ছে। ওতো গৃহিণী রোগ, ও সারবে না। ও-সব রাজ-রাজড়ার কারবার—আমরা তো—কিন্তু শুনেছেন কি আমাদের ফার্মে স্ট্রাইকের সম্ভাবনা—'

সুতীর্থ শুনেছিল বইকি। সে তো এ নিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, ধর্মঘটের দাবিদাওয়া ঠিক করেছে কিছু কিছু।

'নিন সুতীর্থবাবু।' সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল সুতীর্থকে।

'শুনেছি বইকি। তা শুনলাম নাকি শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হবে না—' সুতীর্থ সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল।

'কে বল্লে?'

'যারা স্ট্রাইক করবে তারাই বলছিল—'

'শুনলাম আপনার পরামর্শে ওরা ওঠে বসে।'

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বল্লে, 'না অতটা নয়, আমি তো ট্রেড ইউনিয়নের কেউ নই। কোনোরকম পোলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গেও আমার কোনো সংস্রব নেই। আমি একজন নিতান্তই বাইরের মানুষ। আমার কথা কে শুনবে?'

'কিন্তু আপনি কথা বলতে যান তো।'

'যা দরকার মনে করি তা বলি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেল টিপতেই বেয়ারা এল। 'হুইস্কি—'

'ও আমি খাব না—' সুতীর্থ বল্লে।

'আপনাকে আমি তো ঘুষ দিচ্ছি না যে খাবেন না। ঘুষ খাবার লোক আপনি নন। তবে মণ্ট্ হুইস্কি খেতে পারেন।'

সুতীর্থ জলন্ত সিগারেটটা সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে মেরে বল্লে, 'না, ও আমি খাব না।'

মল্লিক একটু চকিত হয়ে বল্লে, ওটা ওদিকে ছিটকে ছুঁড়লেন যে। এই তো অ্যাশট্রে ছিল। এই তো চায়ের পেয়ালা ছিল—'

'একটু মজা দেখলুম—'

'ওদিকে অনেক কাগজপত্র—অগ্নিকাণ্ড না হয়, দেখুন তো সিগারেটটা কোথায় গিয়ে পড়ল—'

'পড়েছে কোথাও। আগুন লাগবে না। লাগতেও পারে।'

'আমি কি এ ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই ?'

সুতীর্থ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল। কোনো কথা বল্লে না।

'আপনি ধর্মঘটিদের কি পরামর্শ দিয়েছেন ?'

'বলেছি তোমাদের খাওয়া পরা থাকার যা দুরবস্থা, তাতে ধর্মঘট করে এই নচ্ছার ফার্মটাকে ল্যাজে মুচড়ে আছাড় মারা ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপায় নেই—'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফুটন্ত নলেন গুড়ের পায়সের মত মুখে ধ্বকটা দমিয়ে রাখতে রাখতে বল্লে, 'এর জন্যে তো আপনার এই মুহূর্তেই চাকরি যেতে পারে।'

'যাক।'

চন করে মাথায় রক্ত উঠেছে বলেই মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেওয়া দরকার। কিছুটা ঠাণ্ডা করে নিল ; দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে, তারপরে আস্তে আস্তে মল্লিক বল্লে, 'স্থিরভাবে কাজ করবেন, সব দিক থেকে দেখে শুনে স্থির হয়ে—'

'তাই তো করছি তা না হলে রিসিভিং এণ্ডে বসে এখানে কি বসে থাকা সম্ভব হত আজো আমাদের। আমরা তো বেশ সুখাসনে বসে আছি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'ওদের কোনো কিছু পরামর্শ দেবার আগে ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে আপনার কথা বলে দেখা উচিত ছিল। আপনি তা করেন নি, আমাকেও কিছু বলেন

নি। অথচ দাবি-দাওয়া ঠিক করেছেন স্ট্রাইকারদের। আপনি এই ফার্মের একজন অফিসার নন?'

সুতীর্থ বল্লে, 'এ সব প্রশ্নের কোনো মানে হয় না মিস্টার মল্লিক। আমি তিনশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু এই শীতের রাতে আমার চাকরীটাকে গরম কোটের মত গায়ে দিয়ে বেড়াবার শখ আমার নেই। যত দিন এই ফার্মের কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনের লোকগুলোর কোনো সুরাহা না হয়, ততদিন আমার চাকরী—'

বাধা দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে, 'এ-সব কথা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি কেন বলব? ওদের ডেপুটেশন কি সারাটা বছর আপনাকে বলেনি?'

'তা বলেছে।' মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ কবে ব্লু-বুকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বল্লে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে, এ নিয়ে বোঝাপড়ার সময় কেটে যায় নি আমাদের—আপনি মাঝখান থেকে ওপর-পড়া হয়ে কি করে এলেন? এলেন কোথেকে? আপনি তো টি-ইউ-সির মেম্বারও নন। কোনো পোলিটিক্যাল পার্টির ধার ধারেন না। অথচ চাকরী ছাড়া চলে না। বিনে চাকরীতে তটের ওপর দিয়ে আপনার নৌকো চালিয়ে নেবে আপনার শ্বশুরের মেয়ে?'

মল্লিক চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল: কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে জ্বালিয়ে নিতে সময় লেগে গেল; দেশলাইয়ের আগুনে ছোলা মাংসের চাঙড়ের মত দেখাচ্ছিল মল্লিকের মুখটাকে। মেজাজ সহজ স্বাভাবিক করে নিতে হবে, উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করার ইতিহাস তার দশ বারো বছর ধরে চলেছে, কিন্তু এখনও সময়ে অসময়ে বারুদে আগুন লাগিয়ে বসে বুদ্ধি সুদ্ধি গলার আওয়াজ। না না ওরকম করে হবে না।

'আপনার এসব চলবে না সুতীর্থবাবু।'

'না যদি চলে কাজ ছেড়ে দেব।'

'ছাড়িয়ে দেব।'

'আমি ওদের দলে—'

'বেশ। চলে যান।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল।'

'কিন্তু চলে যাবার আগে'—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজের শরীরটাকে একটু বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে খেজুরের রসে

পাকানো গোলাপছড়ির মত মোচড় খাইয়ে নিল বার কয়েক ; চোখ দুটো ভাসিয়ে, ঘুরপাক খাইয়ে নিল সমস্ত মুখে—কানে কপালেও যেন বিদ্যুতের গতিতে।

হঠাৎ একটা গা ঝাড়া দিয়ে মল্লিক বল্লে, 'আপনি মিঃ ম্যাক গ্রেগরকে চেনেন ?'

'কোন ম্যাকগ্রেগর ?'

'কোনো ম্যাকগ্রেগর ?'

সুতীর্থ দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে প্রায় দেয়ালে পিঠ রেখে কপালের চামড়ায় চামড়ায় একটু ভেবে বল্লে, কৈ, না তো।'

'মনে করতে পারছেন না। আজ হল শুক্রুরবার। মঙ্গলবার রাত্ত আটটার পর রাসেল স্ট্রিটে যে সাহেবের সঙ্গে আপনি ডিনার খেয়েছেন, দুচার পিপে হুইস্কি বরবাদ করেছেন তার নাম কি ?'

'ওঃ' সুতীর্থের মনে পড়ল। 'তা, আপনি কি করে জানলেন ?'

'সে সব আমাদের জেনে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ, ওর নাম ম্যাকগ্রেগরই তো। দেখি, ওর কার্ড তো ছিল আমার পকেটে।'

সুতীর্থ তার ওভার কোটের অগুণতি পকেট খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে লাগল।

কনকনে শীতের ভেতরেও মুখচোখ কপাল ঘেমে গেছে দেখে মল্লিক নরম গলায় বল্লে, 'যাক যাক, সুতীর্থবাবু কার্ড কি হবে। ও আমাদের দেখা আছে। শুনুন, ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে আপনার বেশ দহরম আছে শুনলাম।

'না এমন কিছু নয়।'

'ওর মেমসাহেবের সঙ্গে ?

'মেম সেদিন ছিল বটে টেবিলে। ভালো মানুষ। এর চেয়ে বেশি আর কি। এর বেশি পরিচয় ওদের সঙ্গে আমার নেই।'

'শুনলাম আপনাকে আবার ডিনারে ডেকেছেন ওঁরা।'

'ওটা ভদ্রতা—কিংবা বেশি কিছু—হতেও পারে। মানুষ ওরা গুড সর্ট। আমিই পাল্টা ডিনার দিতে ভুলে গেলুম। বড্ড বেকুবিই হয়েছে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আনাচে কানাচে চোখ বুলিয়ে শানিয়ে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বল্লে, 'কিন্তু চালচুলো নেই, কোথায়ই বা ডাকি ওদের।'

'বেশ তো, ফার্পোর হোটেলে ডাকুন না। আমিও যাব—আমি টাকা দেব—আমি যত লাগে দেব আপনার নাম করে—'

'কেন ব্যাপার কি ?'

'বসুন।'

বেয়ারা হুইস্কি নিয়ে এল।

'ভাণ্ডব ? খাবেন ?'

সুতীর্থ বিরক্ত হয়ে হেসে মল্লিকের চোখ এড়িয়ে দেওয়ালের একটা ক্যালেণ্ডারের চিত্রিত সমুদ্র-নীলিমার এপার-ওপারের দিকে তাকিয়ে—ওপার এপারের দিকে বেশি নিবিষ্ট হয়ে তাকাতে যাচ্ছিল যখন, মল্লিক বল্লে, মানে ম্যাকগ্রেগর সাহেবকে ধরে খুব একটা বড় কণ্ট্রাক্ট নেব।'

'কণ্ট্রাক্ট ? কিসের ?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সুরে বল্লে, 'ধনা চোরের আর মনা চোরের। হাঁ করে দাঁড়িয়ে তেলো চাটলেই কি আর সব কথার—ইয়ে—আসুন—চলুন—ফার্পোতে যাই, খাওয়া দাওয়া মদ মালের ভেতর কি হবে না হবে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন।'

'মদ, মাল ?'

'মাল।'

'এল কোথেকে ?'

'ও কিছু নয় ; কথার প্যাঁচ। আগামী মাস থেকে আপনার মাইনে হবে পাঁচশো টাকা। যান—কাজ করুন গিয়ে। ভেরি হেভি ডে। বাই দা বাই জয়তীকে চেনেন আপনি ?'

'জয়তী ? কে সে ?'

'বিরূপাক্ষকে চেনেন ?'

সুতীর্থ উত্তর দিতে একটু দেরী করে ফেল্ল, 'এক বিরূপাক্ষকে চিনতুম বৈকি।'

'তারই স্ত্রী।'

'না, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই।'

'স্টক এক্সচেঞ্জে দেখা হয়েছিল বিরূপাক্ষের সঙ্গে সেদিন। আপনার কথা বল্লে অনেক। ওর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মিষ্টি সম্পর্ক ছিল বল্লে।'

'ওর স্ত্রীকে কোনদিন দেখিনি আমি।'

কারু স্ত্রীর কথা নয়—আকাশ বাতাস চারিদিককার এপক্ষের কথা ভাবতে চিন্তিত ও বিষণ্নভাবে সুতীর্থ নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

পনেরো

'কে তুমি সুতীর্থ? এতদিন ছিলে কোথায়?'

সুতীর্থের কুশনে বসেছিলেন মণিকা। সন্ধ্যে উতরে গেছে, বাতি জ্বালানো হয়নি। শীত কমেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার পড়েছে বেশ। মণিকার গায়ে সুতীর্থের র‍্যাগ।

'বাঃ বেশ তো তুমি, এতদিন কোন দ্বীপটিতে ছিলে? আসনি কেন সুতীর্থ?'

আগন্তুক সহসা কোনো উত্তর দিচ্ছিল না।

'এতদিন কি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়েছিলে নাকি? দেখ, তোমার চরিত্রে সন্দেহ হয় আমার—তুমি এরকম করছ কেন সুতীর্থ—তুমি কি জান না—?'

কেমন একটু অস্পষ্ট প্রেরণায় টলমল করে উঠে কোনো এক কথা বুদ্ধিকে ঠকাচ্ছে বলে প্রাণকে ঠকাতে চেষ্টা করে মণিকা ঢোঁক গিলে বল্লেন, 'বয়স হয়েছে আমার। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে। কাঁহাতক তোমার হয়ে ঘরদোর সামলাতে পারি আমি। তুমি যে কোথায় বেরিয়ে যাও—'

'আমি—'

'ওমা, এ কে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মণিকা, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে নিয়ে অস্ফুটে বল্লেন 'এ তো সুতীর্থ নয়। কে আবার এল।'

সাঁ করে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে বিরূপাক্ষের মুখোমুখি এসে স্তম্ভিত হয়ে মণিকা বল্লেন, 'কে? কে আপনি?'

'আমি—বিরূপাক্ষ—সুতীর্থের খোঁজে এসেছিলাম—'

বিরূপাক্ষের আগাগোড়ার দিকে তাকিয়ে মণিকার মনটা কেমন একটা বিরক্তি, উপেক্ষা নৈরাশ্যে ভরে উঠল।

'তাই তো আমি মনে করেছিলুম সুতীর্থ এসেছে বুঝি। কিন্তু কে—'

বিছানার কিনারে সরে দাঁড়িয়ে মণিকা বল্লেন, 'সুতীর্থ তো সাত-আটদিন ধরে বাড়িতে আসেনি।'

'বসুন।'

'না, আমি এখন ঘরে যাব। আপনার কি দরকার বলুন তো—' মণিকা বল্লেন।

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'বলে যায় না।'

'এখানে থাকে তো?'

'আজকাল? হ্যাঁ, থাকে অবিশ্যি, তবে টানা বেঁধে থাকে না। কোথায় উবে যায়—দশ-পনেরো দিনের ভেতর দেখাই পাওয়া যায় না। কোথায় যায়—কোথায় থাকে—কি করে—কিছুই জানতে পারি না। আপনি কে? দেনদার?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'আমি সুতীর্থের অনেক কাল আগের পরিচিত মানুষ।'

'বন্ধু? বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

'বসব বলেই তো এসেছিলুম।'

ঘরের একটা কৌচের ওপর বসে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'বন্ধু আমি নিজেকে বলতে পারি না। ওরা হল বিদ্বান মানুষ—ওদের সঙ্গে কি আমাদের মত ধারণপণ্ডিতের বন্ধুত্ব সাজে।'

বিরূপাক্ষের গলায় কেন যেন কেমন একটা আন্তরিক নালিশের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। সুতীর্থ যদি এখানে থাকত তাহলে অবিশ্যি অনুভব করত কিরকম অহেতুক ও অসার বিরূপাক্ষের এই গলার আওয়াজ—কথাবার্তা।

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ও আমার বাড়ি মাড়ায়নি। এই মাস তিনেক আগে মিনিট কুড়ি পঁচিশের জন্যে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছিল মাত্র; তাও রাস্তায় দেখা হয়েছিল—ঘাড় ধরে নিয়ে গেছলুম বলে। ভেবেছিলুম আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব—'

'আপনি পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'আজকাল কলকাতায় ছেলেপুলে সংসার নিয়ে থাকা। বাড়ি পাবেন কোথা? এও তো ব্ল্যাকমার্কেটে চড়েছে! মুদি-মোদাফরাসের না, ওটা হচ্ছে কসায়ের কালোবাজার—' আস্তে করে বল্লেন মণিকা।

সে কথায় কান না দিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, ‘যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে সুতীর্থের আগের আলাপ খাতির-টাতির ছিল। কিন্তু ও জানে না যে জয়তী আমার স্ত্রী। ওকে তা জানিয়ে দেবার জন্যেই ধরে বেঁধে নিয়ে গেছলুম, কিন্তু ওর সবুর সইল না। একটা কেলেঙ্কারী করে বেরিয়ে গেল সেদিন। আর দেখা নেই—’

মণিকা খানিকটা নিবাদ হয়ে বল্লেন, ‘কি কেলেঙ্কারি?’

‘আমার মনে হয়েছিল মদ খেয়েছিল।’

‘মদ? সুতীর্থ? মদ তো ও খায় না।’

‘তা হবে। আমাকে তেড়ে এসে জড়িয়ে ধরলে—বল্লে, আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে বিরূপাক্ষ—’

‘কার স্ত্রী?’ বিচক্ষণভাবে বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘ওর স্ত্রী; সুতীর্থের স্ত্রী।’

‘সুতীর্থ কি বিয়ে করেছে?’

‘তা না হলে স্ত্রীর কথা বলবে কেন?’ বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে বল্লে—নম্র সুজন চোখে ঠোঁটে একটু হাসি ছড়িয়ে।

মণিকা খোঁপার ওপরে আটকানো ঘোমটা মাথার দিকে—কপালের দিকে খানিকটা টেনে নিয়ে আবার কিছুটা সরিয়ে দিয়ে কি যেন বলবেন মনে করেও বল্লেন না। তৎক্ষণাৎ—কিন্তু তবুও বললেন ‘আপনারা তার ছেলেবেলার বন্ধু জানেন না সুতীর্থ বিয়ে করেছে কিনা?’

‘গত তিন-চার বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কি করেছে না করেছে জানি না। এর আগে বিয়ে করেনি।’

‘ঠিক জানেন?’

‘জানি বৈকি।’

‘তাহলে আর করেনি।’

মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বিরূপাক্ষ তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। প্রথম দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল বিরূপাক্ষের, এখন সে ‘হয়নি, এরকম হতে পারে না’ অনুভব করতে করতে নিমেষ নিহত হয়ে বসে রইল। সুতীর্থের খোঁজে এসেছিল বিরূপাক্ষ। জয়তীকে যে বিয়ে করেছে বিরূপাক্ষ সে যে বাস্তবিকই তার ঘরের বৌ, এই সত্যের ময়ূরপুচ্ছ তার

কাকের পালকে গুঁজে সুতীর্থের সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পায়নি। সেটা দরকার। মনে যখন চারদিক দিয়ে স্মৃতিতে ভাঁটা এসে পড়েছে তখন যাদের জীবনে সম্ভাবনা ছিল ঢের, কিন্তু হল না কিছু সেই সব লোকগুলোকে নিজের টাকা এবং অনির্বচন স্ত্রীর গন্ধে একটু মাথা গুলিয়ে দেবার পথ জেগেছিল বিরূপাক্ষের। পথটা দু-চার মুহূর্তের কর্পূরের মতন টেঁকসই। কিন্তু তবুও পথের মানুষ বিরূপাক্ষ। সেই জন্যই সুতীর্থের কাছে আসে। এসেছে সে। ভালোও বাসে সুতীর্থকে এত বেশি যে জয়তী যদি স্বামীকে সত্যিই ছেড়ে যেতে চায়—তাহলে সুতীর্থের নির্দেশ—যাই হোক না কেন—বিরূপাক্ষ ও জয়তীর পথ কেটে দিক।

কিন্তু কে এই নারী? বিরূপাক্ষ অনড় অতল হয়ে ভাবছিল। এর বয়স কত হবে? সুতীর্থের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সুতীর্থের সোফায়; অন্ধকার—শীতের সন্ধ্যায়—রাগ গায় দিয়ে; ভাবতে ভাবতে বিরূপাক্ষের শিশু ও প্রৌঢ় মনের সন্ধিসত্তায়—যেখানে সংসর্গদানের সম্ভাবনা হিসাবে স্ত্রীলোকের ওপর চোখ পড়ে—কেমন যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ঠিক করে নিতে হল বিরূপাক্ষের।

ভাবছিল: জয়তীকে আমি কোনদিনই পাইনি। সবচেয়ে বেশি করে পেয়েছি বলে ভুল করেছিলুম যখন তখনই যদি জয়তী আমার ভুল ভেঙে দিত, তাহলে পরস্পরের শরীরের ওপর যে আকাট অধিকার করেছি আমরা তার কোনো প্রয়োজন হত না তো।

বিরূপাক্ষর সাদা অনুভূতি সিধে চেতনা এরকমভাবে ব্যাপারটার মীমাংসা করে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সমস্যার ছক অন্য রকম; জয়তী প্রতি মুহূর্তেই বিরূপাক্ষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না, সে প্রথম থেকেই বিরূপাক্ষের থেকে এত বেশি দূরে যে প্রকৃতির অথবা হৃদয়লোকের আইনজ্ঞানী বিশ্বের সেইটেই শেষ সীমা। (বাহির বা অন্তরের) বিশ্ব যেখানে আপেক্ষিক মণ্ডল নয় আর—সেখানে অবিশ্যি এদের দুজনের দূরত্ব ক্রমশই দূরতর হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের চেনাজানা নিসর্গ ও সংসারের প্রয়োজন সম্পর্কে সময় ও দেশ যে অশেষ, অনিঃশেষ, কে এসে তা প্রমাণ করে পরিষ্কার করে দেবে বিরূপাক্ষকে; খুব সজাগ চেতনায় নয় একটা সংস্কারের আবেগে সে ধরে নিয়েছে অবিশ্যি যে জয়তী ও তার যোগাযোগের ব্যবধান এত বেশি নয় যে কোনো দূরত্বের মাপক স্পান দিয়ে তাকে মাপা চলে না।

'আপনি কে?' সোজা প্রশ্ন করে বসল বিরূপাক্ষ।

'আমি? কেন?' মণিকা চলে যাবেন না দাঁড়াবেন ভাবছিলেন। 'আমি কেউ নই।'

'আমি ভেবেছিলুম সুতীর্থের নিকট আত্মীয়—'

মণিকা বিরূপাক্ষের দামী সিল্কের কাপড়-চোপড় সোনার ঘড়ি বোতাম মির্জাপুরী শাল জুতোর চামড়া ও রকমারি তলিয়ে দেখছিলেন। এত সব চটক আছে বলেই খানিকটা ভদ্রতা অন্তত করতে হয়—মধ্যবিত্ত মেয়েদের এই রক্তের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পেরে এতক্ষণ তিনি আছেন। এ না হলে হয়তো আগেই উঠে চলে যেতেন।

মণিকা একটু সাপের মন্ত্রের ধুলো উড়িয়ে হেসে বল্লেন, 'সুতীর্থ, না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভেবেছিলুম আপনি তার বিশেষ আত্মীয়।'

'যারা ঘাড়ে চড়ে থাকে সেইরকম একজন?'

'মানে?'

'সাপ্লায়ের ছোকরাদের, কণ্ট্রাক্টের ছোঁড়াদের হাতে জল খেয়ে, যাদের দিন কাটে; এমন কত মেয়ে-পুরুষ কলকাতায় আছে—'

'না, না, তা কেন?—তা নয়—সুতীর্থের বন্ধু আপনি। আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন। আপনাকে চা দেওয়া হল না তো।'

'না, না, আমি চা খাই না। আপনি বসুন।'

মনের ভুলে সিগারেট কেস বার করে পকেটে তখুনি ঢুকিয়ে রাখল বিরূপাক্ষ। মণিকা জিনিসটা দেখলেন; সিগারেটের প্রয়োজন লোকটার, কিন্তু তবুও কোনো উচ্চবাচ্য করতে গেলেন না তিনি। কেন করবেন? কেন এই মানুষ সামনে বসে তামাক টেনে বেয়াদবি করবে?

'সুতীর্থের কোন পাত্তাই নেই?'

'না।'

'কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে কোন রকম একটা আন্দাজ দিতে পারেন কি?'

'আমাকে বলে না কিছু।'

'অফিস করে আজকাল?'

'জানি না।'

'সেদিন বিজনহরি মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি সুতীর্থকে চেনেন বল্লেন, মল্লিকের অফিসেই কাজ করত নাকি, কিন্তু অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছে বল্লেন। অন্য কোনো অফিসে গেছে ?'

'মণিকা অবিশ্যি একটা অফিসের ঠিকানা জানতেন, ফোন নম্বরও জানা ছিল তাঁর, ফোনও করেছেন কয়েকবার ; কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি। অন্য কোথাও গেল সুতীর্থ ? সুতীর্থের অফিসে আজকাল নাকি স্ট্রাইক চলেছে। এ মানুষটাকে এ সব কথা বলে কী হবে ; ভাবছিলেন মণিকা। সুতীর্থকে তিনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এটা কত দূর মমতা, কত দূর সুপ্রিয়তর আকর্ষণ সহসা ঠিক করে উঠতে পারেননি। জিনিসটা ঠিক করে ফেললে আজ হোক, কাল হোক কিছুটা চাঁদ কেটে যাবে, ছক মুছে যাবে ঘরানা পৃথিবীর আর ঘরণী মানুষের। সেটা কি হতে দিতে হবে ? হলে ভালো হবে ?

'আপনি সুতীর্থের শুভানুধ্যায়ী—

'শুধু তাই যদি হতাম তা হলে সব কাজ ফেলে এখানে আসতাম ? আমাদের সম্পর্ক আরো—'

বিরূপাক্ষ ভাষা খুঁজছিল, কিন্তু যে রকম শব্দ বা পরিভাষা সে চাচ্ছিল তা পাচ্ছিল না ; 'আমাদের সম্পর্ক জল ঠিক নয়, জলের সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে', এই রকম বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই মহিলার সামনে ও সব বুলি অব্যবহার্য।

'আরো বেশী কিছু ; অনেক বেশী। জানি আমি।' মণিকা বললেন, 'সেই জন্যেই,বলছি ; একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।'

'বলুন।'

'সুতীর্থ হয়তো দেনার পাকে জড়িয়ে গেছে।'

'কেন ?'

'বে-থা করেনি বটে, সংসার পোষণ নেই, কিছু নেই, কিন্তু বেহিসেবী বড্ড—তা ছাড়া অফিসে স্ট্রাইক চলেছে।'

'স্ট্রাইক ? কোন ফ্যাক্টরী বলুন তো ?'

'ফ্যাক্টরী নয়। কি একটা ফার্ম। ওদের নিজেদের ফ্যাক্টরী আছে কিনা আমি জানি না। সুতীর্থ ধর্মঘটীদের দলে ভিড়ে গেছে নিশ্চয়ই। চাকরি গেছে ওর—ভাত জুটেছে কিনা সন্দেহ—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট-কেসটা আবার বার করে বললে, 'বটে, তা হলে তো

বড় মুশকিল হল। ও এখানে চলে আসে না কেন? আপনি তো ওর নিজের মানুষ।'

'ভাত খেতে সে এখানে আসবে না। খিদিরপুরে মেটেবুরুজে মজুরদের সঙ্গে মিশে খাবে।' 'আপনি বাস্তবিক সুতীর্থের কে হন?'

'কেউ নয়। আমি বাড়িউলি—' বলে বিরূপাক্ষের তেরছা চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় হেঁট করে সাতপাঁচ চিন্তা করতে লাগলেন মণিকা। বিরূপাক্ষ এইবার একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে আটকে নিল।

দক্ষিণ কলকাতার এ পাড়ায় কোনো বাড়ি উলি থাকে না, থাকে বাড়ির মালিক। ইনি মেয়েমানুষ নন—মহিলা; তবুও ঐ বিচিত্র শব্দটা ব্যবহার করলেন কেন। হয়তো অজ্ঞতায় অসতর্কতায় অজ্ঞাতসারে শব্দটা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। কাজেই বিরূপাক্ষের সিগারেটও আর দেরি না করেই জ্বলে উঠল।

'বেশ ভাল বাড়ি; সুতীর্থ দোতলার সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া করে আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ভাড়া দিচ্ছে না।'

কণ্ঠে নালিশের সুর, কিন্তু ততটা জমেনি; নালিশটা যেন সুতীর্থের বিরুদ্ধে নয় ঠিক, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে, আজকালকার দিনকালের—হয়তো বিরূপাক্ষেরও বিরুদ্ধে।

'আহা কেন—ভাড়া দিচ্ছে না কেন? আপনি কি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না, না, আমি ছেড়ে দেব কেন। সেলামী ভাড়া নিয়ে কত হাজার হাজার টাকা পাওয়া যায় এ বাজারে। আমি ছাড়ব কেন। আমার টাকার বড্ড দরকার।'

বিরূপাক্ষের মনে হল, এই কথাটার জন্যেই এতক্ষণ যেন সে অপেক্ষা করছিল; 'টাকার বড় দরকার' এই আওয়াজটার জন্যে। কলকাতার যে কোনো ফটকটে ঝরঝরে বা এঁদো ঘিঞ্জি আস্তানায়ই যাওয়া যাক না কেন, যে কোনো দেবী-পিশাচীর সঙ্গেই দেখা হোক, 'টাকার বড় দরকার' শেষ পর্যন্ত এই আবেদনেই কান শানিয়ে ওঠে তার, হৃদয়ে দোলা লাগে, কর্তব্যপথ ঠিক করে নেয় সে; রক্ত যদি বাস্তবিকই খোঁচা দিয়ে ওঠে বাস্তবিকই চেক কাটে সে। 'কত টাকা চাই? ক' মাসের ভাড়া?'

মণিকা দেবী একটু চমকে চেয়ে দেখলেন বিরূপাক্ষ পকেট থেকে চেক বই বের করছে—

'না, না, আপনি দেবেন কেন? আপনাকে আমি দিতে বলিনি তো।'

'সুতীর্থের জন্যে আমি দিয়েই থাকি। ও তো আমার—এক হাজার টাকায় হবে, না আরো বেশি?' ফাউন্টেনপেন বার করে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মণিকা হতমান মলিনতায় কেমন বেমানানো ভাবে যেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এক হাজারে মন উঠছে না হয়তো—'

'মন উঠছে না' বলছে লোকটা; বেল্লিক, আহাম্মক হয়তো, হয়তো আনাড়ি, ভাষার ব্যবহার জানে না। সে যা হোক, অত্যন্ত বেয়াদবির কথা বলা হয়েছে; এর পর আর এক মুহূর্তও এই ঘরে থাকা উচিত মণিকার? কি যেন বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল তবুও তাঁর; নড়ি-নড়ি করে কেমন একটা শীতকম্পে কেঁপে উঠল তার পায়ের নখ থেকে মাথার তালু অবধি; কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন না তিনি।

'তিন হাজার করে দিলুম।'

বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বা না তাকিয়ে এতক্ষণে সিগারেট জ্বালাবার অবসর হল তার। চেকটা সে মণিকার হাতে দিল না। বিছানার ওপর রেখে দিল। বললে, 'এই চেক' তাই বলে চেকটা হাতে তুলে যে নিতে হবে বিরূপাক্ষের সাক্ষাতেই তার কোনো প্রয়োজন নেই। মণিকাকে সে রকম দীন-দৈনতায় ভেতর নামিয়ে রসগ্রহণ করবার মানুষ বিরূপাক্ষ নয়। এখন নয়। মণিকার বেলা নয়। মানুষের আত্মা আছে—আত্মার দক্ষিণ মুখ—খুব সম্ভব অনেক দিনের জন্যে—মণিকার মত এরকম নারীর সম্পর্কে।

'আজ বড্ড শীত।'

চেক বইটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন মণিকা, বিরূপাক্ষ তার দিকে ফিরে তাকাবার আগেই চোখ আর একদিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি; বললেন, 'শীত খুব।'

'আমি তো সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসেছি, ভেবেছিলুম এইঁবার কলকাতায় বসন্তের হাওয়া ছেড়েছে বুঝি—'

'মাঘ মাস তো শেষ হতে চলল।'

'রাত ন'টা।'

'চললেন?'

'হ্যাঁ, সুতীর্থের কোনো খোঁজখবর পেলুম না তো।'

'শুনুন'—মণিকা চেকটা ফিরিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

'ওটা সুতীর্থের—'

'কিন্তু সে তো আসবে না।'

'দরকার নেই। ভাড়ার টাকা নিয়ে নেবেন। চেক ডিসঅনার্ড হবে না। কালই ক্যাশ করে নেবেন। বেয়ারার চেক দেব?'

'ওটা কি ক্রসড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ব্যাঙ্কে তো কোনো অ্যাকাউন্ট নেই আমাদের—'

'কোন ব্যাঙ্কেই নেই? এটা অবিশ্যি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের।'

মণিকা ঘাড় নেড়ে বললেন—'না।'

'ও হোঃ'—বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটাতো সুতীর্থের নামে লিখে দিয়েছি'—

চেক বই বার করে বিরূপাক্ষ লিখতে লিখতে বললে, 'আপনার নাম?

ওঃ মণিকা মজুমদার, এই যে আপনার আঁচলে সোনালি জরি দিয়ে লেখা আছে দেখছি—'

মণিকা আঁচল সামনে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিরূপাক্ষ চেক কেটে মণিকাকে বললে, 'এই যে তিন হাজার টাকার—আপনার নামে—' বিছানার ওপর রেখে দিল চেকটা বিরূপাক্ষ।

'এটা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড চায়নার—খুব বড় ব্যাঙ্ক এশিয়ার। ক্লাইভ স্ট্রিটে পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের বেয়ারাকে।'

বিরূপাক্ষ হেসে উঠে বললে, 'আমিও যেমন! এবারও ক্রসড চেক কেটেছি। বেয়ারার চেক দোব—বেয়ারার চেক দোব মণিকা মজুমদারকে।'

ক্রসড চেকটা বিছানার ওপর থেকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবার আগেই মণিকা আলগোছে কুড়িয়ে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গায়ের শালটা বেশ আঁট করে জড়িয়ে নিতে লাগলেন।

ষোল

বাঃ, কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে; ভাবছিল বিরূপাক্ষ; যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হয়ে

দাঁড়িয়েছে—অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা সুদৃঢ়া মহিয়সী। এরই মমতা ষোলকলায় পেয়েছে সুতীর্থ: অথচ দামাল হয়ে ফিরছে বুঝি বাইরে? আহাম্মক, দামাল হয়ে ধর্মঘটে নাচাচ্ছে।

'চেকটা আমি সুতীর্থকে দিয়ে দেব।'

'কেন, আপনার নামে তো কেটেছি।'

'সই করে দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।' বিরূপাক্ষ বললে, 'কিন্তু আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে না, ওকে দেবেন? আপনার নামেই জমা করে নিন না।'

'বললুমই তো ব্যাঙ্কে আমার কোন কারবার নেই, সুতীর্থেরও নেই। কিন্তু ওকে দিলে সে ভাঙিয়ে সমস্ত টাকাটাই আমাকে এনে দেবে। যদি না—'

বিরূপাক্ষ চোখ তুলে তাকাল মণিকার দিকে। ডান চোখের ভুরু উঠে গেছে—যত দূর ভুরুদের ওঠার শক্তি—বেশ পরিপূর্ণ সনির্বন্ধে।

'স্ট্রাইকে যদি মেতে থাকে তা হলে ও চেক সুতীর্থকে দেব না আমি—'

'তা দেওয়াও উচিত নয়। এটা আপনারই। আমি কি ভাবছিলুম জানেন?'

সিগারেট জ্বালিয়েছিল বটে, কিন্তু টানার অবসর পায়নি বিরূপাক্ষ। নিবে গিয়েছিল সেটা। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি ক্যাশ নিয়েও ফিরি। এই দেখুন না—' বলে পোর্টফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে একশো টাকার নোটের কয়েকটা তাড়া বের করে বললে, 'বরং এগুলোই রেখে যাই—'

মণিকা খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে ঘরবায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বিরূপাক্ষের চোখের ভেতর দিয়ে তার আতলস্বচ্ছ অন্তরাত্মাকে দেখে নিতে লাগল এমনি নীরব নির্মমভাবে যে বিরূপাক্ষ দাঁড়াবে কি চলে যাবে কথা বলবে না থ হয়ে থাকবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এই মেয়েমানুষটিকে—এই দেবাংশ উজ্জ্বল চিতল মাছটাকে হায়রান করবার আগে বেশ কিছু কাল সুতো ছাড়বার প্রয়োজন বটে উপলব্ধি করে বলে উঠল, 'আমি চলি।'

'বসুন। এই টাকাগুলো?'

'সুতীর্থকে দেবেন।'

'এই চেক?'

'চেকটাও।'

'কোথায় পাব তাকে ?'

'পাওয়ার দরকার নেই তার পাওনা তো আপনার প্রাপ্য।'

মণিকা হেসে বললেন, 'বেশ। মেনে নিলুম। কত টাকা আছে? আপনি কে? এত টাকার ছড়াছড়ি—'

'আমি উঠি।'

'কটা বেজেছে আপনার ঘড়িতে ?'

'প্রায় দশটা।'

'কত দূর যেতে হবে ?'

'ও—সেই রিজেণ্ট পার্কের দিকে—'

'রিজেণ্ট পার্কের বিখ্যাত মানুষকেই অতিথি করেছি আজ আমার ঘরে।'

'আমি কালোবাজারে বড় মানুষ।'

'হলেনই বা। বড় মানুষ তো। কালোবাজারে সবাই কি বড় হতে পেরেছে? রিজেণ্ট পার্কে কি আপনার নিজের বাড়ি ?'

'আছে একটা।'

'চোরাবাজারে চুরি করে বড় হয়েছেন স্বীকার করছেন। সকলে তো কবুল করে না। কেউই করে না!'

'যার কাছে খাঁটি থাকা দরকার সেখানে ভাঁড়িয়ে লাভ কি ?'

—শুনে—সামলে নিয়ে মণিকা কথা বাড়াতে গেলেন না।

দরজার দিকে যেতে যেতে এক-আধ পা ফিরে এসে বিরূপাক্ষ বললে, 'আজ বেশি রাত হয়ে গেছে।'

'দেখছি তো।'

'গাড়ি আনিনি, ভুল হয়ে গেছে। সুতীর্থের বিছানায় রাতটা যদি কাটিয়ে দিই তাহলে তেতলায় আপনাদের কোনো আপত্তি হবে না তো? বাড়িটা তো আপনার—'

'আমার নয় ওঁর। কিন্তু উনি কেন আপত্তি করবেন। আপনি থাকুন।'

'আপনি এক্ষুনি চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ, আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমি খেয়ে বেরিয়েছি; শীতের সন্ধ্যায় আমি খেয়ে দেয়ে সফরে নামি।'

'চাও খাবেন না ?'

'না', বিরূপাক্ষ বাতিটা নিবিয়ে দিল।

মণিকা সন্ত্রস্ত হলেন না, অপ্রতিভ হলেন না। সহজ গলায় বললেন,- 'নিবিয়ে দিলেন, আমার একটু কাজ বাকি আছে।'

বলেই বাতিটা জালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষের একশো টাকার কুড়িটা নোট স্বতীর্থের বালিশের ওপর থেকে গুছিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপাক্ষের জন্তে চা ফল মিষ্টি নিয়ে চাকর এসে হাজির হল। মণিকার অবিশ্যি নিচে নামবার কথা নয়। কিন্তু তবুও অনেক রাত উসখুশ করে উচাটন হয়ে রইল বিরূপাক্ষের মন—উৎখাত—উৎসাদিত হয়ে যেতে লাগল বিরূপাক্ষের শরীর ও মন। কিন্তু বিরূপাক্ষ তো আজকের নয়াল পাখি নয়, অনেক দিনের পুরোনো ভিটের হস্তেল ঘুঘু, কিন্তু তবুও ঘুমিয়ে পড়তে বেগ পেতে হল তার।

রাত পাঁচটায় সময়ে মণিকা টের পেলেন যে এতক্ষণে দোতলায় মানুষটি হোঁস হোঁস ঠোঁস ঠোঁস ফোঁস ফোঁস করছে; নাকই ডাকাচ্ছে বটে; এ কি মানুষ না পাঁকাল গজালের নাক ডাকানো? আস্তে আস্তে নিচে নেমে চক্ষুস্থির করে দেখে গেলেন একবার। স্বতীর্থের ঘরে ঘুমন্ত বিরূপাক্ষের পালঙ্কের পাশ দিয়ে এক আধবার পায়চারি করে গেলেন। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন—না চাইতেই লোকটা টাকা ঢেলে দেবে—কত যে ওগরাবে ওর কুমিরের টাকা;—কিন্তু বিনিময়ে কিছু তো দিতে পারবেন না মণিকা। না দিয়ে টাকা নেওয়া কি উচিত হবে তাঁর? টাকা নেবেন মণিকা অথচ কিছু দেবেন না, এ একবগগা খেলা কতদিন চলবে?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে দেখা হবার পনেরো কুড়ি বছর আগের থেকেই নিজের মূল্য মণিকা খুব ভালো করে জানতেন। বাইরের ভালো পৃথিবীর বড় পৃথিবীর নানারকম ভালো-মাঝারি জায়গায়ও যদি তিনি নামতেন—বাজে খারাপ জায়গা না মাড়িয়ে—তাহলে—

তেতলায় উঠতে আর দু এক ধাপ বাকি—মণিকা একটু থেমে দাঁড়ালেন।

তাহলে কি হত? কি যে হত না সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। ভেবে ভয়াবহভাবে লোভার্ত হয়ে উঠতে পারত তাঁর মুখ। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বুকের ভেতর অবিশ্যি কেমন একটা ঢিবঢিব করতে লাগল। কিন্তু কি যে শীতের দেশের দেবদারু মাংসের মতন দৃঢ়তা তাঁর নিজের চরিত্রের; বিমুগ্ধ হয়ে ভাবছিলেন মণিকা, নিজের বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে কোনো দিনও যান নি কোথাও—বিরূপাক্ষের মতন মানুষেরা এসে সেধে—বিনিময়ে

কিছুই পাবে না জেনে তবুও উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়। বাংলার নদীর ধারে আম-জাম-নিম-জামরুলের গ্রামে একদিন জন্মেছিলেন তিনি, কিন্তু আজকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিলঙ-টিলঙের পাইন গাছদের মত উঁচু, ঝাড়াঝাপটা, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন নক্ষত্রের নিচে বারান্দায় হিম রাতের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করছিলেন মণিকা।

পরদিন সন্ধ্যের সময় বিরূপাক্ষ এল।

সুতীর্থ আসবে কিনা সেই অপেক্ষায় হয়তো মণিকা দোতলার ঘরে বসেছিলেন। ঘরটাকে পরিষ্কার করে সাজিয়েও রেখেছিলেন সেই জন্যে। সন্ধ্যে হয়েছে—বাতি জ্বালানো হয়নি।

‘কে ?’

‘আমি।’

বিরূপাক্ষ বললে, ‘বিরূপাক্ষ, আমি বিরূপাক্ষ।’

‘বাবা, আমি ভয় পেয়ে গেছিলুম। আপনি কি বেড়ালের থাবার জুতো পায় দিয়ে হাঁটেন নাকি ?’

‘আমার থাবা ভিজে বাঘের মত, জুতো আমার বাছুরের চামড়ার। কেন এসেছি জানেন ?’

মণিকা বাতি জ্বাললেন সুইচ টিপে। বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল ; প্রসাধন যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ সাজগোজের ভেতর কোনদিক দিয়েই কোথাও কোনো ইঙ্গিত নেই ; নিজেকে ধুয়ে নির্মল করেছেন ; মনটা যেন কোনো ধোঁয়াটে জিনিসের সংস্পর্শে এসেছিল—তাকে ধুয়ে পাখলে মণিকা নিজেকে সফল, ঝরঝরে করে তুলেছেন।

‘সুতীর্থ এসেছে ?’

‘না।’

‘কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল তার ?’

‘না।’

‘না ? বড় মুশকিলেই পড়েছি।’

‘বলুন।’

‘কাল কি এই সোফাটা দেখেছিলাম ?’

'ওটা এক কিনারে ছিল। আমি যে কৌচে বসেছি সেটা নতুন ; তেতলার থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।'

ইলেকট্রিক বাল্‌বের চারদিক ঘিরে একটা রাত প্রজাপতি উড়ছিল সেদিকে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিরূপাক্ষ বললে, 'আপনার সময় হবে ?'

'কিসের জন্যে ?'

'গোটা কতক কথা আপনাকে বলতে চাই মণিকা দেবী।'

মণিকা হাত ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত দশটা অবধি সময় আছে আমার। তারপর ওপরে যেতে হবে। এখন সাতটা। আপনি আজ গাড়ি এনেছেন ?'

'গাড়ি এনেছিলুম কিন্তু মোড়ে বিদায় দিয়েছি।'

'দশটা নাগাদ এসে হাজির হবে ?'

'না, কিছু বলে দিইনি। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে আছি তাতো জানে না ড্রাইভার। না জানানোই ভালো। নানা রকম ফিচেল আছে চারিদিকে—সবাইকে সব জিনিস'—বিরূপাক্ষ পাউচ বার করল ; পরে পাইপটা বের করবে হয়তো—কিন্তু কি যেন ভেবে রেখে দিল পাউচ পকেটের ভেতর। 'দশটা অব্দি ? তারপরে ওপরে যাবেন বুঝি খাওয়া-দাওয়া করতে ?'

'আমি রাতে বিশেষ কিছু খাই না। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তেতলাটা খুব নির্জন মনে হচ্ছে। ওরা কারা ?'

'আমার স্বামী, আমার মেয়ে। ওরা ঘুমুচ্ছে, তাই চুপচাপ সব ; দোতলায়ও সুতীর্থ নেই। সুতীর্থ হইচই করত না বটে, কিন্তু তবুও সারা রাত এটা-ওটা সেটা নিয়ে জেগেই থাকত।'

'সবে তো শীতের রাত শুরু। এখনই ঘুমুচ্ছেন ওরা ; এই সোয়া সাতটার সময় ?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট টেনে নিল।

'উনি অসুখের মানুষ—'

'ওঃ।'

'এই সময়েই একটু ঘুম হয়। রাত দশটার পর থেকেই টান উঠতে থাকে।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'তা হলে তো বড়—'সিগারেটের এক টান দিয়ে বললে, 'সারা রাত জাগতে হয় আপনাকে ?'

'আমি হাঁপানির খুব ভালো ওষুধ পেয়েছিলুম' বিরূপাক্ষ বললে। 'এক সন্ন্যাসীর কাছে—অরুণাচলে। ওঁকে দিন। সেরে যাবে।'

'অরুণাচলে ?' মণিকা একটু জেগে উঠে যেন তাকালেন, 'কার অসুখ সারল সে ওষুধে ?'

'আমার নিজেরি।'

'হাঁপানি ছিল বুঝি ?'

'খুব মারাত্মক ধরনের ছিল ; কার্ডিয়াক হাঁপানি।'

মণিকা নিজের মনে নিজেকে বললেন, দেখ এই লোকটা কেমন চমৎকার মাইকেল মিথ্যে কথা বলছে। ওর টাকা আছে সেই জন্যে ওর হাঁপানি ছিল ওর আরও টাকা আছে, অরুণাচলের ওষুধে কার্ডিয়াক হাঁপানি সারাতে পেরেছে তাই, তার চেয়েও বেশী টাকা আছে ওর, সেই জন্যে আমার স্বামীর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে বলছে, এই সমস্ত কিছুর চেয়ে ঢের বেশী টাকা বিরূপাক্ষের এত বেশী টাকা যে, যে কোনো রকম ছকের যে কোনো পথে পথে ও বুঝি আমাকে হাত করবে ; সব দুয়োরেই ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হবে, আমাকে হাত করে, 'এসো, খুকি' বলে নিয়ে যাবে বিরূপাক্ষ।

ভাবতে ভাবতে ধ্যান নিরেট রসিকতায় মুখের আনাচকানাচ ছিটেফোঁটা হাসিতে কুঁচকে উঠছিল মণিকার।

'সে ওষুধ আপনার কাছে আছে বিরূপাক্ষবাবু ?'

'আছে বলেই তো মনে হয়, আমি খুঁজে দেখব।'

'কিন্তু, এ রুগীর বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কোনো জ্ঞানবিজ্ঞান দৈবী ওষুধ কিছুতেই তো কিছু হল না—বিরূপাক্ষবাবু—'

বিরূপাক্ষের মনে হল মেয়েমানুষের এ ঢং তার চেনা—এত ভড়কাবার কিছু নেই।

'ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে—' বিরূপাক্ষ বললে।

মণিকার মনে হল, লোকটা টাকার জন্যে কেয়ার করে না বটে কিন্তু নিজের কাজ গোছানো হলে পৃথিবীতে কারুর মূর্তিই বিশেষ সৌম্য থাকে না আর ; এরও থাকবে না ; কার কাছে কি বলেছে না বলেছে সে সব নিয়ে কেউ খুঁট বেঁধে থাকে না তখন আর। কাজ হাসিল হলে এও দুচারটে পালক খসিয়ে ডানা মেলে দেবে ধাড়ি লক্কার মত। কিন্তু দেব কি হাসিল হতে ? এ লোকের কাজ হাসিল করে দেব আমি ? ভেবে ভাঙা কাঁচের করাতের মত হাসিতে

মুখ ভরে উঠল মণিকার। অথচ বিরূপাক্ষ যে মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মণিকার সেমুখ হাসির কম্পহীন সমুদ্রপারের ঘন বুনোনো কর্মা শঙ্খের মত নিটোল।

‘চেকটা ক্যাশ করা হয়েছে, বিরূপাক্ষবাবু।’

‘উনি ভাঙালেন বুঝি: আপনার স্বামী? তিন হাজার টাকার চেক ছিল তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু ওটা ক্রসড চেক ছিল—’

‘তাতে কিছু বেগ পেতে হয়নি। আমাদের এখানকার ব্যাঙ্কের শিশিরবাবু তাঁর নিজের অ্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে নিয়েছেন।’

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’

‘আমাকে?’ মণিকা বললেন, ‘কেন?’

‘একটা ঋণ শোধ করবার দাবি মঞ্জুর করলেন বলে। সকলে তো করে না।’

বিরূপাক্ষের কথা শুনে এক আধ মুহূর্তের জন্যে একটু স্তিমিত মন্থর হাসি এল মণিকার মুখে; যেন কেমন হাসি? প্রশ্রয় দিচ্ছে যেন অবোধ বালককে, কৃপা করছে যেন অধম মুখফোঁড়িকে। মণিকাকে টাকা দিয়ে—যারা অনেক দূরের থেকে আসে মানুষকে টাকা গছিয়ে দেবার জন্যে, মানুষের মুখ্যত গায়ের গন্ধ শুঁকবার জন্যে সেই সব শুয়োরদের ভেতর নিজেকে খুঁজে পেল যেন বিরূপাক্ষ।

উঠে গিয়ে বিরূপাক্ষ দক্ষিণ দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিয়ে এল: ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

‘জানালা দুটো ও বাড়ির ঠিক মুখের ওপর।’

‘ওঃ, ওদের জানালাও বুঝি খোলা ছিল? মানুষ ছিল ও ঘরে—ওদের ঐ জানালার ঘরে?’ মণিকা জিজ্ঞেস করলেন।

‘দু-চারজন তাকিয়েই থাকে।’ বিরূপাক্ষ বললে।

‘কলকাতার মানুষের এরকম চোখ মারার অভ্যেস আছে—খুব বেশী। ভারি নিখিয়ে মানুষ সব’—বলতে বলতে সিগারেট জ্বালাল বিরূপাক্ষ।

‘ভালই করেছেন জানালা বন্ধ করে।’ মণিকা বললেন, ‘ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। খুব শীত করছিল।’

‘শীত ? শীত তো বটেই। তা ছাড়া বাড়ির খোলা জানালা; মানুষের চোখের নজরে আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি ?’

‘শালটা ভুলে ফেলে এসেছি।’

আলনার থেকে সুতীর্থের একটি ধোসা টেনে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, ‘আমার মত মেয়েমানুষের শীতবোধ বড্ড বেশী বিরূপাক্ষবাবু, শীত ছাড়া আর কিছুতে আমার এসে যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ তো আমার লক্ষ্মী।’

‘কোথা যাচ্ছেন ?’

‘জানালা খুলে দিই।’

‘কি দরকার ? থাক।’

‘এখন কটা রাত ?’

‘সাড়ে আটটা।’

বিরূপাক্ষ সিগারেটটা ঘরের ভেতর কোনো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে পাউচ বার করল, পাইপ বার করল। পাইপে তামাকের পাতা ভরতে ভরতে বললে, ‘কলকাতায় আমার তিনটে বাড়ি আছে—’

কলকাতা যখন বাড়ির শহর, তখন সে সব বাড়ির মালিকও রয়ে গেছে। কারু তিনটে বাড়ি আছে—কারু ত্রিশটে বাড়ি। কিন্তু এ সব বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে নিজের ঘরে আটক মণিকার বড় একটা দেখা হয় না। দেখা হলেও এমন কিছু হয়েছে এমন কেউ এসেছে বলে মনে হয় না তার।

‘কোথায় বাড়ি আপনার বিরূপাক্ষবাবু ? রিজেন্ট পার্কে তো একটা—’

‘হ্যাঁ, ঐ টালিগঞ্জে, বালিগঞ্জে, ঢাকুরিয়ায়।’

‘বাঃ, বেশ ভালো জায়গাই তো সব।’

‘ব্যাঙ্কে লাখ পনেরো-কুড়ি টাকা আছে।’

বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল মণিকা শুনলেন, কিন্তু শুনে কিছু হল না যেন পৃথিবীতে এল গেল না কারু কিছু। ব্যাঙ্কের টাকার কথা যেন মণিকা দেবীকে না বললেই ভালো হত। আমার একটা মাটির ঘোড়া আছে, একটা সোনার বাঁদর আছে, বাবা মেলার থেকে কিনে দিয়েছেন; এই সব কেচ্ছা আরম্ভ করেছে যেন বাচ্চা, এমনই নির্বিকার বরফার আত্মস্থ মুখ প্রতিভা। তবুও ঝুড়ির সব জিনিসই দেখাতে হবে, না দেখালে হচ্ছে না বিরূপাক্ষের; বললে, ‘পছন্দ করে বিয়ে করেছিলুম।’

'ভালোই হয়েছিল', মণিকা শীতের জন্যে খোলাটা একটু আঁট করে নিয়ে বললেন, 'দেখে শুনে কাজ করলে বেশ ভালো।'

'বাঁজা কিনা তাই তখনও যে রূপ ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু—'

বিরূপাক্ষ পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মনে কোনো শান্তি নেই আমার।'

পাইপ টানতে টানতে নীরব হয়ে নিবিড় হয়ে মণিকার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মণিকা উঠে যেতে পারতেন, কিন্তু বসে রইলেন বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে নয়, বিরূপাক্ষ যে আছে সে কথাটা থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি। বিগত পনেরো কুড়ি বছরের জীবনের নানা রকম ঘটনা উঁকি মেরে যাচ্ছিল মণিকার মনে। যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে ভালবাসে, যে স্ত্রীলোক যে পুরুষকে—তাদের মিলনামিলন কি মহাশূন্যের অন্তহীন নির্মোহের অন্ধকারে ফেঁসে গিয়ে শীতের রাতের শহরের ঘরে এই বিরূপাক্ষের মতন কৃকলাসদের জন্ম দেয়? মণিকা নিজে এখন এখানে বসে আছেন কেন—উঠে যাচ্ছেন না কেন? পরিভাষা শিখে ফেলেছে সে কাকলাসদের? স্বর্গীয় অনবনমন ভালো নয়, মাঝে মাঝে অবনমিত হয়ে সৃষ্টির সামলানো টালটাকে টালিয়ে দেবার ভেতর যে নির্জন রস আছে সেটা উপলব্ধি করে দেখতে হয়—সেই জন্যেই মণিকা এখানে বসে আছেন এখন; মুখোমুখি বিরূপাক্ষ। কথা বলছে—

দুজনেই মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে বসে রইল। তারপরে বাতি নিবিয়ে মণিকা ওপরে চলে গেলেন—তাড়াহুড়ো করে নয়, স্বাভাবিক সুস্থতায় যেমনই করে বাতি নিবিয়ে মানুষ বসবার ঘর থেকে খাবার ঘরে শোবার ঘরে চলে যায়।

ওপরে যাবার আগে মণিকা আলো নিবিয়ে গেলেন কেন ভোর পাঁচটা অবধি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে আকচার প্যাঁচ কষে এ সমস্যার যখন কোন জট খসল না তখন একটা ভেরামন, তারপরে আর একটা ভেরামন খেয়ে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল বিরূপাক্ষ।

শেষ রাতে জেগে উঠে তেতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বিরূপাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলেন মণিকা। নিচে নেমে এসে লোকটার গায়ে সুতীর্থের কম্বলটা আলগোছে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

সতেরো

কেমন যেন কি যেন একটা মিলে গেছে—ঘুরে ফিরে পরদিন সন্ধ্যায় আসতে হল বিরূপাক্ষকে আবার। সন্ধ্যা উতরে গেছে—খানিকটা রাত হয়েছে। মোটরটা মোড়ে বিদায় দিয়ে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে, না গড়িমসি করছে। গাড়িটা যখন অনেক দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি তার চেনা পথ ধরে সুতীর্থের ঘরে এসে হাজির হল।

'ভেবেছিলুম আপনি এখানে থাকবেন না—' মণিকাকে বললে বিরূপাক্ষ।

'ছিলুম না, এই এক্ষুনি এসেছি। সুতীর্থর একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি। শুনলুম পুলিশ গুলি চালিয়েছে—'

'কোথায়?'

'কলকাতার নানা জায়গায় —'

বিরূপাক্ষ অতশত খবর রাখে না। সারাটা দুপুর সে ঘুমিয়েছে, নেশা করেছে, মদের নেশা কিছু কিছু আছেই। আরো নানারকম নেশা। চৈতন্য তার সারাদিনই আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনেক দিন থেকেই সে আধো চেতনা-অচেতনার ভাগাড়ে কবরে হায়নার মত অন্ধকারে অন্ধকারে দিন কাটায়।

'গুলি চালিয়েছে? কই আমি তো শুনিনি।'

'আমি শুনেছি।'

'গুলির শব্দ? এ পাড়ায়?'

'কোন্ পাড়ায় কে জানে। মারাত্মক শব্দ কানে এসে পৌঁছয়—মানুষ কি স্থির থাকতে পারে! কেমন লাগে যেন।'

'ঠিক কথাই তো'—ভাবছিল বিরূপাক্ষ কিন্তু মুখে এই কথা মণিকার; সেই মুখেই আবার সাজগোজের ছিটে একেবারেই যে কিছু পড়েনি তা নয়।

বাতিটা জ্বালানো ছিল—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কোথাও পাউডার-ক্রিমের আঁচ পাওয়া যায় না অবিশ্যি, কিন্তু কেমন ঘন কালো চুলে কি সিঁথিই বটে—ওরই ফাঁকে একরত্তি সিন্দুরের বিন্দুটুকু দেখ; কী ত্রৈলোক্যচিন্তনীয়।

'আমার মনে হয় দিশি পটকার শব্দ শুনেছেন।'

'কে, আমি? কি যে বলছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'অনেক নচ্ছার ছেলেছোকরা থাকে লুকিয়ে পটকা ফাটিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়।'

'কোন্‌টা গুলির শব্দ, কোন্‌টা তুই পটকার সে তো শিশুও বোঝে। আমি আশ্চর্য হলুম কলকাতায় এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—আপনি কোথায় ছিলেন।

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল আজ। মাথা নেড়ে ভারিক্কি চালে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল আবার; ভাল করে ধরেছিল না।

বললে, 'না, কিছু হয় নি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কলকাতায় দিনরাত কত রকম শব্দ হয়। কে আপনাকে বলেছে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আপনার স্বামী অবিশ্যি বাইরে যান নি। কোনো ছেলে-ছোকরাও নেই এ বাড়িতে রাস্তার সোরগোল হই হল্লায় কত গুজবের—

'না হলেই ভালো। সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ খুব সেয়ানা ছেলে। এতদিন তো খুব ভালো জায়গায়ই ছিল?

'কোথায়?'

'আপনার এখানে।'

'আমার এখানে—আমি তার কি উপকার করতে পেরেছি?'

মণিকার গলা কেঁপে উঠল; এটা ভান—না সাচ্চা—চুরুট টানতে টানতে সহসা কিছু ঠাহর করে উঠতে পারল না বিরূপাক্ষ। হয়তো সত্যি—সৎ—কিন্তু কি আসে যায় তাতে। সুতীর্থ যা না চাইতেই পেয়েছে বিরূপাক্ষ তা চেয়ে আদায় করে নেবে; এর ভেতর ভেবে দেখবার কি আছে যদি সে হাত পেতে নিতে চায়; সুতীর্থের চেয়ে ভাগে কিছু কম পাবে হয়তো—নির্মলতায়ও কিন্তু বস্তু হিসেবে বস্তা ওজনে বেশীই পাবে; কালোবাজারের কারবারী সে, এই জিনিসই তো সে চায়। এই নারীটিকে বশে আনতে হলে আরো ঢের সাধনার দরকার—না আজ রাতের ভেতরেই কোনো একটা রফা হয়ে যাবে?

পুরুষ ও মেয়েমানুষ সম্পর্কে এসে কাজে কারবারে হামেশা মিথ্যে কথা বলতে হয় বিরূপাক্ষকে। কখনো সাজিয়ে মিছে কথা বলে, কখনো সোজা সিধে মিথ্যে কাজ দেয় বেশী। কিন্তু কি নিয়ে কার সম্পর্কে কি রকম মিথ্যে বলবে সে এখন? যাতে মণিকার মন গলে যাবে? কি বলবে এখন কোন কলাবলিরই দর নেই যেন, মিথ্যে কথার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—মিথ্যে হোক,

সত্য হোক, খানদানী কারবার করতে হবে বটে, রাত হচ্ছে, প্রথমেই প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলবার জন্যে বিরূপাক্ষ বললে, 'সুতীর্থদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলুম আমি—' এটা মিছে কথা।

'গিয়েছিলেন সেখানে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল?'

'স্ট্রাইক হয় নি।'

'আমি যে শুনেছিলুম সুতীর্থই স্ট্রাইকের ব্যবস্থা করছে।'

'সুতীর্থ কলকাতার বাইরে চলে গেছে।' মিছে কথা সব বিরূপাক্ষের; মণিকা দেবী ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না।

'কেন? গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে নাকি?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু, আছে বলেই বোধ হচ্ছে—'

অনেক দূরে কিছু ঘনিয়েছে বোধ করে ডাকপাখিনীর মত স্বর্গের ঝিলিকের ভেতর অস্বস্তি বোধ করে মণিকা একটু ডাক পেড়ে বললেন, 'ও পাগল বাইরে চলে গেল কেন?'

'এ ছাড়া কী করবে?'

'আমার এখানে এলে আমিই তো তাকে লুকিয়ে রাখতে পারতাম—'

'সুতীর্থের নিজের ঠিকানায় তাকে লুকিয়ে রাখবেন আপনি?'

'না, না, এখানে নয়—অন্য জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করতুম—'

'ও সব এখানে বসে বলছেন তো, ওতে কাজ হয় না। নাঃ, সুতীর্থ যা করেছে ভালোই করেছে।'

'যাক, বেঁচে থাকলেই সব। ভেবেছিলুম কোনো অঘটন হয়ে গেল নাকি—কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।'

'টালিগঞ্জে। সব্বোনাশ। সেটা হল কলকাতার বাইরে?'

'কি হবে টালিগঞ্জে থাকলে? এমন কি দোষ করেছে? খুন জখম তো করে নি? যদি জেলে যায় দুচার মাসের জন্যে যাবে হয়তো—'

মণিকা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপরে নিজের বাঁ হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, 'জেলে যাবে—কেন

যাবার কি দরকার? কি করেছে যে যাবে? একজন মানুষের দু'চার মাস জেল কিছু নয়—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়?'

'দুচার বছরেরও হতে পারত—'

'করেছিল কি?'

'ধর্মঘটীদের নাচাচ্ছিল।'

'কি করতে?'

'মারামারি হয়েছিল। খুন হয় নি।'

চুরুটের মুখে বেশ খানিকটা ছাই জমে উঠেছিল বিরূপাক্ষের। সেদিকে তাকাতে তাকাতে বিরূপাক্ষ বললে, 'খুন হয় নি তাই বাঁচোয়া। কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক, তারপর বেরিয়ে এলেই হবে। কিছু হবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমি নিজেই বলে দেব—'

'ভালোই করেছিল।' বিরূপাক্ষ চুরুটের ধোঁয়ার মিহি ঘুরপাকের দিকে তাকিয়ে বললে স্ট্রাইক করবে না কেন? আমাদের দেশটা যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি বলেই তো কেষক-টৈষকের এই দুর্দশা।—'

শুনে মণিকা বললে নিজেকে: এই লোকটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে অন্য রকম কথা বলে এসেছে। ধর্মঘটীদের গাল দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকে তাতিয়ে এসেছে। আমার এখানে এসে ঝাড়ছে দেশিকতা ও গণসাম্যের চাল। এদের চিনি আমি—এদের কি উদ্দেশ্যে তাও জানি। এঁটিলির মতন লেগে থাকে মানুষটা রাতের পর রাত। টাকার দরকার অবিশ্যি আমার। এ সব মানুষের কাছে না নিলে কোথায় পাব? নেব—কিন্তু যা চায় ও কি জানে যে কিছুতেই তা পাওয়া সম্ভব নয়।

'আমি এইবারে একটা ফার্ম খুলব ভাবছি। খুলে সুতীর্থকে করব ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর আপনাকে—'

এ লোকটা কি রকম যে গ্রহতিথির মত এসে পড়েছে কোত্থেকে যে আমার জীবনে। আমি চাঁদ হতে পারি; আমি সূর্য হতে পারি আমি সূর্য দেবী—আঃ, কী অনন্ত রোদ চারদিকে আমার—মকর সংক্রান্তির ভোরের—কিন্তু—, মণিকা দেবী ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলেন যে, কিন্তু বিরূপাক্ষ তাকে চমকে জাগিয়ে দিয়ে যেন বললে, 'সুতীর্থ ঠিক কোথায় আছে শুনুন তাহলে, আছে—টালিগঞ্জে—আমার—'

কিন্তু টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে হল? সে তো বিপদের এলাকা।'

'কে অত খোঁজখবর নেয়। আর বকুল ঝাউ দেবদারু নিম জারুলের একটা উপবনের ভেতর টালিগঞ্জে আমার বাড়ি। তাই বলে আকাশ রোদ বাতাসের অভাব নেই। কিন্তু ওখানে কে যাবে—কে সন্দেহ করবে?'

'কিন্তু ঘাপটির ভেতর লুকিয়ে থাকবার মানুষ নয় তো সুতীর্থ। আপনার বাড়িতে আছে ভালো মানুষ সেজে?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর হেপাজতে।'

উৎসুক হয়ে তাকাল মণিকা।

ওরা, দুজন অনেক দিন থেকেই এ-ওকে চেনে। প্রায় কুড়ি বছরের আলাপ। জয়তীর জন্ম থেকেই তো। ভাই-বোনের মত গা ঘেঁষে চলেছে। এখন অবিশ্যি অন্য রকম। সুতীর্থের মতন লোকের কাছে আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি, যতদূর যায় ওরা দুজনে যাক, আমার কোনো আফসোস নেই—' চুরুটের আগুন নিবে গেছে বিরূপাক্ষের, কথা বলা শেষ হয় নি; দু'একবার হ্যাঁচকা টেনে দেশলাই বার করল।

'নাঃ, ওতে আমার কোন খিঁচ নেই', বিরূপাক্ষ বললে, 'একটা জিনিসের ভালো মীমাংসা হয় ওতে। অন্য পাঁচ রকম না হয়ে সুতীর্থকে যদি জয়তী নিয়ে নেয়, তা হলে মন্দের ভালো হল—নাকি ভালোই হল।'

মণিকা ঘাড় কাত করে পায়ের নীচে মেঝের একটা ভারি সুকুশল কালো স্বস্তিকা ছকের দিকে—মহাশূন্যের দিকে যেন চিরনারীর মত তাকিয়ে ছিলেন—কোনো কথা বললেন না।

বিরূপাক্ষ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিল চুরুট জ্বালবার জন্যে। কিন্তু চুরুট না জ্বালিয়ে মণিকার মুখের দিকে নিজের চোখের মণির নিঃশব্দতায় নিষ্কম্পতায় কয়লাখনির সমস্ত অন্ধকার আর্তির মত যেন কোন অদেখা সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। দেশলাইয়ের আগুন নিবে গেল।

মণিকার মোমের মত নেই কিছু—সীসের মত নেই—কেমন যেন কঠিন গোমেদ মণির মত অন্তরাত্মার দিকে তাকিয়ে রইল বিরূপাক্ষ, কিছু ভেদ করতে চাইল যেন সে।

'আমার আজ শরীর খারাপ', মণিকা বললেন।

'আচ্ছা, আমি উঠি।' বললে বিরূপাক্ষ।

'না। আপনি বসুন।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে? আমার কাছে ওষুধ আছে—শরীরের যে কোনো

রকম অসুবিধে অস্বস্তি দূর করে দেবে এ ওষুধ—ওয়ারের আগের—খুব ভালো—জার্মান—' বিরূপাক্ষ পোর্টফোলিও ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল।

যেন কিছু হয় নি এমনিভাবে মুখ করে—এ ভান ধরা পড়লে পড়বে, কি আর করা যাবে—এমনই মুখভঙ্গিতে হেসে ফেলে মণিকা বললেন, 'একটা সংসার সঙ্গে ফেরে—ওষুধ-বিষুধ সব কিছু? আমার ওষুধের কোনো দরকার নেই বিরূপাক্ষবাবু—'

'একটা বড়ি শুধু খেয়ে দেখুন—'

'না।'

'থাক তাহলে।' চুরুটটা জ্বালানো দরকার। কিন্তু না জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'উঠি। মানুষ নেই। কোথাও কোনো প্রাণ নেই।'

মণিকার প্রাণে বেশ বড়, ফলসা উজ্জ্বলতা আছে। শরীরে আছে রূপ। রূপের অহঙ্কার আছে। মাঝে মাঝে মণিকার এই নির্বিশেষে তীক্ষ্ণ জ্ঞান যে কোনো মানুষের জন্যে হৃদয়ের যে কোনো কোমল সক্রিয়তাকে কেটে ফেলে আত্মস্বাতন্ত্র্যে এমনই একাকী করে তোলে তাকে—সব কিছুর আর সকলের মনে এমন একক—যে এই পৃথিবীতে নারীসত্তমা বলতে তিনি ছাড়া যে আর কেউ আছেন সে কথা স্বীকার করতে চান না মণিকা—বিশেষত তাঁর স্তাবক পুরুষমানুষদের সামনে।

মণিকা আহত হয়ে সুতীর্থের স্খলন বৃত্তান্তের কথা ভেবে দেখেছিলেন। ব্যথাকে তিনি ব্যথার পথে গভীরে না নামতে দিয়ে পাশ কাটিয়ে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন অন্য কোথাও— হয়তো অস্বস্তিতে, ক্ষয়ভঙ্গুর ক্ষণিক অস্বস্তির ভেতরে। তবুও ব্যথাই বড়, কিন্তু তবুও তিনি বয়সী মেয়েমানুষ, কাঁচা মন। ব্যথাকে তিনি স্তম্ভিত করে রাখতে পারেন, যেন ব্যথা নেই অন্য কোনো মুহূর্তের জন্যে; আছে; তারপরে সময় আছে: মানুষকে স্নেহাই দেয়—চুম্বকের মত টেনে নেয় সব ব্যথা নিজের বুকে সময়। অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বাধা পাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন সব মণিকা। হঠাৎ বিরূপাক্ষের কথা শুনে তিনি আরেক পৃথিবীতে নেমে এলেন, দুঃখ যেন মুহূর্তেই সরে গেল মর্যাদাকে স্থান দেবার জন্যে, ব্যথা লঘু, ফিকে হয়ে গেল বিরক্তিতে। নিজের মনকে বললেন মণিকা: কোথাও প্রাণ নেই যাবার জায়গা নেই: এ কথা আমাকে শোনাতে আসে কেন বিরূপাক্ষ। প্রাণ যে সমুদ্র তা সুতীর্থ টের পেয়েছিল, কিন্তু ধনুক তুলে শাসন করল না, মর্কটের মত শিলা জলে ভাসল: কে জানে। প্রাণ নেই—বলছে

বিরূপাক্ষ. কোথাও যাবার জায়গা নেই—আমার কান ছায় পোকা খসাবার মত আর কোনো জায়গা নেই বুঝি মানুষটার।

'সুতীর্থকে ভালবাসতুম বলেই আজ ক'রাত ধরে এখানে আসছি—' বক্তব্য শেষ করবার আগে চুরুটের দিকে নজর পড়ল বিরূপাক্ষের।

'কিন্তু আজ রাতে সুতীর্থ তো আপনার বাড়িতে'—মণিকা বললেন।

তবুও কেন বিরূপাক্ষের এ বাড়িতে আসা? মণিকার মনে হল, বিরূপাক্ষ এবার মণিকাপীঠে ঢেলে দিয়ে ঢের মর্মভেদী কথা বলবে: সে সব কথা মণিকার গ্রহণযোগ্য না হলেও বেশ চমৎকার শোনাবে কিন্তু।

'কিন্তু সুতীর্থের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এই সব হল আর কি।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকাপীঠে মাথা খুঁড়ে কোনো কথা বললে না সে—কোনো কথাই বললে না—নিজের স্ত্রী কি করেছে না করেছে সেই গুমরে অভিভূত হয়ে জড়বুদ্ধির মত যেন বিরূপাক্ষ: মণিকা যে সামনে বসে আছেন খেয়ালই নেই যেন। নিজেকে এক আধ মুহূর্তের জন্যে কেমন ছেঁদো মনে হল মণিকার, ওপরে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল তার। শীত বেড়েছে—ঘুমও পেয়েছে। ঘুমের ভেতরে চিন্তার কোনো স্থান নেই—কোনো বিক্ষোভ নেই—মণিকা নেই, মণিকাপীঠে নেই, পীঠে এসে যে তান্ত্রিক সেবক নিজের মূঢ়তার জন্যে দেবীকে তৃপ্ত করতে পারল না সেই অপরিতৃপ্তির কোনো তিতকুট নেই শীতের রাতের সমস্ত বর্ণালির শেষে এক, নিঃশব্দ অন্ধকার বর্ণের ঘুমের ভেতর।

'আপনার স্ত্রীকে চিনি না আমি, কি করেছে জানি না। আপনি দেখুন শুনুন সুতীর্থ যদি এদিকে আসে কোনো দিন তা হলে আমি এ সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলা দরকার মনে করি না তার সঙ্গে—আপনার সঙ্গেও না। হুজুকে মেতে খুন করে নি তো সুতীর্থ?'

'না।'

'আপনার বাড়িতে আছে তা কেউ জানে?'

'কেউ জানে না।'

'কেউ জানে না, ভালো কথা। জানতে পারে হয়তো কেউ। ট্রাইকে বা অফিসে, কোথাও আর কাজ করবার ফাঁক নেই সুতীর্থের—শীগগির নেই। মণিকা এখন হাত ঝেড়ে বাতাসে হাত ধুয়ে ওপরে চলে যাবেন ভাবছিলেন। পা বাড়াচ্ছিলেন প্রায় যাবার জন্যে; বিরূপাক্ষকে কিছু না বলে, নাক উঁচু করে

ওপরে চলে যাওয়াটা হয়তো অভদ্রতা হয়; অনেকে ঐ রকমই সটান চলে যায়—ভদ্রতার বালাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও চলে যাওয়ার ওরকম ঢঙটা পছন্দ করেন না মণিকা। বিরূপাক্ষ অপরাধ নেবে কি না নেবে—মণিকা শালীন ঘরের মেয়ে না অন্য রকম ঘরের—এ সব কারণে নয়, এমনিই বিরূপাক্ষের মতন একজন আলপটকা আপাতভদ্র মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে শিষ্টাচারে সুস্থতার কথা বলে বিদায় হওয়ার রকমটা ঠিক; এটাই ঠিক মনে হয় তার।

মুখে হেসে ভদ্রতা করে মণিকা বললেন—'আচ্ছা, উঠি আমি—'

'আমার বাড়ি তিনটের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে চাই।'

'বাড়ি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা—' মণিকা অন্য কথা ভাবছিলেন।

'আমি নিজের জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে চাই মণিকা দেবী—আপনার সহায়তা ছাড়া কি করে চলবে আমার। চারদিককার এই বিশৃঙ্খলার ভেতর আর একজন মানুষকেও আমি দেখছি না।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকা জানালার বাইরের রাত্রির দিকে তাকিয়েছিলেন—লোকটা তাঁর খোশামুদি করছে—সমগ্র মন দিয়ে বোঝাই যায়, কিন্তু তবুও সে মননের উৎপত্তি মন, নয়, মাটি—বিরূপাক্ষ নলিনাক্ষ কমলাক্ষের হযবরল সত্তার। তবুও মন যে ভিজল মণিকার তা নয়, কিন্তু দু'এক মুহূর্ত আগেই যে আত্মমূল্যকে সবচেয়ে বড় জিনিস মনে হয়েছিল—এখন কেমন যেন ফাঁকা মনে হল সেটাকে। হল নাকি? মনের দ্রুত পরিবর্তন; কিন্তু কোনো পরিবর্তনই তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। মণিকা আয়ত্তের ভেতর আসতে চাচ্ছিলেন—সুতীর্থের—এমনকি বিরূপাক্ষের মত মানুষেরও মনের কোনো নারীকূট নারীজননীকূটের নির্মল ঐকান্তিকতার সূত্র ধরে।

'এই তিনটে বাড়ির ট্রাস্টি করতে চাই আপনাকে।'

'বাড়ির ট্রাস্টি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির ট্রাস্টি আমাকে? তাতে আপনার কি লাভ?'

'আপনি নিজে রয়েছেন আমার জিনিস দেখে শুনে ঠিক রেখে,—বুঝে দেখবার জন্যে ট্রাস্টিদের বোর্ড ডিরেক্টরদের বোর্ড গলদঘর্ম হচ্ছে না, কোনো বোর্ড নেই কিছু নেই—শুধু আপনি আর আমি—'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালতে গিয়ে দেখল তার হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর একটা আশ্চর্য শীত উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার।

'আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করবেন না বিরূপাক্ষবাবু।'

'আপনাকে ছাড়া কাউকেই—বড্ড শীত—'

'সুতীর্থের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন।'

'না কম্বল লাগবে না আমার।'

'আজ শীত নেই তো।'

'শীত নেই তো, শীত করছে বড্ড।'

'দিনটা তো আজ গরম—'

'কিন্তু আপনি তো শীত পুকুরের বর্ত করেছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'শীতটা কমছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কমবে. বাড়বে, ওটা শীতরাতের শীত নয়।'

'তবে ?'

'ওটা নাভীর শীত।'

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে একটা বেড়াল শেয়ালের মত অবোল মিনি মণিকা দেবীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, 'শীতটা যে ভেতরের সেটা সত্যি।'

শীতের কাঁপুনি কমে গেল বিরূপাক্ষের। কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখে যে কথা এসেছিল, কিছুক্ষণের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল—জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল তার।

মণিকা দয়াপরবশ হয়ে বললেন বাতিটা আপনার চোখে লাগছে।'

কোনো সাড়াশব্দ করল না বিরূপাক্ষ বাতিটা নিভিয়ে দিলেন না মণিকা, এমনিই ওপরে চলে গেলেন।

আঠারো

পরদিন রাতে সুতীর্থের ঘরে ঢুকে চড়া বাতিটায় বড্ড অস্বস্তি বোধ করল বিরূপাক্ষ।

'সুতীর্থের যা রকম, একটা নব্বই ওয়াটের বাতি এনে রেখেছে ঘরে। কি দরকার এটা জ্বালিয়ে রাখার ?' বললে বিরূপাক্ষ।

'জ্বলছে তো' মণিকা বললেন, 'মানুষ আলোই ভালবাসে।' 'হ্যাঁ। মানুষ তো বেড়াল নয়—' বলে বিরূপাক্ষ একটা সাদা কথা বলে ছেড়ে দিল ; আরো ঘোরালো করতে পারত বুঝি কথাটাকে।

‘দশ পনেরো ওয়াটের একটা সবুজ বালব দেওয়া যাবে এই ঘরে—সুতীর্থ যতদিন না ফেরে—’

‘কোথায় ফিরছে। ওকে তো গুণ করে বেঁধে রেখেছে।’

‘কে?’

‘জয়তী।’

‘জয়তী?’

‘আমার স্ত্রী। গুণী মেয়েমানুষ। সুতীর্থ বড়সড় হলে হবে কি—ওর মাকে এখনও ছেলেবেলার দুধ।’

নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন মণিকা; কাঁটা—ঘড়ির সময়—থেকে থেকে ভেসে উঠছিল তাঁর চোখে; এতটা বেজেছে; একটা বেজে এত মিনিট। কিন্তু মানুষের ছোট্ট সময়টা তলিয়ে যাচ্ছে যেই সময়ের ভেতর, সেইখানে মনোনিবিষ্ট হয়ে থেকে আবার ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তাঁর।

‘জোর বরাতে মানুষ এরকম এয়োতি পায়, আমিও পেয়েছিলুম।’ বিরূপাক্ষ বললে, ‘আশ্চর্য, কী করে রং ছুট হয়ে গেল। দুজনের মন দুদিকে হেলে পড়ল।’

‘তাই কি হয় কখনও?’ মণিকা বললেন, ‘দুঘাটে বসে স্বামী-স্ত্রী কখনও নিজেদের মজা দেখে?’

‘আপনি ভদ্রলোকের স্ত্রী, সেইজন্যই এই কথা বলছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে।’ বললে বিরূপাক্ষ; বলবে কি না বলবে—কিন্তু তবুও এরপর আস্তে আস্তে বললে, ‘কিন্তু কথা বলার মধুরতাও তলানির দিকে তিতো হয়ে আসে, তখন চুপ করে থাকাই ভালো।’

মণিকা কব্জি ঘুরিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন আবার। সেকেণ্ডের কাঁটা কেমন মৃদুকম্পনে ঘুরে চলেছে; কাঁচ কাঁটা সোনা, সব উজ্জ্বলতার অতীত একটা সময় ও সমাধির খোঁজ পাওয়া যাবে বিরূপাক্ষ এ ঘর থেকে চলে গেলে;—একে তাড়িয়ে দেবেন না মণিকা—যতক্ষণ আছে অভদ্রতাও করবেন না; মাঝে মাঝে আলাপচারিতে একটু আস্বাদও আছে।

‘আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মধুরতা বেশি’, মণিকা বললেন, ‘তা নয়’।

‘তা হলে সে তিতো মদ। আদ্যোপান্তই তিতো;’

‘তা হবে।’

বিরূপাক্ষের চোখ আমেজে কুঁকড়ে আসছিল, বললে, 'আহা, বড় সুন্দর কথা তো ; কি বলছিলেন ?'

মণিকা পাঠ অপাঠের ওপারের থেকে যে কল ঘোরাতে জানেন তাই ঘুরিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মানুষের কথাবার্তার মধুরতা বেশি—' মণিকা ভাবছিলেন : বিরূপাক্ষের কাছ থেকে আমি কয়েক হাজার টাকা নিয়েছি ; আমার খুবই দায়ের সময় টাকা দিয়েছে। টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে পারব কিনা বলতে পারছি না। ওঁর সময় নেই, আমাদের কোনো আয় নেই, সুতীর্থের কাছ থেকে ঘর ভাড়া পাচ্ছি না। নিচের তলায় যাঁরা আছেন জাপানী বোমার হিড়িকের সময় ভাড়া নিয়েছিলেন, মোটে ষাট টাকা পাওয়া যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে ; এতে কি সংসার চলে আজকাল ? রোগের চিকিৎসে হয় ? ভদ্রভাবে থাকতে পারে মানুষ ? বিরূপাক্ষ বিপদের সময় টাকা দিয়েছে, দিয়ে কোনো দলিল পর্যন্ত রাখেনি, টাকা সে ফেরৎ চায়ও না ; কী চায় ? শীত রাতে স্ত্রীলোকের মুখে কথিকা শুনে তৃপ্ত হয় ওর মন, কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু ও চায়, সে সব পাবে না কিছু, কিন্তু যা দিচ্ছি, সে সব ভালো কথা সাজিয়ে দিচ্ছি আমি—যেন একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের মত—এটা দেব বিরূপাক্ষকে—যদি চায় আরো কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেব। শীতের খুব বেশি রাতে মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলায় বনঝাউ গ্রামে কোকিল ডাকত ; গত বছরও গিয়েছিলাম গাঁয়ে, তেমনি ডাকছে কোকিল পউষের মাঝরাতে কোকিল যখন ডাকে তখন তার চারদিকে লোচ্চারা কান পেতে শুনছে বলে কোকিলের চরিত্র নষ্ট হয় না। কোকিলের কথা কথিকা শোনাব আমি (কাকে চাচ্ছে কোকিল, কোথায় ; বিরূপাক্ষের সম্পর্কে সেটা অবান্তর) শীতের বেশি রাত অব্দি বিরূপাক্ষকে ; কিন্তু পাঁচ সাত হাত দূরে থাকবে ওর নিজের কোচে, আমি এই পুবদিকের সোফাটায়। ও যদি উঠবার উপক্রম করে কিংবা এগিয়ে আসে আমার দিকে— ওপরে চলে যাব আমি। ওর স্ত্রীকে ও কি করে পেয়েছে সেটা বোঝা শিবের অসাধ্য—কিন্তু বিরূপাক্ষের ঘাট বুঝে টাকা ওড়াবার বাতিক থাকলেও ও বড়জাতের মানুষ নয়—কোনো স্বাভাবিক মহত্ত্বই নেই—ওর হালচাল ; ধাষ্টামো আছে, শরীরের তাগদ—তেল যাকে বলে—হেঁড়ে বেল্লিকপনা এইসব আছে ; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয়, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই কথাবার্তার মধুরতা বেশি' বলছিলেন

মণিকা দেবী। কিন্তু শুধু কথাবার্তা।—আরে কিছু নয়? ফিরে এসে ঠেকে কথাবার্তা।'

'নিজের নামে।'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করে বল্লে, 'না, না, আর কিছু নেই কথাবার্তার পরে?'

'আর কিছুতে তলানি নেই।'

'মধুরতা তো আছে?'

পৌঁছে গেলে মধুরতা কোথায়? কখনো পৌঁছতে হয় না, সব সময় চলেছি মনে করে—রণপায়ে নয়—এমনিই সহজ পায় চলতে হয়। আজ নয়—আর একদিন—একটু একা বসবার সুবিধে হলে কার্তিক পৌষ মাসে আমার কথা ভেবে দেখবেন; সত্য বলেছি—এইসব বলতে চাচ্ছিলেন মণিকা;—কিন্তু বিরূপাক্ষকে ঠিক নয়—অন্য কাউকে।

'তলানি?' ভারি গলায় কেমন বিকৃতভাবে বললেন বিরূপাক্ষ।

'প্রথমে ভূমিকা দিয়ে শুরু। তারপরে পরিচয়ের সময়। পরিচয় ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। তখন কথা জমে।'

'সেটা হল তলানি? কাদের কথাবার্তার?'

'পুরুষদের মেয়েদের?'

'সুতীর্থের আর জয়তীর?'

'যে অন্যদের কথা ভাবে সে পরলোকে পুরস্কার পাবে, কিন্তু ইহকাল তো আমাদের নিজেদের নিয়ে; আমরা নেই?'

বলে মনে হল যেন বিরূপাক্ষের কয়েক হাজারের ঋণ শোধ হয়ে গেল তাঁর। মণিকা দেবী তিনি। তেতলায় থেকে দোতলায় নেমে বিরূপাক্ষের মতন একজন লোককে নিজের মুখে শীতরাতের পরম আশ্চর্য, নব ময়ূরী কথা ও মরালী রলরোল কথিকা শুনিয়েছেন তিনি। অবিশ্যি মুজরো দিয়ে শুনেছে বিরূপাক্ষ; সুতীর্থ এমনিই শুনেছে; বয়সে কথা আরো দুচারজনকে নিজেরই তাগিদে শুনিয়েছেন; কাজেই টাকার তাগিদে বিরূপাক্ষকে শোনাতে গিয়ে একটু তাল কেটে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কেমন বিলোড়িত হয়ে উঠেছে বিরূপাক্ষ। সে যেন ব্যাটারি খুইয়ে অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ কী যে অনির্বচনীয় ভোল্টেজে আলো বিদ্যুতের ভেতর জেগে উঠল। মানুষটার দিকে তাকিয়ে টের পেলেন মণিকা যে এর ভেতর আবছা অজগর মোচড় দিয়ে

উঠেছে। সেটাকে মুহূর্তেই পাটের দড়িতে বদলে ফেলতে ফেলতে মণিকা বললেন, 'আপনার তিনটে বাড়ির ট্রাষ্টি যদি আমাকে করতে চান তাহলে আমার জন্য একটা অফিস তৈরি করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায় হবে অফিস?'

'যেখানে চান আপনি—ধাকুড়িয়ার বাড়িতে।'

'বাড়িগুলো কি খালি?'

'না, দুটো ভাড়া দিয়েছে, আর একটায় আমি থাকি।'

'অ্যাটর্নিকে নিয়ে আসবেন তাহলে কাল?'

'নিশ্চয়ই। কিংবা আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। কিন্তু আজ?'

'আজ তো সময় নেই আইন আদালতের?' কেমন যেন নাক্ষত্রিক দূরত্বে মাটিকাদার মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে মণিকা বললেন, 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে খারাপ লাগল।'

মণিকা ধরা দিচ্ছেন না আর। চাঁদে চড়তে চড়তে মই পিছলে যেন পড়ে গেল বিরূপাক্ষ; 'আস্তে আস্তে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কেন, বাড়ি তিনটের ট্রষ্টি আমার স্ত্রীকে করলে ভালো হত?'

'সেটা বিচার করে দেখবেন। আমি অবিশ্যি এসব ভাবছিলুম না'। মণিকা থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীকে ভরণপোষণের বেশি খুব কিছু দিলেন বলে মনে হচ্ছে না। দিয়েছেন খুব বেশি কিছু?'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করেছিল, এতদিন সাধ্যসাধনা করে সে যা পারেনি সেই প্রত্যক্ষ নিজেরই অন্তিম মাধুর্যে বিরূপাক্ষকে ডাক দিয়েই ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মণিকা আবার। এই সব ট্রষ্টিফষ্টি টাকাকড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারায় ছিঁচকে কথা দিয়ে কী হবে। একেবারে বুকে হাত দিয়ে মোক্ষম কথা তো একটু আগেই পেড়েছিলেন মণিকা। তারপরেই ঘুষি বসিয়ে দিলেন বুকের ওপরে! বিরূপাক্ষ ঘামিয়ে উঠে কেমন যেন তলিয়ে যেতে যেত বললে, 'আমার পনের লাখ থেকে তাকে দেব কয়েক লাখ—'

'কয়েক লাখ!'

'কেন? কি?—'

'আমি ভাবছিলুম টাকাটা কি আপনার স্ত্রীর ভোগে লাগবে? না যার সঙ্গে—'

'যার সঙ্গে কেটে পড়েছে তার ভোগে? সে তো সুতীর্থ।'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল।

'হ্যাঁ। সতীনকাঁটা সেঁধিয়ে দিয়ে সতী বটে জয়তী; না হলে এ রকমভাবে আদায় করে নিতে পারে? ওর ঢের অপরাধ, তবুও আমি ভালোবাসি আমার স্ত্রীকে। ছাড়াছাড়ি হবে। লোকেরা বলাবলি করবে 'ডিভোর্স' 'লিগ্যাল সেপারেশন' যার যা মুখে আসে; ঐ জিনিসটাকে ভয় করছিলুম। যাক গে লোকের বলা—হেহে—কিন্তু ছাড়াছাড়ি তো হবে, এক সঙ্গে থাকবো না; কি করে দিন কাটাব ভাবছি; কেটে যাবে।'

বিরূপাক্ষ একটা বড়, অবসন্ন হাই তুলে বললে, 'যত বড় বোয়ালই হোক না কেন জয়তী, আমার মতন বঁড়শীর কেঁচোর কাছেও তাকে আসতে হয়েছিল— ভালবেসেছিলুম বলে।'

কয়েকটা বেপরোয়া বেশ বড় রকমের হাই ছাড়ল বিরূপাক্ষ; 'আ!—আ— আ! মা—মা!—মা!' বলে চারদিককার চাতাল কাঁপিয়ে ডুকরে উঠল কয়েকবার।

'ক লাখ দেবেন তাকে?'

'এখনো ঠিক করিনি কিছু। তবে সবচেয়ে শাঁসালো মুড়োটা নিজের বিয়োতি স্ত্রীর পাতে পড়া উচিত নয় কি—ন্যাজার দিকটা আর পাঁচ রকমের জন্যে?'

মণিকা সায় দিলেন কিংবা সেই ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন; বিরূপাক্ষের মনে হল হল মাথাটা কেমন মন কালো সোয়ানা খোঁপায় সাজিয়ে রেখেছেন মণিকা।

'বাকি টাকা কোথায় কোথায় দেবেন?'

'সেটা বুঝে দেখতে হবে।'

হাঁসমুর্গির ঘ্রাণে নিবিড় অন্ধকারের ভেতর শেয়ালের মতন, চিমসে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাতিটা নেবানো যায়?'

'না।'

'কেন?'

'আর একটু অপেক্ষা করুন।'

'কিসের জন্যে?'

'বেজেছে সাড়ে নটা। আপনার ঘুম পেয়েছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'না। আমি বলছিলুম—'

'চোখে লাগছে নাকি ?'

'আপনার লাগছে ভাবছিলুম।'

'না তো।'

'ঘরটাকে অন্ধকার রাখলে ভালো হত না ?'

'আমি এক্ষুনি উঠব। আচ্ছা উঠছি। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'না না, বসুন। দশটার সময়ে উপরে যাবেন বলেছিলেন।

'ওঃ' বিরূপাক্ষ বসলে, 'আপনাকে উইল দেখানো হয়নি; আলোয় আলোয় দেখিয়ে নিই।'

বিরূপাক্ষ ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল; মণিকা বললেন, 'কাকে কি দেবেন ভালো করে ঠিক করার আগেই উইল করছেন ?'

'এটা খসড়া।'

'এটা খসড়ার দরকার কি—অদল বদল যখন করতেই হবে ?'

'হ্যাঁ, আজকালই করব। আপনাকে চিনতাম না তো; দেখা হল, ভালো হল, উইলের সম্বন্ধে আমি অন্যরকমভাবে চিন্তা করছি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না আর।'

'কত টাকার উইল ?'

'পনের লাখ টাকার—পঁচিশ লাখও বলতে পারেন।'

'অত টাকার ব্যাপারে আমার ফোড়ন না কাটাই ভাল।'

'সে কথা যদি বলেন—' বিরূপাক্ষ বললে, 'এক বোতল সোডা আনিয়ে দিতে পারেন ? এখানে এক আধটা বোতল আছে ? সুতীর্থ রাখে না ?'

'না, ও রাখে না, সুতীর্থ খায় না কিছু। মুশকিল যা চাচ্ছেন তা আমাদের এখানে খেয়ে দেখেনি কেউ, রসদ নেই। এত রাতে আনিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। চাকরকে দিয়ে সোডা আনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অন্য জিনিসটা কোথায় পাবে সে। এ পাড়ায় কে রাখে এসব জিনিস।'

'কিন্তু আমার না হলে চলবে না।'

মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অন্তত বাতিটা নেবাতে হয়।'

মণিকা বসেছিলেন। এক্ষুনি বাতিটা নেবাতে গেল না বিরূপাক্ষ। বের করে ফেলে বললে, 'এই নিন—'

মণিকা বললেন, 'এবার ওপরে যাব।'

'হ্যাঁ আটকে রেখেছি অনেকক্ষণ— আমার নিজের দিকটাই দেখছি শুধু—কষ্ট দিলাম ঢের—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে দুএকটা টান মেরে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে প্রথমটাকে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কিন্তু ঘরে কোনো মানুষ নেই—একটা বোতল অব্দি নেই—এ রকমভাবে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'অভ্যেসকে চাবুক মেরে শেখাবার দরকার যাদের তারা তা করে। লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি, ও সব দরকার আপনার নেই।'

বিরূপাক্ষ উঠে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। মণিকা মনে মনে ভাবলেন, 'আমি এক্ষুনি উঠে যেতে পারি। কিন্তু বসে আছি তো। বিরূপাক্ষ যা ভাবে তা যে নয় সেটা বুঝিয়ে দেখার জন্য আলোয় নয়—এই অন্ধকারের ভেতরেই কিছুক্ষণ বসে থাকা দরকার আমার।'

'কটা বাজল?' বিরূপাক্ষ বললে।

'ঘড়ি দেখে বলতে হয়—'

'ঘড়ি হাতে?'

'আছে।'

'রেডিয়াম ডায়াল তো?'

'একবার অন্ধকার হয়ে পড়লে আমি আর ঘড়ি দেখি না।'

চমকিত হয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'দেখবার দরকারই বা কি?'

অন্ধকারের ভেতর, শীতের ভেতর মণিকা কোনো কথা বলতে গেলেন না আর। বিরূপাক্ষ বলছিল না কিছু।

মণিকা নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে বসে বললেন, 'এমন অন্ধকার যেন কোনোদিন দেখিনি আমি। মনে হয় অন্ধকার যেন বিরাজ করছে।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ। আস্তে আস্তে টানতে লাগল, মানুষটার চেয়ে বেশি আগুনটা, আগুনের চেয়ে বেশি মানুষটা জ্বলছিল যেন অন্ধকারের ভেতর। মণিকার থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা সোফায় বসে বিরূপাক্ষের মনে হচ্ছিল ব্যবধান রয়েছে;—কিন্তু থাকবে? মণিকার হাতে ঘড়ি আছে; অন্ধকারে—ঘড়ি দেখবার ছলে এগিয়ে যাওয়া যাবে; ঘড়ি দেখবার আগে কাঠিটা নিভে যাবে: আর একবার জ্বালাবার আগে সোফায় ওর পাশাপাশি বসা চলবে হয়তো—দেশলাই জ্বালাবার—ঝুঁকে পড়ে ঘড়ি দেখবার অজুহাতে?

মানুষ তো কুকুর নয়—দেবতাও নয়,—মানুষ ; অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের চুরুট জ্বলতে লাগল।

'সোডা চাই ?'

শুনে বিরূপাক্ষের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল—তামাশার—ঢের বেশি উত্তেজে, কিন্তু উত্তেজকে প্রশ্রয় দেবে না সে। যা আসছে তা স্বাভাবিকভাবে এলেই সবচেয়ে ভালো।

'সোডার কথা বলছিলেন আপনি'—মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, আছে বুঝি মজুদ অংশুদার ঘরে—ঐ সব বোতলও আছে ?'

'কোনো কিছুই নেই—সোডা চান তো বায়রনের সোডা আনিয়ে দিতে পারি—আমি তা হলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই।'

'আপনি ওপরে যাচ্ছেন ?'

'এখান থেকে চাকরকে ডাকাডাকি করা চলে না তো—'

'না, সোডার দরকার নেই আমার।' বিরূপাক্ষের পায়ের গুমরে জুতোটা মচমচিয়ে উঠলো। 'হুইস্কি তো পাব না। আপনিও চলে যাবেন। আমি তো সাধুবাবা নই, গোঁসাইও নই, ওরকম গোমসা অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকব কী করে ?'

মণিকা মনে মনে ভাবছিলেন : জানালা সব বন্ধ, ঘরটায় কোনো দিক দিয়েই আলো ঢোকে না। বড় রাস্তার গ্যাসের আলো এর ওর বাড়ির আলো সব দিক থেকেই বেগতিকভাবে নিজেকে রক্ষা করে অন্ধকারের ভেতর থুবড়ে খেয়ে পড়ে আছে। 'আমার নিজের সাদা হাত দেখা যাচ্ছে। আমার ফর্সা মুখ দেখছে হয়তো বিরূপাক্ষ—ওর চুরুটের আগুন দেখছি আমি—এ ছাড়া কি আর দেখা যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষ খুব তালেবর বটে, কিন্তু মণিকার সম্পর্কে কতদূর সেয়ানা হয়ে ওঠা সম্ভব তার ? না, বিরূপাক্ষের সংক্রান্ত কোনো কথা ভাবছিলেন না তিনি এখন আর ; কাল সারাটা রাত জেগেছেন মণিকা, আজ সারাদিন নাকে দমে খাটতে হয়েছে, শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল তাঁর প্রবলভাবে। বিরূপাক্ষের স্ত্রীর, সুতীর্থের নতুন খবরটা শুনে মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে, কথা ভাবতে ভাবতে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল—নিজে টের পাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন মণিকা, সোফার এক দিকে ধীরে ধীরে মাথা কাত হয়ে পড়ল তার ; থুতনিতে হাত লাগানো ছিল—হাতটা ঢিলে হয়ে বুকে পড়ে গেল।

বিরূপাক্ষের মনে হল—কেমন যেন এলিয়ে আছে শরীর, আর একটু নিজেকে মানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল মণিকার,—কি ভাবছেন মণিকা? সম্ভ্রম হারিয়ে ফেললেন? এই রকমই কি?

চুরুট শেষ হয়ে এসেছিল তার; আরো কিছু টানলেও হয়; কিন্তু টানতে গেল না, আলগোছে মেঝের ওপর ফেলে দিল, জুতো দিয়ে আগুনটা পিষে ফেলে বিরূপাক্ষ শুধাল—'আমি বলছিলুম—মিসেস মজুমদার—'

কোনো উত্তর এলো না।

'মণিকা দেবী?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু মানুষটা ঘুমোয়নি নিশ্চয়। এ সব মানুষ ঘুমোয় কি কখনও?

'একটা কথা আপনার সঙ্গে—' বর্ষারাতে পাড়াগাঁর খাটালে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি নিরেট নিঃসৃত চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বসে রইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

'উইলটা কি আপনাকে দিয়েছি?'

জবাব দিল না কেউ। ঘুমিয়েছে? এত সহজে এরকম অসাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে কখনও? আবেশে কিসের আবেশে—ডুবে আছে মণিকা: বিরূপাক্ষ ভাবছিল।

যেন কোনো আকস্মিক উত্তুরে বাতাসে বেতসতন্বী আত্মার আঘাতে তার সমস্ত স্থুল মাংসকালিমাকে ধুয়ে পাথলে উজ্জ্বল করতে গিয়ে বিরূপাক্ষ টের পেল অঙ্গার সে—রিরংসার আগুন ছাড়া আর কিছুতেই মুখ উজ্জ্বল হয় না তার।

'আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করবার মত মানুষ আমি নই। আশা করি মার্জনা করবেন। এর চেয়ে কি বেশি ভরসা করতে পারি আপনার কাছ থেকে—'

মণিকা যদি জেগে থাকতেন বিরূপাক্ষের এ সব কথা শুনে কি করতেন তিনি? কি বলতেন? বলা কঠিন। কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না; স্বীকারও করল না; এ সব নারীদের চেনে সে; নিরবচ্ছিন্ন ভান আর ভাঁড়ামোয় প্রায় কোনো পুরুষের কাছেই এরা শিং ভাঙে না, কিন্তু সে ব্যাটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মত হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।

মণিকাকে সে সবটা চেনে না—কিন্তু তবুও এতক্ষণ পাম্পের জলের তোড়ে তেতলায় চলে যাওয়া উচিত ছিল মণিকার। কিন্তু যখন তা করেনি, তখন

ছক কেটে কাজ করেছে—বিরূপাক্ষের সব টাকাটাই নেবে মণিকা—নেয় যদি মণিকাকেই দিয়ে দেবে সে: টাকাকড়ি জায়গাজমি ঘরদোর ; এ শীতে দেবে তো ; তারপর সামনের শীত ; এক আধ মাঘে পালাবে, বলে মনে হয় না, বেশ জাপটে ধরেছে শীতটা—কথা আর নয়, কথা ভাবা নয় আর, এখন কাজ করার সময় বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষ উঠে মণিকার পাশাপাশি সোফায় গিয়ে বসল। এখুনি মণিকার গায়ের ওপর হাত দিতে ভরসা হল না তার। কিন্তু অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের মনে হল খানিকটা গা ঘেঁষেই যেন বসা হয়েছে- ভারি একটা সুন্দর দামী শাড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছিল। শাড়ি ঘেঁসে বসেছে সে—এই শাড়ির ফাঁসে যে মানুষ আছে তারই রূপে বাসে বাসমতী যেন এই শাড়ি।

বিরূপাক্ষ টের পেল মণিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের কাতরতায় অন্ধভাবে অন্ধকারের ভেতর কালো কালো কড়ির মত মাথা খোঁপা—ঠাণ্ডা শক্ত—জবাকুসুমের গন্ধ—বিরূপাক্ষের কাঁধে এসে ঠেকল।

কি করবে বিরূপাক্ষ? মণিকাকে জাগিয়ে দেবে? কেন জাগাতে যাবে? জাগাতে তো হবে এক সময়।

আপাততঃ এই অনির্বচন ভূমিকার ভেতর নিমগ্ন হয়ে রইল সে। এর পর অন্য রকম সময় আসবে ; কিন্তু তার জন্যে সমস্ত রাতটাই তো পড়ে আছে। এমনই নিবিষ্ট হয়ে রইল যে শীতের রাতে তার বুকের ওপর ছড়ানো শালের অনুভূতির নিস্তব্ধতার ও খানিকটা ব্যবধানে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে নিয়ে কি করা যায় এই নিদারুণ মাথা ঘামানো—অশক্তি ও অসাড়তার আবেশে অসংখ্য রাতের ভূমিকা হিসেবে এ রাতটাকে গ্রহণ করে কেমন যেন কুঁড়েমির ভেতর তলিয়ে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না সে।

উনিশ

রাত একটা বেজে গেছে। নিচের দরজা খোলা ছিল। নিচের ভাড়াটেদের দুজন চাকর সিনেমা না কোথায় থেকে ফিরে রোয়াকে বসে সিগারেট টানছিল, সুতীর্থকে দেখে একেবারে তাজ্জব মেরে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল তারা।

সুতীর্থ দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপ পৌঁছে দেখল যে কোলাপসিবল গেটে

তালা মারা নেই—খোলা আছে। এত রাত অব্দি ঘরদোর খোলা পড়ে থাকে সব? দিন পনেরো সে তার এ ফ্ল্যাটে ফেরেনি; ফিরে হয়তো দেখবে খাটখানা ছাড়া আর কিছু নেই; অবিশ্যি মণিকা দেবী আছেন, তিনি একটা ব্যবস্থা হয়তো করে রাখতেও পারেন।

সুতীর্থের পায়ে জুতো ছিল না, চান করেনি তিনদিন, পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা, রক্ত মাখানো। মারপিট সে অবিশ্যি করেনি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় এ ছাড়া আর কিছুই করেনি সে, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক রাত ধরে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেছে।

সুতীর্থ প্রায় বেড়াল পায়ের নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার ঘর শূন্য নয়, শূন্য তো নয়ই বেশ সরগরম। দুজন মানুষ পাশাপাশি এক সোফায়ই বসে আছে—ঘুমিয়েই আছে হয়তো—কিংবা আমেজে আড়ষ্ট হয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে আছে। এমন শীতের রাতে কতখানি আবেগের দুধ মেরে মেরে সর করতে পারলে—উতবোল রক্তকে খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে অবশেষে শান্ত করে নিতে পারলে মানুষ এমন অদ্ভুত নিঃঝুম হয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সোফার ওপর!

ঘরের ভেতর ঢুকতে গেল না সুতীর্থ; তার ঘরে অপরের নীড় নিজে সে বীতনীড় আজ। অন্ধকারের ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে সুতীর্থ অনুভব করল টেবিল চেয়ার বাক্স বিছানা সবই ঠিক জায়গায় রয়েছে। নতুন ভাড়াটে কেউ আসেনি।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকেই সে বুঝতে পারল মণিকা দেবীর মাথা ঘুমে না কিসের তাড়সে এসে পড়েছে। পুরুষটির বুকের ওপর প্রায়—কার হাত কার হাতে মিশে গেছে—কোন আঙুলের সঙ্গে মিশে গেছে নারীটির শাড়ির ভাঁজ, নারীটির চুলের সঙ্গে পুরুষের শালের জরি: কে তার হিসেব করবে। মণিকা এখানে এরকম অবস্থায় এত রাতে? সুতীর্থের অনেকদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো এই ঘরটাকে তার নিজের কাজে ব্যবহার করবার জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তিনি। বেশি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধ বোধ করল না তবুও সুতীর্থ। কিন্তু তবুও মনের ভেতর কেমন একটা কৌতুকের সুড়সুড়ি এসে পড়লেও হাসতে পারছিল না, আজ রাতে সুতীর্থও মণিকাকে লক্ষ্য করেই এখানে এসেছে—এত রাতে পায়ে হেঁটে সেই চেতলা থেকে। দশটার আগেই এসে পৌঁছবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে দেরি হয়ে গেল।

মণিকাকে আজ রাতে সুতীর্থও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে চেয়েছিল বটে; কিন্তু ঠিক এরকমভাবে চায়নি। কিংবা এরকমভাবে পেলেও মন্দ হত কি? কিন্তু কে এই লোকটা সুতীর্থের ইচ্ছাস্বর্গের অপরিসর ধোঁয়া কেটে ফেলে নিজের সপরিসর বস্তুস্বর্গ রচনা করে বসেছে এমন রাতে—এমন পাপরিক্ত অতল অনিমেষ শীতের রাতে। মানুষটাকে দেখে ফিরে এসে সুতীর্থ স্তম্ভিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। বিরূপাক্ষের মুখ থেকে লাল ঝরে পড়ছে মণিকার ব্লাউজের ওপর। কেউ কাউকেই টের পাচ্ছে না, কিছুই টের পাচ্ছে না, দুজনেই ঘুমে কাঠ হয়ে আছে।

দোতলার বারান্দা থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। আকাশ ভর্তি আগুনের গুঁড়ির মত নক্ষত্ররাজ্যের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে—ফাঁকা জায়গা থেকে ভেসে আসা খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া পান করে নিল সুতীর্থ।

ঘুমিয়ে আছে বটে—এমনি নিঃস্পন্দ ঘুম যে সুতীর্থ চেঁচালেও জেগে উঠবে না ওরা। কিন্তু এ ঘুম তো একটা অতল উপসংহার—এর আগে যে আশ্চর্য অগম অভিনয় হয়ে গেছে কি খোঁজ রাখে সুতীর্থ সে সবের? কিন্তু বিরূপাক্ষকে নিয়ে? মণিকার মতন একজন? পুলিসের হাতে হতভাগা সেবকদের মরে যেতে দেখেও শরীর ও অন্তঃশীল মন বোধ এরকম উৎখাত হয়ে মোচড় দিয়ে ওঠেনি কোনোদিন বুঝি তার। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, ঘরের ভেতর ঢুকল সে আবার; লাইট জেলে দিল; বিরূপাক্ষই তো; চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে, কেমন চোয়াড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও লালা ঝরে গেছে—ফুরিয়ে গেছে—শুকিয়ে গেছে; মুখের ভেতর যে কেমন একটা সুধীর সুস্থির জীবনবেদই যেন ফুটে বেরুচ্ছে ওর। এ দুঃসাধ্য জিনিস বিরূপাক্ষ কোথায় পেল যদি মণিকা ওকে দিয়ে থাকে।

মণিকার দিকে ফিরে তাকাল সুতীর্থ। ভাবতে ভাবতে মনে হল অতি বিষম অঘটন ঘটে যাবে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে: বিরূপাক্ষের লাস লুটিয়ে থাকবে এই মেয়েমানুষটির পায়ের নিচে, আর নিজের বিছানায় কি নিদারুণ রিরংসার আলিঙ্গনের ভেতর খুঁজে পাবে না সে মণিকাকে ও নিজেকে কি ভীষণ মৃত্যুর নাগপাশের ভেতর শেষ হয়ে যাবে সব।

কিন্তু মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই ভালো; হিংসা করে কি আর হবে; যে যাতে সান্ত্বনা পায় তাই পেতে থাকুক; মজুমদার দেবীকে অবিচার করে কোনো লাভ নেই। বাতিটা নিভিয়ে দিল সে।

বারান্দায় পায়চারি করছিল সুতীর্থ : ভাড়ার টাকা দিইনি, ঘর আটকে রেখেছি, সেলামী বন্ধ করেছি। বিরূপাক্ষ অনেক দিয়েছে নিশ্চয় ; সবই বিকিয়ে দিয়েছে হয়তো ; কেন নেবে না মণিকা।

যেন বিরূপাক্ষ মণিকার জীবনে নেই, বিরূপাক্ষের টাকা মণিকা গ্রহণ করেনি, কোনোরকম রাত্রিবাস হয়নি বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার—ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ তার টালমারা বইয়ের ঘর ভেতর ঢুকল। এ, ঘরটা তার বসবার, শোবার ঘরের চেয়ে অনেক দূরে ; এখানে কোনো খাট ছিল না ; অন্ধকারে আরসোলা ইন্দুরের আনাগোনার ভেতর খানিকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। আজ তারো খুব ঘুম পেয়েছে—গত সাত-আট রাত সে ঘুমোতেই পারেনি।

এমন নিখাদ নিঃস্বপ্ন ঘুম অনেকদিন ঘুমোয়নি মনিকা। রাত দশটার পর থেকেই তার স্বামীকে পরিচর্যা করতে হয়। সারা রাতের মধ্যে ঘুম হয়েই ওঠে না। দিনের বেলা একটানা ঘুমের বাধা অনেক—সব কিছু দেখবার শোনবার তত্ত্বাবধান করবার মানুষ বাড়ির ভেতর সে-ই তো একা। আজ বিরূপাক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল। ঘুম তাকে অতর্কিত আক্রান্ত কবেছিল! অতর্কিত, কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘুম, সমস্ত দিনের অত পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর ঘুম না এসে পারে না। এ জন্যে বিরূপাক্ষ দায়ী নয় ; বিরূপাক্ষের কথাবার্তার অসারতায় ঘুম যে না পায় তা নয়, কিন্তু জেগেও থাকতে পারা যায়—কিন্তু কেমন একটা হ্যাঁচকা ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠল তাব ; তারপর কী হল কিছুই মনে নেই। এরকম ঘুম আগেও সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব পরিবেশে বিরূপাক্ষের মত কোনো মানুষ কোনোদিন বর্তমান থাকেনি। মণিকা হঠাৎ যখন ঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। সে স্থিরই করতে পারল না কোথায় সে রয়েছে—এরকম গভীর নিঃসাড় অন্ধকারের মানেই বুঝে উঠতে পারল না। তেতলায় তাদের ঘরে সারারাত সবুজ শেডের নিচে একটা খুবই মৃদুশক্তি শান্ত বাতি জ্বেলে—ঘরটাকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করে মিহি মৃদু জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থাকে সারারাত। কিন্তু এখানে সে জ্যোৎস্না নেই তো ; এ তো মুখে চোখে শরীর অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাক, সর্পের ঝাঁক কালো কালো রাশি রাশি বেড়ালের ছোটাছুটির মত অন্ধকার।

সে তার নিজের ঘরে নেই—অন্য কোথাও আছে—কোথায়? কোনো

নেমন্তন্ন বাড়িতে, না কোনো দূর আত্মীয়ের রোগশয্যার পাশে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে? নাকি এটা হাসপাতাল—কোনো অঘটন ঘটেছে তার? স্ট্রেচারে করে এখানে এনেছে তাকে সবাই মিলে? মণিকার চেতনা এত বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে পর পর সব কিছু বুঝে নিতে কিছুটা সময় লাগল তার জেগে উঠে অনেকক্ষণ পরে তার কাছে একজন মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল মণিকা। এমন কি প্রথমে সে বিরূপাক্ষকে মনে করেছিল সুতীর্থ বুঝি—শালটা ভালো করে জড়িয়ে দিল তার গায়ে—চুলের ওপর হাত বুলোতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল—এ তো সুতীর্থ নয়। আগাগোড়া ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল তার কাছে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ কখন এসে সোফায় তার পাশে বসেছে? মণিকা তো ওকে বসতে বলেনি। গা ঘেঁষে বসেছে, ব্লাউজটা যে একদিক দিয়ে ভিজে গিয়েছে সে কি ঘামে না ওর মুখের ঝরানিতে?

ঘামেনি তো মণিকা—এত বেশি শীতের রাতে কি করে ঘামবে? মণিকার মন রি রি রি রি করে উঠল।—কিন্তু তবুও নিজেকে ধিক্কৃত করল না সে—বিরূপাক্ষকেও না। এমন অনেক কিছুই ঘটে থাকে পৃথিবীতে যার জন্য আমাদের তোলা সংসার-সমাজের মধ্যে একটা বিরাট ভূমিবিপ্লব হয়ে গেল বলে মনে হয়—ধসে গেছে পৃথিবীর মাটি যেন পায়ের নিচে থেকে; কিন্তু ভূমিকম্পটা কি মানুষ ইচ্ছে করে করে। কিন্তু তবুও কেউ কাতরে পড়ে ভূমিকম্পে—বিশেষত, যাতে দোলা লাগে, কিন্তু চাপা পড়তে হয় না? ভাবছিল মণিকা।

দশটা থেকে দুটো অব্দি আমি বেহুঁশের মত ঘুমিয়েছিলুম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখে বিরূপাক্ষ হয়তো মনে করেছিল আমার কাছে এসে বসা চলে। বসেছে তাই। কিংবা কে জানে ঘুমিয়ে পড়েছি বলেই এসেছে। জাগা মানুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, তার ঘুমন্ত শরীরের কাছে আবেদন করে তা পাওয়া যায় ভেবেছিল? ভেজা ব্লাউজটা শীতের ভেতরে বড় ঠাণ্ডা লাগছিল মণিকার; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল তার।

মণিকা ভাবছিল; পাওয়া যায় হয়তো; কিন্তু একজন ঘুমোনো মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ে উঠে যায়, ইঁদুর চলে যায়, মাছি ওড়ে, মানুষ সেখানে হাত দিলে সে মানুষ মাছি আর পিঁপড়ে। কে জানে বিরূপাক্ষ কি করেছে।

মণিকা ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে দেখল অমলা অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অংশু টানে কষ্ট পাচ্ছেন।

'কোথায় ছিলে তুমি মণিকা এতক্ষণ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এমন তো ঘুমিয়ে পড় না কোনোদিন।'

'তুমি কখন জেগে উঠেছ?'

'অনেকক্ষণ—অনেক—'

'আমাকে খুঁজেছিলে বুঝি।

'হ্যাঁ। অমলাকে ডাকলুম, কিন্তু সে কোনো সাড়া দিলে না। ভাবলুম, যাক গে, আমার তো বাঁধা এ জিনিস, কে কি করবে এর, মাঝখান থেকে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। কোথায় ছিলে তুমি মণিকা?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

'কোথায়?'

'নিচে।'

'দোতলায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেই সুতীর্থ ছোকরা কি আজো ফেরেনি?'

'না।

'ওকে তুমি এত টান কেন।'

'কই, না তো। তার ঘরদোর খোলা রেখে গেছে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি? হে-হে-হে—'

হা হা—হা হা করে হেসে উঠল অংশুবাবু: কপাল নাক চোখের চারদিকের ঢিলে মাংস বার বার কুঁচকে উঠতে লাগল তার।

'আমাদেরও সময় ছিল মণিকা; আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে-টেখে আসতুম। সে সব দিন কোথায় গেল?'

পর পর গোটা তিনেক বালিশ সাজিয়ে বুকে করে বসে আছে লোকটা। জানালা দিয়ে কলকাতার রাতের কালো ফর্সা ডোরাকাটা আদিম টিকটিকির ঝলমলামির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললে, 'কি চাও তুমি বলো তো?'

'আমি? কেন?'

'দরকার আছে।' মুখে কিসের যেন জড় মরছে না—মণিকার দিকে তাকাল অংশুবাবু।

'যা চেয়েছি, তা তো পেয়েছি।'

'ও সব ঠোঁটনাড়া মোচুষকির কথা আমি শুনতে চাই না।'

'তার মানে? কি বলছ তুমি?'

'মানে, খোলাখুলি কথা বলতে হবে।'

'সব সময়ই তাই বলি আমি।'

'আমি আর বেশি দিন বাঁচব না—মরবার আগে তোমার নিজের মন—যে মনটা দশ বাঁও জলের নিচে লুকিয়ে থেকে তোমার নিজেরই সত্য মন—তাকে আমি দেখে যেতে চাই। আমাকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবে কেন তুমি?'

'আমি ঠকাচ্ছি বুঝি?'

'হাঁপানি রুগীর অন্তিমকাল এলে কে না ঠকায় তাকে?'

'তাই যদি হয় কি আর করবে তুমি?'—মণিকা টেবিল থেকে একটা কাঁচের গেলাস তুলে সোরাইয়ের থেকে জল গড়িয়ে খেতে লাগল।

শরীর ঠাণ্ডা হল তার, বললে, 'আমার ইচ্ছে সুতীর্থ তার নিজের ঘরে ফিরে আসুক।'

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'জানি না।'

'ফিরে আসবে কেন?'

'ওর জীবনটাকে নিয়মের ভেতর আনা দরকার। শুনলুম ধর্মঘট করছে—করুক, যদি দরকার হয়। শুনেছি আর একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে কম বুঝি তা হচ্ছে মিছেমিছি এ-পথে সে-পথে—কোনো স্ট্রাইক নয়, কারুর স্ত্রীর ব্যাপার নয়—এমনি কলকাতার গলিঘুঁজি রাস্তা বাগানে ঘুরে বেড়ানো। ও ঘুরে বেড়ায়।'

'কে সেই ভদ্রলোক, যার স্ত্রীর সঙ্গে—'

'সে ভদ্রলোক অংশুবাবু ছাড়া আর কে'—বললে মণিকা, গলার আওয়াজে স্নেহ ও হাসির বিন্দু বিন্দু খামির ছড়িয়ে আন্তরিকতারও:—অতএব খানিকটা আশ্বাস অনুভব করতে দিয়ে অংশুবাবুকে; ঘরের ভেতরে কেমন একটা গ্রহণ-

তিথি-উত্তীর্ণ গ্রাসমুক্ত চাঁদের মত হেঁটে বেড়াচ্ছিল মণিকা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অংশু : তেপয়ের থেকে ছোট শিশিটা তুলে নিয়ে মণিকা বললে, 'এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছ দেখছি এক্ষিড্রিন : একটা আস্ত বড়িই খেয়ে ফেললে—'

কোনো জবাব দিল না অংশুবাবু।

'আমি বলেছিলুম তো তোমাকে আধখানা করে খাবে।'

মণিকার সাধু মননে ও সত্যার্থে আশ্বাস—আরো খানিকটা আশ্বাস বেড়ে গেল অংশুবাবুর ? না, তা একই জায়গায় রয়েছে, তার কোনো বাড়া কমা নেই ? গান্ধীর কাছে মণিকা হয়তো সাধু ও তার স্রষ্টার কাছে সত্য ; কিন্তু ওরকম প্রেম ও ক্ষমায় জ্ঞানী হলে মানুষের ক্লান্তির অতীত হতে পারত অংশুবাবু ; তা হতে পারেনি। তবুও খানিকটা ভালো লাগছিল, কেমন বিষণ্ণতা বিলাসে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মণিকার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতি সময় ও নারী যদি এ সবের প্রতীক হয়—সকলেরই অন্তর্ভেদী এই মূর্তি। কিন্তু এসব দেখে অভ্যস্ত বলেই হোক, কিংবা নিজেকে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছে সেই জন্যেই হোক, মণিকা অংশুবাবুর বিছানার পাশে বসে ধীরে ধীরে তার পিঠ বুলিয়ে দিতে লাগল, পিঠের আড়ালে মুখ নুইয়ে রেখে উপলব্ধির নদীর ভেতর ছিটেফোঁটা ঢিল ছুঁড়তে লাগল সে—হাসির, পরিহাসের, নৈরাজ্যের সহানুভূতির, সংকল্পের, ব্যথা মহত্ত্ব ও ক্ষমার কেমন একটা যোগনিদ্রায় যেন—সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে যেন।

অংশুবাবু অনর্গল বকে যেতে লাগলেন আবার—

'মিছেমিছি কথা বলছ কেন ?' মণিকা শাসাল তার স্বামীকে, 'কথা বললেই তো শ্লেষ্মা ওঠে তোমার, কাশির ধকল বেড়ে যায়।'

'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়। টাকা আজকাল সবারই হাতে। যাদের নেই তাদেরও পেতে হবে। কে মাথা ঠিক রাখবে।'

'তোমাকে ওষুধ দেব ?'

'সুতীর্থ ফিরেছে ?'

'না।'

'কদিন হল ?'

'দিন পনেরো।'

'আজো ফিরল না? তবে এই রাত দুটো অব্দি নিচে কোথায় ঘুমিয়েছিলে তুমি?'

'ওর ঘরে।'

'খালি ঘরে একা ঘুমোবার কি মানে হতে পারে বুঝি না আমি। ও ভাড়া দিয়েছে?'

'না, দেবে হয়তো শীগগিরই।'

'ক' মাসের বাকি?'

'আমি হিসেব করে বলছি—ছ' মাসের অন্তত।'

মণিকা বিছানার কিনার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে, ঘুমন্ত অমলার চুলের ওপর হাত বুলিয়ে, অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভেব না তুমি, ও বিপদে পড়েছে। টাকা দিয়ে দেবে।'

'নিচে কার গলা শুনছিলুম?' অংশুবাবু তার সুন্দর অথচ কিছুটা বেখাপ্পা কটা চোখ তুলে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল।

'কখন?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা অব্দি।'

'ও—বিরূপাক্ষের।'

'বিরূপাক্ষ কে?'

'সুতীর্থের চেনা লোক—তার খোঁজে এসেছিল।'

'এত রাত অব্দি ছিল কেন?'

এরকম প্রশ্নের কয়েক রকম জবাবের মধ্যে কোনটা বেছে নেবে। আন্দাজ করতে করতে মণিকা বিছানায় গিয়ে বসল আবার। অংশুবাবুর মনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল যে ভুল বুঝবার সুযোগ মণিকার কথায় যে-কোনো রকম মার-প্যাঁচের ভেতর থেকেই বের করে নেবে। ঠিক এই জন্যেই নয়—এমনিই সত্যি কথাটা বলে দিতে চাইল মণিকা—সহজভাবে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত অংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হিং টিং ছট ছড়িয়ে দিয়ে বল্লে 'ভদ্রলোক আজ আসাম মেলে এসেছেন।'

'ওঃ, আমি ভেবেছিলুম বাঙালী।'

'তা বাংলা কথা বলতে পারেন।'

'সে যাক গে। তারপর?'

'এসে কোথায় এক হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে সুবিধে হল না,

তাই সুতীর্থের এখানে এসেছিলেন ; এসে পেলেনও না, আমি ছিলুম তখন দোতলায়। সুতীর্থের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্তেও অনেক দরকার ছিল ওর—সমস্ত শুনে বুঝে নিতে হল। সুতীর্থ ফিরে এলে তাকে জানাতে হবে সব।'

'ভদ্রলোক চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময়?'

'এই দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ—'

'কোথায় গেলেন?'

'বড়লোক মানুষ গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় গেলেন আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করিনি।'

'সুতীর্থ তোমার কে জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।'

'এমনই থাজা আহাম্মক? এই মাথা নিয়ে ব্যবসা করে ও।' অংশুবাবু হঠাৎ একটা সুন্দর ভিন জঙ্গলের বাঘিনীকে দেখে বুড়ো দক্ষিণ রায়ের মত চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাল। মণিকার কথা কতদূর বিশ্বাস করেছে অংশুবাবু বুঝতে পারা গেল না। করেছে হয়তো পুরোপুরিই বিশ্বাস মনের ভেতর একটা তেতো ঝাঁঝ—আর্সনিকের মত—যতই মিইয়ে আসতে লাগল অংশুবাবুর ততই ঝিমিয়ে পড়তে লাগল সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অংশুর পাশেই দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল মণিকা। পৃথিবীটা কি এমন হতে পারত না যে, ভালো মনে করে যে কাজ করে যে কথা বলে তেমনি শুদ্ধচিত্তেই অন্যকে তা জানানো যায়? মণিকা একজন নিবিড় নিশীথকণ্ঠী স্বর্গীয় পাখির মত নিমেষনিহত হয়ে ভাবছিল যে তাই যদি হত, তা হলে কি এ ঘরে থাকবার প্রয়োজন হত তার—কিংবা এই নগরীতে—এই পৃথিবীতে—এই গ্রহে? মহাশূন্যের অন্ধকারের ভেতর দূর আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্য পেরিয়ে অপর কোনো আলো ঋতুর দেশে হয়তো চলে যেতে হত তাকে। বাইরে গিয়ে আকণ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাস পান করবার ইচ্ছে হল তার—এই শীতের রাতেও। মাঘঋতুর শিশির পাখলানো নক্ষত্রতন্বী নিস্তব্ধ আকাশটাকে দেখে আসবার সাধ জেগে উঠল।

'ওঠো ওঠো মণিকা, এসো, কত কোটি কোটি তারা জ্বলছে, দেখ এসে : কত সাদা কালো কমলা ডানার লাল নীল ঠোঁটের পাখিরা যেন বাইরের শূন্যে

শূন্যে পাখনার ঝাপটায় বলছে তাকে: এখনই সব মাঘ শেষের ফাল্গুনের বাতাস ফুর ফুর উড়ু উড়ু করে ঢুকে পড়তে লাগল ঘরের ভেতর। কিন্তু তৎক্ষণাৎই নিচের—মাটির সংসারগ্রন্থিতে ফিরে আসতে হল তাকে; অংশুবাবু শীগগিরই মরে যাবে, মেয়েটার রূপ থাকলেও সে উৎরোবে না, এ বাড়িটা মর্টগেজে বাঁধা আর একজন লোলুপ মাড়োয়ারী কালোবাজারীর কাছে (বিরূপাক্ষ তাকে চেনেও না); সুতীর্থের দায়িত্ব সুতীর্থের নিজের চেতনা প্রেরণার কাছে শুধু: সেগুলোকে সে জ্যামিতি ট্যামিতির মতন অব্যর্থ মনে করে। কিন্তু জ্যামিতি নিজেই ছিল; মানুষ হাতড়ে পেয়েছে তাকে; মানুষ দুর্বল, জ্যামিতি অব্যর্থ। এটাই বোঝে না সুতীর্থ?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার সবচেয়ে বড় ফাঁড়া আজ রাতেই কেটে গেছে আশা করা যায়। বিরূপাক্ষ ঘুমিয়েছিল। তার ব্যাগের ভেতর তার উইলের খসড়া সেদিনকার চেক ও টাকা সব ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে মণিকা। বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করে না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে। যদি বুঝতে পারা যেত ও সত্যিই ঘোড়েল, ওর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই, তাহলে মণিকা কি ওর জন্যে এত কটা রাত খরচ করত? ওকে দেখা মাত্র বিদায় করে দিত, না হলে হয়রানি বেড়ে যেত,—এর চেয়ে ঢের বেশি হয়রানি।

অংশুবাবু হঠাৎ জেগে উঠল কেমন জ্বলজ্বলন্ত দুটো কটা চোখ মেলে, গির জঙ্গলে চিতে বাঘ জেগে উঠেছে যেন দিনের আলোয় দিনের আলোর ঘুম থেকে যেন: মনে হচ্ছিল মণিকার বেশি শীতের অন্ধকারের ভেতর বসে থেকে।

‘কোথায় তুমি?’

‘এই তো আমি—তোমার কাছেই।’

হ্যাঁ। মণিকাকে সাপ-বেজীর ভেল্কিতে নামিয়েই ছাড়ত তাহলে বিরূপাক্ষ। কিন্তু বিরূপাক্ষ সে জাতের মানুষ ঠিক নয়; শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি নিজের চাওয়া জিনিসকে অধিকার না করে ও-ও ছাড়তে চায় না। কিন্তু আমি জাত-বেজী হই না হই ও জাত-সাপও নয়—অন্তত আমার সম্পর্কে সে সব কিছু হবারই ক্ষমতা যে ওর নেই—সেটা বুঝেই ঠুঁটো বাস্তুসাপের মত ওকে আসতে দেখে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। ও যদি চায় ওর জন্য আরো কয়েকটা রাত খরচ করতে রাজি আছি আমি; কিন্তু আলো নেভাবার কোনো অধিকার থাকবে না, রাত

দশটার পরে বসে থাকবার কোনো তাগিদ থাকবে না কারু। এ বাড়িটা যেন কেমন ছমছম করে। আমার একজন নিতান্ত শুকমুখী ও মোটামুটি নিরীহ ভাবকের সঙ্গে প্রথম রাতটা আড্ডা মেরে নিলে মন্দ লাগবে না। লোকসমাজে বেরুলে অবিশ্যি অনেক পারিষদ উপাসক জুটে যায়; আরো কত কি। কিন্তু বাইরের বড় সমাজের ঘেঁষাঘেঁষিতে বেরুবার রেওয়াজ তাদের বংশে নেই, অংশুবাবুর বংশেও না। যারা দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে তাদের সঙ্গেই কারবার করতে হয়। এখানে কৃতিত্বের অভাব হয় তো—যদি না একটি বালুকণার ভেতর ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা লুকিয়ে থাকে। থাকে নাকি?

‘কোথায়! কোথায়!!’ বাজপাখি যেন চিতেবাঘকে মেরে ফেলছে এমনই একটা অদ্ভুত বিকট চীৎকার করে উঠল অংশু।

‘এই তো আমি তোমার কাছেই আছি।’

মণিকা উঠে বসল। অংশুবাবু একটু ঝিমিয়ে পড়লে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল সে।

মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি পনেরো বছর আগে এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল মণিকার। কিন্তু তাকে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল মণিকা; সে ঘরে একটা চাবুক ছিল বিভূতি রায়ের; সেই চাবুক মুখের ওপর কষেছিল মুখার্জির। ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এখন মানুষকে হাসিমুখে মিষ্টি সরুচাকলি খাইয়ে মানে মানে বিদায় করে দেওয়াটাই ঠিক মনে করে মণিকা। কেননা মানুষ সব—শেষ পর্যন্ত; মানুষ; মানুষ—; ভাবনা বেদনা আছে; মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করলেই সবচেয়ে ভালো।

কুড়ি

সুতীর্থ ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রায় গোটা দশেকের সময়। তাকে বুঝে নিতে হল কোথায় সে আছে। কালকে রাতে কি হয়েছিল জেগে উঠেও সহসা সে সব কথা মনে পড়েনি তার; আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে এল;—একে একে সব পরিষ্কার; বিচারবোধ ফিরে এল। কিন্তু এজন্য মনে খুব বেশি খোঁচা লাগছিল না তার। সমস্ত শরীরটা কেমন একটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছিল। দিন পনেরো ধরে নানারকম অত্যাচার চলেছে শরীরের ওপর; কালকের দিনটা

সব চেয়ে বেশি হাঙ্গামার ভেতর কেটেছে ; তারপরে অনেক রাতে এসে এই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছে। খুব ভালো করে চান করে নিতে হবে—বেশ করে তেল মেখে—না হয় সাবান রগড়ে।

সুতীর্থ আস্তে আস্তে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। এ ঘরটা গোছানো ঝকঝক তকতক করছে। মিসেস মজুমদারই করেছে সব। একটা নতুন তেপয় এসেছে—একটা নরম কুশনে আঁটা বড় ইজিচেয়ার, নতুন একটা আতরদান, ওয়াল ক্লক, ক্যালেণ্ডার দুটো মাত্র, কিন্তু খুব বড় এবং বড জাতের, এদের আভিজাত্যের দিকে তাকালে বেশ লাগে মোটামুটি ; দুটো সোফাই বেশ কোলভরা, ঘরজোড়া নতুন বৌয়ের মত—পরিপাটি, দুটোই আনকোরা।

বিরূপাক্ষের জন্যেই কি এত সব। সুতীর্থের মন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মণিকাকে—এতদিনেও যদি সে না চিনে থাকে তাহলে কবে চিনবে আর ? এক-একটা বড় ফ্যাক্টরিতে দেখেছে সে যে চাকার ভেতর কত যে চাকা খাঁজ নাট কাজ করে যাচ্ছে, সমস্ত মেশিনটা কেমন সহজে স্বাভাবিকতায় নড়ছে ঘুরছে :—মেশিনের সম্পূর্ণতাকে ধ্যান করা যাক—একটা বিসদৃশ খাঁজের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে ? সুতীর্থকে সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মহিলার—মণিকার।

মণিকাকে চেনেনি কি সে ? না যদি তার সম্পূর্ণ নারী সত্যার্থকে উপলব্ধি করে থাকে সুতীর্থ তাহলে কার অপরাধ ?—মণিকার ?—না সুতীর্থের নিজের যুক্তি ও ধ্যানের ?

ঘরের ভেতর মাঝ মাঘের সকালের আশ্চর্য রোদের চুমকি এসে পড়েছে বড় রোদের সঙ্গে সঙ্গে—দেয়ালে জানালায় মেঝের মোজেয়িকে স্বস্তিকা আল্পনায়—উড়ু উড়ু উড়ুক্কু সব চিল চড়াই শালিখের পায়রার পাখনায়। পুবের দিকে প্রকাণ্ড দুটো জানালা খোলা : তাকালেই সূর্যকে দেখা যায়—যদিও সে দূর দক্ষিণাশ্রয়ী এখন ; কোনো উজ্জ্বল অনুভূতির মত সূর্য ঐ মানুষের সময় ও ইতিহাসবৃত্তান্তের সারাৎসার আলোকশীর্ষের মত ; যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে—যারা আগুন—যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মত স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিবিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মত দীনাত্মা—মানবসত্তার সেই সব আত্মার মত সূর্য ঐ। কাটা সুতোর অবিরল এলোমেলো পাঁজের মত নদী চলেছে—সেই নদীর জলের ভেতর থেকে মাঘের দুপুরে রাজহাঁস যেমন করে তাকায় তেমনি করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় সূর্যকে—কিংবা আদি মানবের মত—

কিংবা নিঃস্বত্ব, বিশুদ্ধ করে নিতে পারে যদি আজকের মানব নিজেকে তাহলে তার গভীর বোধিশক্তির দৃষ্টি নিয়ে সূর্যের দিকে—সূর্যের ইঙ্গিতের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সুতীর্থ যে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে টের পেয়েছে ঐ সুদূর সূর্য। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণশক্তির নিবিড় পানিপীড়ন বোধ করেছে সুতীর্থ—চারদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে—কন্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে। একি প্রকৃতির শক্তি না সূর্য দেবী নিজে? সুতীর্থের সমস্ত শরীরকে ঝিমানো বাঘের মত পড়ে আছে দেখে দাউ দাউ করে উঠছে, ঝর্ঝরে ঝাউবনানীর মত আলোর চারদিকে পৃথিবীর প্রথম বাঘিনীর দুর্বার স্নিগ্ধতা।

স্বয়···শরীরই শুধু নয় আত্মার প্রতিটি স্নায়ু শিশুসূর্যদীপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার মত মনে করছে—মিশে যেতে চাচ্ছে কোনো মহান্ নারীর সঙ্গে। সাদা আগুনের প্রবাহের ভেতর গান ঝরে ধোঁয়ায় ধবল হয়ে উঠে উজ্জ্বলন্ত জলস্রোতের মত চোখ বুজে বসে রইল সুতীর্থ।

ঘরের ভেতর এসে মণিকা যে দাঁড়িয়েছিল সে খেয়াল ছিল না তার। 'রোদ পোয়াচ্ছ?' বল্লে মণিকা।

কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, কাপড় পর্দা বইয়ের মলাটে ছোকছোক ছাক খটাস হওয়ার কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, আওয়াজে মণিকার গলা হয় তো তার কানেও পৌছয়নি।

'কখন ফিরলে?' মণিকা আবার বল্লে, 'চোখ বুজে আছ?'

কাল রাতে নিজে যে সোফায় বসেছিল, সেইখানেই গিয়ে বসল মণিকা। সুতীর্থের কাছ থেকে কোনো উত্তরের প্রত্যাশা করে এক আধ মিনিট চুপ করে বসে থেকে নিজেই সে নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লে, 'কখন এলে সুতীর্থ?'

'কে,—তুমি—'

মণিকা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—সুতীর্থও—তাদের দুজনের দৃষ্টি অনেক দূরে একটা ছোট টিপের ভেতর এক হয়ে মিশে গেছে—উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে।

'এইমাত্র এলে সুতীর্থ?'

'হ্যাঁ, এই তো; এই ঘরে।'

'এ কি চেহারা হয়েছে? কোথায় ছিলে?'

‘অনেক জায়গায়।’

‘কোথায়? খুব মার খেয়েছ মনে হচ্ছে।’

‘দেখাচ্ছি তোমাকে।’ সুতীর্থ বললে।

‘থাক থাক কি দক্ষিণা দিয়েছ পেয়েছি দেখাবার জন্যে ছেঁড়া জামা খুলতে হবে না আর।’

‘জামাটা খুলতে হবে, এখন খুলব কিনা ভাবছি। আমার ট্রাঙ্কে আর জামা আছে?’

‘আমি কি করে বলব?’

‘নেই। বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি।’

‘যত টাকা পেটায় তত গরীব—অফিসের ধাড়ি আইবুড়ো।’

‘আইবুড়ো ছিলাম ছেলেবেলায়’, সুতীর্থ বললে, ‘তারপরে আর এক রকম হল—’

‘ও-সব রূপকথা এখন আর চলবে না।’

‘পাশগাঁয়ে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’ সুতীর্থ বললে, ‘চলো নিজের চোখে দেখে আসবে।’

‘কি আছে সেখানে?’

‘স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী ছেলেপুলে—’

‘বেয়ান নেই? শালী? শালাবউ?—স্ত্রী আর শাশুড়ী আছে বুঝি শুধু?’ নদীর মত গলায় মণিকা বললে।

‘তোমার চেয়ে শাশুড়ীর বয়স কমই হবে হয়তো।’

সুতীর্থ পুবের দিকের একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

‘ওটা আবজে দিলে কেন?’

‘বড্ড কড়া রোদ আসছে।’

‘তোমার চোখের ওপর?’

‘তোমার মুখ টসটস করছে—যেন জ্বর-জ্বালা হল—’

‘হল, বেশ হল’, মণিকা চোখ বুজে বললে, ‘সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বরজ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো—কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু—’

‘সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া—’ সুতীর্থ নিজের মনের স্বাদে প্রীত, খানিকটা উদ্গাত ও সমাহিত হয়ে বললে, ‘প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে

শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি—' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি ?'

'তুমি। তুমিও বসে আছ, সেই গীজের মূর্তির কাছে যেন,' ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর রোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার—'কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি : তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে ; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশী নীল—সেই সাধ-সংসর্গের মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্মমৃত্যুর অনন্ত রক্তপাতের মতন সেই আলো ; নীলের অনেক নীচে বড় বড় সহজের কালি ব্যথা উদ্যম নিষ্ফলতার কতশত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল—ব্যাজন শুনছ না মণিকা ? ওগুলো কি খেজুর গাছ গান গাইছে ? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে—'তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে আজকের দিনের ভেতর' সুতীর্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা-পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন : বলেছ তুমি', মণিকা বললে, বাইরে অনেক দূরে যেখানে দুজনের দৃষ্টি একটা তিলের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই একাত্মতার ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে মণিকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না ?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয় সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, খুব আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের—মণিকার দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে ; বললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে এরকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি টেঁকে ?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু গাণিতিক তুমি বটে ; তার চেয়েও বেশী একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ—এই তো বললে তিন হাজার বছর আগের আজকের দিনের ভেতর। তা হলে সব সময় সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চলে গিয়ে বললে, 'কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা বলে। বিজ্ঞানকে অমান্ত করে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?'

'বিজ্ঞানকে সত্যই জ্ঞানে দাঁড় করাবে। বিজ্ঞান তো এখনও আধা সত্য। সত্য হবে, হেঁয়ালিকে সেই তো গিয়ে ধরবে একদিন। বলে মণিকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মণিকা বললে, 'কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক কিছুই হেঁয়ালি রইল।'

সুতীর্থ আলো আবছায়া চোখে তাকিয়ে নিজের সোফায় ফিরে এল।

সুতীর্থের দিকে তাকালো না মণিকা। সুতীর্থ তাকিয়েছিল দূর আকাশের শাখা আগুনের দিকে : সেটা কি সূর্যের, না সূর্য সরে গেছে তার শূন্য স্থানের ? মণিকার মুখে কোনো আলো পড়ল কিনা—কিংবা ছায়া—কোনো ইঙ্গিত এসে মিলিয়ে গেল কিনা তাকিয়ে দেখবার কথা হয়তো সুতীর্থের ; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—তবুও বিদ্যুৎ রয়েছে—নারী নেই তবুও দুর্বার রেতঃক্ষরণ ঐ সকালের, দুপুরের নীলিমায়—অনুভব করতে করতে অপর কোনো মানবের মত হয়ে গিয়েছিল সুতীর্থ : অনেকক্ষণ পরে উঠে সে বাকি জানালাটা খুলে দিল।

'ঐ জানালাটা আবজে রাখলেই ভালো হত সুতীর্থ।'

'সরে গেছে সূর্য। এখন আর তোমার মুখে রোদ পড়বে না।'

'না সে জন্যে নয়, আমি সরে বসেছি—'

'সোফাটাকে আরো ভাল জায়গায় ঘুরিয়ে দিই ?'

'দাও।'

'সমস্ত আকাশটাকে দেখা যায়। কী ভীষণ দানবীয় চেয়ে দেখ—

'দানবীয় ?'

'উর্বশী লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর ; ঐ আকাশের মত।'

কথা বললে না কেউ—অনেকক্ষণ।

'তুমি আমার এই সোফায় এসে বস সুতীর্থ।

'আসছি।'

'আমার পাশে বসো।'

রোদের ভেতর দূর আকাশে চিলের কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন ; অথচ প্রকৃতি সুপরিসরের ভেতর সুস্থির, কেমন আশ্চর্য প্রাণবত্তায় সুচালিত ; মহানুভব।

'কি দেখছ তুমি ?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার দালান সাদা বিছানা বস্তি ব্যথা জন্ম-মৃত্যু ভেদ করে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই থাকে। তুমিই তো বলেছিলে

একদিন—বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও দেখেছি। কিন্তু তবুও দুজনে মিলে দেখবার সময় বেশী পাই না।'

সুতীর্থ মণিকার সোফায় এসে বসল; পাশাপাশি, কিন্তু গা ঘেঁষে নয়। ঘেঁষাঘেঁষি যাতে না হয় সেই জন্যেই একটু সরেই বসল এদের ভেতর একজন।

'সবই আছে, অথচ কিছুই নেই, মহানগরীর ওপরেও এত বড় আকাশ, এরকম রৌদ্র, অথচ সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পণ্ড, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভায়ের হাতে।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে মণিকা বললে, 'চান করে এসো, এখন গেলে কলে জল পাবে। চৌবাচ্চায়ও আছে। আমি জ্যোতিকে বলে দিচ্ছি, দু বালতি জল এনে তোমার চানের ঘরে রাখতে। হবে দু বালতিতে?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু জামায় রক্তের দাগ কিসের?' মণিকা জামার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে।

মণিকা বল্লে, 'এ তো অনেক রক্ত; তোমার নিজের গায়ের? না অন্য কারু—'

সুতীর্থ শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বল্লে, 'না আমার না। কি করে শার্টটা মাড়াল তাই ভাবছি।'

'বোতাম খুলতে খুলতে থেমে গিয়ে ভ্রূকুটি করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বল্লে, রক্তটা কালি মেরে গেছে। তাজা রক্ত নয় নিশ্চয়ই। এ কবে হল। সত্যিই রক্ত তো?'

'আঃ ছি, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছো কেন?'

সুতীর্থ শার্ট খুলে ফেল্ল, বারান্দার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বল্লে, মনে পড়েছে।'

'তোমারই তো রক্ত?'

'সে গল্প শুনবে? তাহলে বোস তুমি।

সুতীর্থ ইজিচেয়ারটা মণিকার সোফার দিকে ঘুরিয়ে একটু কাছে টেনে এনে বল্লে, শার্টে যা রক্ত দেখছ, এই নিচের গেঞ্জিতেও তেমনি,—তার নিচেও—'

'মানে তুমি জখম হয়েছ; কখন হলে?'

''কাল রাতে।'

'কাল রাতে! হাসপাতাল যাওনি কেন?

"এখানে কি হাসপাতাল নেই: তোমার এ বাড়িতে?'

'কাল রাতে তক্ষুনি হাসপাতালে যেতে পারতে তো তুমি'—

দাঁত কড়মড় করে বল্লে মণিকা, 'ওঠো। জ্যোতিকে গাড়ি ডাকতে বলছি ; এক্ষুনি চল।'

সুতীর্থ কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে আস্তে হেসে বল্লে, 'যে ফেরারী সে যাবে হাসপাতালে। কী ডায়েরি করব আমি বল তো দেখি।'

'ফেরারী! কাকে খুন করলে!'

মণিকা জ্যোতিকে ডাকবার জন্যে তেতলার দিকে যাচ্ছিল ফিরে এসে খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল কিন্তু কি মনে করে তৎক্ষণাৎ তেতলায় চলে গেল। মুহূর্তেই অনেক কিছু ওষুধপত্র ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসে বল্লে, 'কই জামাটা খোলো দেখি।'

কিন্তু জামা খুলে দেখা গেল সুতীর্থের গা একেবারে পরিষ্কার—একটা মশার কামড়ও নেই কোনোদিকে—

মণিকা গালে হাত দিয়ে সোফার এক কিনারে বসে বল্লে, 'তাহলে বিরূপাক্ষ যা বলেছিল সেই কথাই ঠিক?'

'বিরূপাক্ষ? তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'দেখা হয়েছিল। তুমি ফেরারী কাকে খুন করলে?'

'তাকে কি করে চিনবে তুমি?'

'কোনো বড়মানুষকে করোনি তো?'

এ প্রশ্ন শুনে মুলো কলা আর ঘণ্টা নাড়ার পুজোর পুরুতের মত মনে হল মণিকাকে—নিজেকেও—নিজের সংগ্রামটাকে। এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বড় কাজকর্মের আসরে অগ্রদানী বামুনের মত যেন—একটু বিষদাঁত ঘষে সুতীর্থ বল্লে, 'বড় মানুষরা তো আমাদের দলে।'

'ও কি, রক্তমাখা জামাটা কখন তুলে আনলে? জানালার গরাদে বেঁধে কি করছ সুতীর্থ: রক্তের নিশান ওড়াচ্ছো?' বলতে বলতে খুব বিরক্ত, পীড়িত হয়ে মণিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল, রাস্তার দিকের দুটো জানালাও।

'না, কোনো বড়মানুষকে খুন করিনি।'

'কোরো না।'

'কেন করব না বল তো দেখি? আমি হেঁয়ালি সাধছি ; তুমি কষে বলো। তুমি ছাড়া কেউ প্যাঁচ খুলতে পারবে না।'

'হেঁয়ালি টেঁয়ালি নয়—কেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াতে যাবে?' 'বিপদ

আছেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কুলিকামিন এক আধটাকে খুন করলেই হয়ে যায়, ওতেই বেশ গেঁজে ওঠে; বেশ খাসা লপসি লিসপিস পয়দা হয়। ওরা বিপ্লব করতে জানে না, ওদের সকলকে কেটে ফেল্লেও না। কিন্তু কী হবে একটা মল্লিক, মুখার্জি, হীরাচাঁদ, হুকুমচাঁদকে মেরে।'

সুতীর্থের কথাবার্তা রকমসকমের কেমন একটা বেচাল বিসদৃশতায় মণিকার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ সঞ্চিত হচ্ছিল যেন; টন টন করে উঠল তার।

'হীরাচাঁদ কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।'

'কি করেছিল সে?'

'কিচ্ছু না।'

'এ রক্তের দাগ কিসের?'

'তা পরে শুনবে। আগে বল আজকের এই যুগে আমাদের মতন লোকের পক্ষে ধরে ধরে হেঁসো দিয়ে ঝাড় সাফ করে ফেলাই ভালো—'

'না, তা আমি কি করে বলি। আমার মতে খুন করাই খারাপ।'

'কিন্তু যদি খুন করতে হয় তাহলে কাকে করব?'

'কাউকেই না।'

'বরং গয়ানাথ মালোকেই, তাই না মণিকা?'

'গয়ানাথ মালো কে?'

'নাম শুনতেই তো বুঝেছ একটা কেষ্টো-বিষ্টু কেউ নয়। কিন্তু তবুও ছেলেপুলে নিয়ে ওর একটা মস্ত পরিবার। পরিবারটা স্বামী স্ত্রীরই এক জোটে না, আরো কেউ নাক ঢুকিয়ে বংশ বাড়িয়ে গেছে তা জানি না। যা হোক, পরিবারটা না খেতে পেয়ে মরছে।'

'আমরা কি করব,' মণিকা বল্লে, 'আমরা তো নিঃসহায়।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল; পায়চারি করতে করতে বল্লে, 'ঠিকই বলেছ তুমি।'

মণিকার দিকে ফিরে সুতীর্থ বল্লে, 'আমি গয়ানাথ মালোকে মেরেছি। এ তারই রক্ত।'

'তার রক্ত?'

সুতীর্থ জানালা দুটো খুলে দিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ, বড়দের কারো নয়; ভয় করবার কিছু নেই।'

'স্ট্রাইক হয়েছিল ?'

'কিছুটা হয়েছিল।'

'তোমাদের ফার্মে ?'

'আমাদের ফার্মে নয়।'

'তাহলে ?'

'এই শহরেই—কোনো কোনো জায়গায়।'

'তুমি কি কলকাতার বাইরে ছিলে এতদিন ?'

'না।'

'ধর্মঘটের ব্যাপারে কিছু করেছিলে তুমি ?'

'যাতে জেল হয় এমন কিছু করিনি হয়তো।'

সুতীর্থ উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিল। ফিরে এসে বল্লে, 'কিংবা করে থাকিই যদি, জানবে কে ? এই তো এই লোকটাকে খুন করেছি আমি। কি হয়েছে তাতে ? খুন যে করা হয়েছে তা বের হবে একদিন। কিন্তু এ নিয়ে গাঁইগুঁই করবার মত একটা কুত্তাও থাকে না এসব লোকের।'

একুশ

চান করে খেয়ে দেয়ে সুতীর্থ বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল। খাবার অবিশ্যি ওপরের থেকে এসেছিল। সুতীর্থের চাকর চলে গিয়েছিল—এরকম উড়নচণ্ডে লোকের চাকর কদিন টিঁকে থাকে। খাবার দিয়ে গেল জ্যোতি। কিন্তু মণিকা আর এল না। বাসে করে সুতীর্থ যে জায়গায় নামল সেখান থেকে হেঁটে আরো মাইলটাক যেতে হয়; জায়গাটা কলকাতার বাইরে। তবে বেশি দূরে নয়। নানারকম ফ্যাক্টরি রয়েছে, অনেক কুলিমজুর খাটছে। এরই ভেতর একটা ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট চলছিল। সুতীর্থকে দেখতে পেয়েই কতকগুলো লোক হইহই করে উঠল—হয়তো মারবেই তাকে—কিংবা হতে পারে তার কাছ থেকে সাচ্চা কিছু পাবে বলে কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কি যে হবে কিছু বলা যায় না। জনতা যখন উত্তেজিত তখন যে কোনো মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের মৃতদেহ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ওরা দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই সম্রাটও বানিয়ে ফেলতে পারে মানুষকে; সম্রাট

যদি মনের ভুলে কথা বলে কিংবা বেকুবি করে, তাহলে তার গর্দান নিতে সময় লাগে না, লাগা উচিত নয় সেটাও হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছে।

'আজ আমি তোমাদের কাছে বক্তৃতা করব না।' সুতীর্থ বললে।

'ও সবের দরকার নেই দাদা,' হৃদয় ভৌমিক বললে, 'বাজি খুব তেতে আছে। আকাশের সূর্যের চেয়ে তার ঝাঁঝ বেশি। আর কত ঝাঁঝালো করে তুলবেন তাকে সুতীর্থবাবু—'

'তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ফিরিঙ্গি মজদুর আছে নাকি শুনলুম—'

'আছে বইকি, মজদুর নয়', বঙ্কু বললে।

'মজদুর নয়, ইঞ্জিনিয়ার,' বললে বিহারী।

'কজন আছে?'

'ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, অ্যাসিসটেণ্ট—সে আছে অনেক। কেন বলুন তো সুতীর্থবাবু?'

'তারাও তো ধর্মঘট করছে।'

'না, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করবে না। কেন করবে? এদের—'

ইয়াসিন একটু সতর্ক হয়ে বললে, 'তাদের না করলেও চলে। দিন কেটে যায়।'

'তোমাদের মতলব কি?'

'আমরা চালাব' সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল।

'কেমন চিমসে হয়ে যাচ্ছে—গোলগাল চেহারা ছিল ইয়াকুবের এ হল কী। বিড়িই বুঝি টানছে সারাদিন মকবুল। দানাপানি পেয়েছে আজ? শুধু জল খেয়ে আছ?'

'ফতিমা আপনাকে ডেকেছে।' মকবুল বললে।

'আমাকে?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'হ্যাঁ, আপনাকেই।'

'কেন বলো তো?'

'যান, গিয়ে দেখে আসবেন।'

'আজ যাব না—সময় হবে না।'

কবে সময় পাবেন তাহলে?'

সুতীর্থ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আজ আর হবে না। সময় নেই।' মকবুল মুখ বেজার করে চলে যাচ্ছিল।

‘কোথায় যাচ্ছ মকবুল ?’

একটা বিড়ি জালিয়ে মকবুল বললে, ‘আরে রাখুন মশাই।’

‘কি হল রে তোর মকবুল—’ ইয়াসিন বললে।

‘এই স্থতীর্থবাবু প্রমিস করেছিলেন, আমার কাছে যে একবেলা আমাদের সঙ্গে বসে মুন ভাত খাবেন—’

‘কিন্তু এখন কি করে খায়। এখন তো তোবাই খেতে পাচ্ছিস না।’ হামিদ বললে।

‘খেতে যে পাচ্ছি না, পরতে পারছি না তাই নিয়ে গিদ্ধোরের মত ফেউ ফেউ করবি—না চোখ তারিয়ে বেটাচ্ছেলেরা দেখবি সব, নগদানগদি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিবি ফেউ ফেউ না করে—’

‘ঠিকই বলেছে, মকবুল মোক্ষম বলেছে ইয়াসিন। তোমাদের ধর্মঘটের ক’দিন হল ?’

‘এই দশ দিন আজ নিয়ে।’

‘কর্তাদের মন উঠছে না।’

‘অত সহজে কি আর তা হবে। দেখুন স্থতীর্থবাবু, আমার মনে হয় এই ধর্মঘট জিনিসটার বিশেষ কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমাদের দেশে।’ বঙ্কু বললে।

স্থতীর্থ বিষ ঝাড়বার ওঝার মত চোখে ক্ষতটার দিকে তাকাল যেন বঙ্কুর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে দৃষ্টির আবেদন শাসন সব অগ্রাহ্য করে বঙ্কু বরং হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘কত পার্টি আছে। আমাদের দেশে, কত পোলিটিক্যাল পার্টি ও সব পার্টির স্থনাম যে নেই তা নয়। স্থনাম আছে। স্থনাম ছিল একদিন। কিন্তু সে সব ভাঙিয়ে খাবার মত পেটোয়া লোকের অভাব আমাদের এই সোনার দেশে নেই সাহেব। এরা আসে যায়—সভা করে—বক্তৃতা দেয়—কাগজে লেখে—নিজেদের ভেতর কথা কাটাকাটি—পরে কামড়াকামড়িও করে। এদের ভেতর কে ছোট—কে বড়—কে আমাদের সত্যিই ভালো করল—কার বা ভালো করার প্রয়াসটা স্রেফ বদমায়েসি—এ সব পাঁচরকম দশরকম সব ভিয়েনে চড়িয়ে কালো ঘোড়ার সঙ্গে শাদা ঘুড়ী মিশিয়ে লেলিয়ে দেয় ওরা, ঘুড়ীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়াগুলো, আবার আস্ত রেখেও খায়—ঘুড়ীটাকে বেশ ঝাড়ে গোছে ফনফনে রেখে। এ সবের মানে কি হে হামিদ—এ সবের মানে কী আপ বাতাইয়ে মুঝকো—’ বঙ্কু বিড়ি জালাল।

হামিদ বললে, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন সুতীর্থবাবু ?'

'এই মাটির ওপরেই বসে পড়ুন ; এ ছাড়া আমাদের আর কোন ফরাস নেই দাদা।' বঙ্কু বিড়িতে টান দিয়ে বললে।

সুতীর্থ বললে তোমার কথার উত্তর আর একদিন দেব বঙ্কু। মোটামুটি তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমরা নিজেদের ভেতরই মন কষাকষি করি—'

'আমরা বলছেন, আমরা কারা ? ধর্মঘটীদের কথা বলছি না তো সুতীর্থবাবু।'

'তা বলছ না অবিশ্যি তা আমি জানি, কিন্তু—' অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আমি বলছি তাদের কথা যাদের ফুসলানিতে আমাদের ধর্মঘট করতে হয়—'

'যা রে, তুই বড় ভালোমানুষ হামিদ, তুই জানিস না আমাদের দেশে কতগুলো কালো পাঁটা আর ধলো পাঁটা আছে।'

'হিন্দু পাঁটা আর মুসলিমের নয়াল মুর্গির আণ্ডা আছে ইযা ইয়া।'

'লালপাগড়ি লকলক করছে মোরগটার যে ভিজিয়ে তিতিয়ে ডিম পাড়ায়—

'আর শাদা ডিম সকসক করছে মুর্গিটার যে ভিজে পুড়ে ডিম পাড়ে—

'হে—হে—হে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল—পায়চারি করছিল, একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল এবার। বসেই তার মনে হল ওরা সব মাটিতে বসেছে—এরকম গুঁড়ির ওপর বসা তার ঠিক হবে না, ওরা হয়তো ভাববে এইটুকুর ভেতরেও সুতীর্থবাবু ভেদাভেদ করছেন। সে মাটিতে গিয়ে বসল একেবারে অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেষে—

সুতীর্থ বললে 'হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল, বিপিন শোন তোমরা। বঙ্কু বলতে চায় যে ধর্মঘটের অছিলায় আমাদের মতন বাবুরা নাম কিনি। আশ মিটিয়ে কথা বলবার খবরের কাগজে লিখবার শখ মেটাই। এত সব বজ্জাতি করেও আমাদের তেল মরে না, শখ মেটে না, নিজেদের ভেতর এঁটোর ভাগ নিয়ে কুকুর বেড়ালের লড়াই শুরু করে দিই। ঠিকই তো। বঙ্কু যা বলেছে একেবারে মিথ্যে নয়।'

'একেবারে শব্দটা বাদ দিন সুতীর্থবাবু।' বঙ্কু বলল।

'বলব : মিথ্যে নয় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হবে। কিন্তু তুমি যা বলেছ বঙ্কু, একেবারে সত্যও নয়।'

বঙ্কু তার জলন্ত বিড়িটা স্বতীর্থকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে ঠিক করেছিল। কিন্তু টের পেল হামিদ এবং টের পেয়ে ইশারা করে বঙ্কুকে উত্তেজিত হতে বারণ করছে। কাজেই নিস্তব্ধ হয়ে রক্তাক্ত মুখে বিড়ি টেনে চলল সে।

স্বতীর্থ বললে, 'বঙ্কুর বক্তব্য হচ্ছে পোলিটিক্যাল পার্টির লোকরা এসে নিজেদের লাভ লোকসান হিসেব করে একরোখা বোকাদের তাতিয়ে ধর্মঘট বাধায়। ধর্মঘটীরা নিজেদের তাগিদে ধর্মঘট করে না—এই তো?'

কথা শেষ করে বঙ্কুর দিকে তাকাল স্বতীর্থ। বঙ্কু বাস্তবিকই এবার বিড়িটা ছুড়ে মারল, কিন্তু ঠিক স্বতীর্থকে তাক করে নয়; কিন্তু কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে অসম্মান করতে হলে যেরকম ভাবে মারা উচিত তা তার অব্যর্থ হয়েছে—যে যার মুখ চাওয়াচায়ি করে সকলেই সেটা জেনে নিল। ব্যাপার মেনে নিল না অবিশ্যি সকলে।

'নিজেদের তাগিদে আমরা ধর্মঘট করি না, একথা খুসকি খানকিরা বলে—

'হতে পারে আমি খুস—'

কষে একটা গাট্টা মারল অনন্তরাম বঙ্কুর মাথায়। স্বতীর্থ তাকিয়ে দেখল বঙ্কু ঘুরে পড়েছে।

'ওটা কি হল তোমার অনন্ত? এ কি করলে তুমি? তোমরা নিজেদের ভেতরেই যদি এরকম কর—'

বঙ্কু মুখের মাথার ঘাস ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দুপাটি পানসে দাঁতের খানিকটা রক্তথুতুর পিচকি কাটল, আরো দুতিনবার পিচকি কেটে বললে, 'আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক আছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, কোথায় থাকেন আপনি?'

'বালিগঞ্জে।'

'কোন রাস্তায়?'

'লেক রোডে।'

'লেকের পারে আইভরি টাওয়ার স্বতীর্থবাবুর—' কে যেন কিছুটা শিক্ষিত সাহিত্য-পড়া ওদের মধ্যের থেকে একজন বললে।

'গজদন্ত মিনারে—লেকের পারে—' সেই বললে আবার।

এসব জিনিস নিয়ে সাহিত্য পত্রিকায় প্রবন্ধটবন্ধ লিখেছে হয়তো মানুষটি।

'আমার নিজের বাড়ি নেই, আমি ভাড়াটে।' স্বতীর্থ বললে।

'কোন তলায় ?'

'দোতলায়।'

'কটা কামরা ?'

'তিন-চারটে—'

'তিনচারটে কামরা বালিগঞ্জের এক পরিবারের জন্যে। এটা খুব নবাবী হচ্ছে তো সুতীর্থবাবু। আমরা তো গোয়ালে আস্তাবলে গ্যারাজে যারা আছি তারা ভালো আছি। গোসলখানায় পায়খানায় আরসোলার মত ফড়ফড় করে উড়ছি যারা নুন-চিনির বদলে আপনাদের ডি ডি টির গুঁড়ি খেয়ে তাদের দেখেছেন কোনদিন আপনি ? ভালো আছে তারা, আরসোলারা বেশ আছে। কিন্তু আমাদের বস্তিতে এসে দেখেছেন কি আমরা কেমন আছি ?'

'আমি তো এসব সাতসতেরোর ভেতর নতুন এসেছি ভাই, ভালো করে দেখবার শোনবার সময় হয়নি আমার।' সুতীর্থ বললে।

'সময় হয়নি! মধু আর মকরধ্বজ দিয়ে মেড়ে না দিলে এসব লোকের সময় হয় না কোনো কিছু করবার—কথা বেচে নেতাগিরি করা ছাড়া।'

'বস্তির ফোটো দেখলেই সুতীর্থবাবুদের হয়ে যায়।'

'শ্রমিকসভার ব্লুবুক দেখেই সুতীর্থবাবুদের—' নিকুঞ্জ শুরু করলে।

'ব্লুবুক নয়, ব্লুবুক নয়—আমাদের কোনো ব্লুবুক নেই নিকুঞ্জ—' রতন বললে।

'আমি বলছিলুম'—নিকুঞ্জ একটু গলা থাকড়ে নিয়ে বললে 'আমরা একটা বিষম ভুল করেছি। প্রলিটারিয়েটদের নেতা প্রলিটারিয়েটদের ভেতর থেকেই হওয়া উচিত। বুর্জোয়ারা আসে কেন আমাদের কাপ্তেনী করতে ? সুতীর্থবাবু তো বালিগঞ্জের লণ্ড্রির ইস্ত্রিকরা বুর্জোয়া ; বস্তি দেখেননি কোন দিন, শ্রমিকদের চেনেন না, কিষাণদের চেনেন না, আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই, মানুষকেই দেখেননি তিনি এমনই মহামানুষ—' নিকুঞ্জ একটা বিড়ি জ্বালিয়ে হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এইসব পাতিমানুষ কেন ফোপলদালালি করতে আসে হে হামিদ ?'

হামিদ ঘাড় কাত করে কথা ভাবছিল, বললে, 'প্রাণে সাড়া পেয়েছেন বলেই এসেছেন সুতীর্থবাবু। এসে একদিনে অনেক কাজ করেছেন। পরামর্শের মূল্য আছে সুতীর্থবাবুর, মাথা ঠাণ্ডা আছে : তোমরা যা চাচ্ছ প্রলিটারিয়েটরা সবি হবে—কিন্তু রাতারাতি হবে না। এই তো এলেন সুতীর্থবাবু। বুর্জোয়া

ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু বোঁটকা গন্ধটা নেই তেমন আর—দুদিন সবুর ভাই সব—ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'আরসোলা রাতারাতি কাঁচপোকা হয়ে যায় না হামিদ ?' বন্ধু বললে, 'তা হতে পারে।'

'কিন্তু তবুও মানুষ হয় না। কি বল ? একটু সবুর করতে হবে সুতীর্থবাবুর জন্যে আমাদের ?' বন্ধু বললে।

'একটু ভোমরাগাছি করতে হবে।' নিকুঞ্জ বন্ধুর দাবনায় ছোট একটা ঘুষি মেরে হেসে বললে।

মকবুল অনেকক্ষণ ধরে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কে কি বলছিল না বলছিল সেদিকে কান ছিল না তার ; সুতীর্থকে বললে, 'আপনি চলুন—'

'কোথায় ?'

'আমার বাড়ি।'

'যাব আমি।'

'আজই যেতে হয়।'

'আজ পারা যাবে না মকবুল।'

'এই এতক্ষণে কি হয়ে আসতে পারতেন না ?'

'তোমার বাড়ি তো এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। সেখানে বাস যায় না। আমার মোটর নেই—'

শুনে কয়েকজনে হো হো হো করে হেসে উঠল।

'আপনার মোটর শালিমার গিয়েছে।'

'সেখান থেকে শালী নিয়ে আসতে।'

'আমার কাছে মবিল অয়েলের টিন আছে সুতীর্থবাবু, তিন গ্যালন, দু-গ্যালন। আপনার মোটর এলেই ভক করে ঢেলে দেব—'

'কিন্তু আসবে কি করে, আপনার গাড়ির স্পেয়ার পার্ট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ভুশণ্ডির মাঠে বানচাল হয়ে পড়ে আছে তাই মোটর—রিষড়ে পেরিয়ে।'

'ভুশণ্ডির মাঠে কি খাচ্ছে মোটর ?'

'মানুষ খাচ্ছে গোরু খাচ্ছে; আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে যে পাখিগুলো হেগে যায় তাই দিয়ে পানচুন বানিয়ে খাচ্ছে আর কি।'

একটা হাসির হল্লা পড়ে গেল। সুতীর্থের 'আমার মোটর নেই' সম্প্রতি

ভুলে গেল তারা। এক একজনে এক একটা পার্টির নাম ও তাদের চাঁইদের নিয়ে কেচ্ছা খিস্তি শুরু করে দিল। সকলেই অবিশ্যি এ উদ্দীপনায় যোগ দিল না।

কেউ দাঁত দিয়ে কেটে কুটো ছিঁড়ছিল, কেউ বিড়ি টানছিল, মাথা হেঁট করে বা ঘাড় কাত করে অথবা শূন্যের দিকে চেয়ে নিরুত্তর থেকে; কেউ বা হাত গুটিয়ে বসেছিল, সাত চড়ে মুখে কোনো রা নেই এমনি মুখ করে; অতি অথর্ব যারা তারা ঝিমুচ্ছিল. অল্পবয়সীদের ভেতরেও একরকম কয়েকজন অতি স্থবির ছিল: আবার বুড়োদের মধ্যেও দুশমন গোছের কয়েকজন কেউ কোনোদিকে লেলিয়ে দিলেই দুনিয়া ছাতু করে দিতে পারে এমনিভাবে একবার ফ্যাক্টরির দিকে—সুতীর্থের দিকে—নিজেদের পরস্পরের পানে তাকাচ্ছিল কটমট করে। ধর্মঘটীদের সকলেই যে এই দলটার ভেতরে যোগ দিয়েছে তা নয়; অনেকে আসেইনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঠের এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে অনেকে।

পরদিনও ধর্মঘটীরা সেই জায়গায়ই সেইরকম ভাবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিল। সুতীর্থকে দেখে বিশেষ কিছু বললে না কেউ আজ আর। কাল অনেক রাত অব্দি সুতীর্থ ছিল এখানে, আজ হয়তো সারা রাতই থাকবে। সুতীর্থের বিশেষ কাজগুলো (সলা-পরামর্শের চেয়ে ঢের বেশি দামী যেগুলো) হামিদ অনন্ত রামদের সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়, নিকুঞ্জদের সঙ্গে নয়। একই দলে যে দুতিনটে চিড় থাকবে সেটা সুতীর্থ বা হামিদ কেউই ভালোবাসে না, কিন্তু সম্প্রতি বন্ধুদের না চটালেও একেবারে কোলে টেনে নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কে জানে হামিদ অনন্তরামও হয়তো সুতীর্থকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যরকম সুর ধরতে পারে—যে কোনো মুহূর্তে—আজো হয়তো—কাল পরশু হয়তো।

'আমি যাব তোমাদের বাড়ি মকবুল।' সুতীর্থ বললে।

'আজই?'

'জরুর।'

শুনে ভবেশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ও পাড়াটা যে সবই তোমাদের মকবুল?'

'তার মানে?'

'মানে ওখানে সবাই তো মুসলমান।'

'কী হল তাতে?'

'মানে দাঙ্গা কিছুদিন হয় থেমে গেছে বটে। কিন্তু তবুও বলা যায় না কিছু। লাগ লাগ করে লাগে যদি আবার—'

'সুতীর্থবাবুকে আমাদের পাড়ায় নিয়ে লাশ গুম করে ফেলব সেই কথা বলতে চাও তুমি ভবেশ ?'

মকবুল বললে, 'বাঁট দেখে বলে দেবে বুঝি কোনটা কোন ধর্মের গোরু ? হিন্দু গোরুর বাঁট কেটে রেখে দেবে মুসলমানদের এলেকায় গেলে ?'

শুনে ভবেশের আগে সুতীর্থ হেসে উঠল : 'গোরুই বটে, গোরুই আমি মকবুল। গোরু ছাড়া কি আর। কিন্তু রাস্তার বড় বড় ভাগলপুরী গাইগুলোকে দেখে কলকাতার আদ্ধেক মানুষকেই বকনা বাছুর বলে মনে হয়। আমি নিজে অবিশ্যি কলুর বলদ ছিলুম।'

কেউ কোনো কথা বলছিল না। সুতীর্থের এ সব কথার রস সঠিকভাবে আস্বাদ করবার মত মনোযোগ, মনের মর্জি ছিল না তাদের। এমন কি বঙ্কুও বিশেষ উৎসাহিত বোধ করল না।

'ধর্মঘট তোমাদের এই দশদিন ধরে চলছে। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের বিধান এই দশটা দিনে তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু তবুও কি নিরেট প্রাণশক্তি তোমাদের। তোমাদের সকলেই যে এক পার্টির তা নয়। তোমাদের মধ্যে নানা পার্টির লোকই হয় তো আছে ; এমন কেউ কেউ আছে যে কোনো পার্টির সঙ্গেই তাদের কোনো সম্পর্ক নেই ; তারা জানে তবুও ভাত কাপড়ের মনের স্বাধীনতার মর্যাদা—সকলের জন্যেই স্বাধীনতার রুজি রোজগারের সচ্ছলতায় দরকার এটা বেপরোয়াভাবে জানে তারা।'

(বলে ফেলেই সুতীর্থ মনে মনে অপছন্দ করতে লাগল ; এই শব্দ, এই ভাষণ, ভাষণের এই রীতি তার মুখে ঠিক খাপ খাচ্ছে না যেন), 'কাজেই কোনো বিশেষ নিশানের নিচে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে মানুষের মত সকলের হয়ে আকাশের নিচে দাঁড়াতে হবে তোমাদের—অনাথ আর্ত-আহম্মকদের ভিড় যাতে সফল হয়—'

বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আর বক্তৃতা দেবেন না সুতীর্থবাবু বক্তৃতা আমরা চাই না। ওটা আপনার রোগ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।'

শুনে দাঁত কেলিয়ে রইল অনেকে ; হাসছে, না কাঁদছে, না টিটকারি দিচ্ছে বুঝতে পারা গেল না। গলা ছেড়ে হাসির শব্দ নেই কোনোদিকে।

'বেল্লিক তুমি বঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন, শুনতে দিচ্ছ না।'

'আমি কি তোমাকে কানে আঙুল দিয়ে থাকতে বলেছি হামিদ। যা বলছে সুতীর্থবাবু এই যদি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলত, সে মাইক পয়দা করে দিতুম আমি। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছ্যাদায় তুলো দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে বলিনি হামিদ। শোন যা বলছেন। কই বলছেন না তো কিছু আর আমাদের ভাগ্যিদাদা। বারোটা তেরোটা বেজে গেল বুঝি। দাও তো হে দেশলাইটা সিপতি।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে বঙ্কু কথা বলতে গেলে এক সের লোহায় এক মণ হয়ে গুলিয়ে যায় সব।' সুতীর্থ বললে।

'হ্যাঁ, মনে হয় যেন মুখটা লাউডস্পীকার, কথাটাও ভাড়া খাচ্ছে। কে খাওয়াচ্ছে ভাড়া?' মকবুল বললে।

ঘনশ্যাম বললে, 'বড় রাম খাওয়াচ্ছে পাতিরামকে। চলবে না ও সব ছেঁদো বাকচাল সুতীর্থবাবু। কাজ কি করেছেন তার হিসেব দিন। আপনি তো সব পোলিটিক্যাল পার্টি ভেঙে ঝাণ্ডা গুটিয়ে মানুষের মত একঠাঁয়ে আমাদের দাঁড় করাতে চান। কিন্তু কে দাঁড় করাবে শুনি? যে হড়বড় কথা বলে যাবে সে? এ ক'দিন কথা আর কথা আর কথা বলা ছাড়া কি জোটালেন আমাদের জন্যে? আমি আই এস-সি পাস করে যাদবপুরে কিছুদিন পড়েছিলুম, আজ এখানে মিস্ত্রি, আমাদের ভেতর কেউ কংগ্রেসের, কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, ডিমোক্রাট, রেভল্যুশনারি, রিপাবলিকান—কিন্তু আজকের এই ধর্মঘটে আমাদের সকলের সব আলাদা আলাদা পোলিটিকস মিলেমিশে এক ভোগাণ্ডি ইকনমিকস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক দিয়ে কি করতে পারেন অবিলম্বে সেই চেষ্টা করুন। আছে কতকগুলো চ্যাংড়া—মজুরের গায়ের গন্ধ শুঁকবে আর জিভ চুকচুক করবে—অমানুষ যে মানুষকে শোষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ—যে বড় বালাই, দুনিয়ার সর্বহারাদের গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে হবে—শালা ওলাউঠো যত সব—আপনারা কি কেবল মুখ নাড়বেন, কাজ করবেন না?'

'এ মুখ নাড়ার চেয়ে মেয়েদের নথনাড়াও ভালো। তাতে ঢের পাকা কাজ হাঁসিল হয়।' অনন্তরাম বললে।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিও তো ওই মিটিংই করলে ঘনশ্যাম।' বঙ্কু বললে, 'কি পথ বাতলালে তুমি নিজে? কথা ছাড়া আছে কিছু ট্যাঁকে?'

'আছে বইকি। দেখবি চ। গয়ানাথ মালোর কি হল বল তো দেখি—'

শুনে অনেকে একসঙ্গে ঘনশ্যামকে ছেঁকে ধরল।

'কী হল বল তো—গয়ানাথ কোথায়?'

'গয়ানাথ খুন হয়ে গেছে।'

'খুন হয়ে গেছে! কোথায়?'

'লাস পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? লাসটা অব্দি পাওয়া যাচ্ছে না।'

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়ল আবার।

'কে খুন করল?'

'পুলিস কোন কিনারা করতে পারছে না।'

'তা তো পারবেই না।'

'কে খুন করল?'

'সে জানে চৌধুরীসাহেব আর তার শ্বশুর। আলবৎ জানে।'

'কে খুন করল! কে খুন করল!!' অনেকগুলো গলা দশ আনি উত্তেজিত ছ' আনি উৎকণ্ঠিত, নাকি ছ' আনি উৎসুকিত দশ আনি উদ্দীপিত—ছ' আনি চার আনি ব্যথিত হয়ে উঠল,—মনে হল সুতীর্থের।

সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, 'গয়ানাথ কি করেছিল যে খুন হল?'

'সে আমাদের সর্দার ছিল তাই।'

'মোটরে জীপে চড়ে সব পার্টির লোক আসে, ফিরিস্তি গেয়ে জীপে করে ফিরে যায় আবার। না, না, গয়ানাথ ও-সব ভজভজে বাঁজা আঁটকুড়ের বাচ্চাদের মত নেতা ছিল না। মুখে খই ফুটত না, সে গাঁইতি নিয়ে কাজ করত।'

'গাঁইতি?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'ওটা হল রূপক: কাস্তে হাতুড়ি গাঁইতি। কাস্তে হাতুড়ির তো দশ মাস চলছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার গাঁইতি একটু কাজ চালিয়ে দিক—গাঁইতি, তুরপুন, করাত, কুড়ুল। গয়ানাথ মালোর মত লোক যদি কর্তাদের নেকনজরে না পড়ে তা হলে পড়বে কে। আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব!'

'তোমরা বড় তড়পাচ্ছ হে ঘনশ্যাম—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা গুম হয়ে যাচ্ছি—আর ওরা এর ওর মা-বোন নিয়ে স্ট্রিমলাইন হাঁকাচ্ছে। ওদের ধান খেয়ে ওদের পাঁশগাদার হোঁৎকা মুর্গির মত কথা বলবেন না সুতীর্থবাবু।'

'ছোলা মুর্গি হয়ে পড়ে থাকব আমি ঘনশ্যাম, ওদের ধান খেয়ে কথা বলি যদি।'

'বেশ মানলুম। এখন গয়ানাথের একটা কিনারা করুন। কর্তাদেরও জানান দিন যে ফ্যাক্টরি কুঁকড়ে চামচিকের ছা হয়ে যাবে, তবু একজন ধর্মঘটীকেও বাগে পাবে না তারা যদি আমাদের পঁচিশ দফা দাবি অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নেয়।'

ঘনশ্যাম বললে, 'এটাও জানিয়ে দেবেন যে সব দল একজোট হয়েছে। ভাঙানি চলবে না। মরিয়া হয়ে চালাতে চাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে চোখের সামনে দেখছেন তো।'

'না ভাঙাচি-টাঙাচি চলবে না', সুতীর্থ বললে, 'আজকাল ধর্মঘটের জোর বাড়ছে। মানুষকে মানুষ বলে মনে করে প্রায় সকলেই। কাজে তার প্রমাণ দিতে না গেলেও একটা ট্যাকটেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভাঙানি দিতে সকলেই দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু তবুও তোমাদের সত্যাগ্রহ চলতে থাকুক।'

'তা চলবে। কিন্তু পুলিস তো সত্যাগ্রহী নয়। ধর্মঘটীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে।'

'আজ কি পুলিস আসবে?'

'আসবে বই কি।'

'কখন?'

'এক আধ ঘণ্টার ভেতরেই।'

'আচ্ছা বেশ, ধর্না দেব সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে। মার খাব, কিন্তু এখুনি জেলে যেতে রাজী নই—'

'কেন?'

'তা হলে গয়ানাথের ব্যাপারের গিঁট খসানো শক্ত হবে।'

'সুতোগুলো জড়িয়ে জড়িবড়ি পাকিয়ে গেছে বুঝি সুতীর্থবাবু? কত বড় ন'টাই বেবাক সুতো লাট খেয়ে গেল? গিঁট খসাবেন তো? গিঁট খসাবেন সুতীর্থবাবু হ্যাঁ হে করালীচরণ—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খসাবেন।'

'তা খসাবেন, তার আর কি—'

সুতীর্থ বললে, 'কর্তাদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া সুপারিশের ব্যাপারটা তোমরা কি খুব ভাল করে চালাতে পারবে? যদি পার তা হলে বল আমি কয়েকদিন

জেলে দাড়ি গজিয়ে আসি—এখানে ফিরে এসে ঘাট কামাবার আগে।' স্থতীর্থ তার গালের পাঁচ-সাত দিনের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল।

'আর আমাদের ঘর আর বার—আমাদের জল আর জেল, ও সব একঠাঁই হয়ে গেছে আমাদের—' খুব একটা কালো নিশ্বাস ফেলে পীতাম্বর বললে।

'হাঁড়িতে ভাত নেই বলে ঘরে গিয়ে দেখব পরিবার মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে, তার ফাঁড়ি খাওয়াই ভালো। আমরাই যাই—পেটে কিছু চামচিকের দানা পড়বে তো ফাঁড়িতে গেলে—' একবার মুখ তুলে আবার তিন-চার ঘণ্টার জন্যে মুখ বুজে রইল খোসাল দত্ত।

'আপনি স্থতীর্থবাবু চালু হয়ে যান।' অনন্তরাম বললে, 'যা করবার করুন। হয় আমাদের সঙ্গে মিশে বেধড়ক মার খেতে শিখুন—জেলে চলুন। না হয় অ্যাডজুডিকেশন বোর্ডকে শায়েস্তা করে দিয়ে জেনে আস্থন গয়ানাথকে কে মারল আর আমাদের পঁচিশ দফা অক্ষরে অক্ষরে দু-হপ্তার মধ্যে মেটানোর কদ্দূর কি হচ্ছে, কি হবে।'

বাইশ

স্থতীর্থ ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিশে সত্যাগ্রহ শুরু করে দিল। শীতের অপরাহ্ণের রোদের তেজ কমে যাচ্ছিল ক্রমেই। এই পিঠে রোদে মুখ-পিঠ পুড়িয়ে ধুলোয় ঘাসে চিত কাত উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগছিল না। একেই কি বলে ধর্মঘটের তাড়সে ধর্না দেওয়া। কিন্তু পিকেটিঙের এ তো কলির সন্ধ্যে সবে। তা ছাড়া সে আইবুড়ো মানুষ, শরীরও শক্ত আছে তার, মনেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বড় একটা দায়িত্ব নেই এক-রক্ত-দাবি করা কোনো গলগ্রহীদের কাছে।

'কি গো হামিদ, শুয়ে বসে লাভ কি যদি ওরা না আসে?'

'ওরা কি আজ আসবে?'

'ওরা কারা? পুলিস?'

'না। যারা তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে—'

'আজ আর আসবে না।'

'কাল ?'

'সে সব বলা যায় না কিছু। তবে এখন থেকে ক্রমে ক্রমে কিছু আসবে। ক্রমেই ওরা দলে ভারি হবে।'

'কারা ? যে সব কামিন স্ট্রাইক ভেঙে দিতে চায় ?'

'হ্যাঁ, এই দশ দিন হয়ে গেল, অনেকেরই শিরদাঁড়া বেঁকে পড়ছে।'

'তোমরা শুয়ে থাকলে তোমাদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে ওরা ; তোমাদের সত্যাগ্রহ ওরা মানবে না ; ওরা আর স্ট্রাইক করবে না—কাজে যাবে—তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। ওদের চোখ মুখ হাত ঠ্যাং তো মাকড়সার মত হয়ে পড়ছে ইয়াসিন ; মাকড় যাবে মাকড়সার জালের ওপর দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে।'

'আমরা হলাম মাকড়সার জাল ?'

'মাকড়সার জাল ছাড়া আর কি আমরা ? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরের পিত্তি কফ বায়ু ঠিকরে যে আঁশ বেরিয়ে আসে তার ফ্যাকড়া তুমি আমি অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—'

'আর ওরা হল মাকড়সা ?'

'মাকড়সা। ওদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আমাদের। ওদের পেটের থেকে সুতোর মত বেরিয়ে এইছি—' হ্যাচ হ্যাচ করে হাসতে লাগল কালু ওস্তাগর। হেসে মজা পেয়ে একসময় এমনই গয়ের খালাস করতে লাগল যে তার চারদিকটা মাছি নোংরামীতে ঘিনঘিন করতে লাগল।

'সুতোর লালায় লেপটে রইছি ডিম কি বলিস ভূপাল—'

'তাই তো বংছ বিদ্ধি হল ওদের , তুই ঘুমোচ্ছিছ ইয়াসিন ?'

'আরে না—'

'মকবুল কোথায় গেল ?'

'ও চলে গেছে ?'

''সুতীর্থবাবু কোথায় ?'

'ওই যে মড়া গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে—'

'ও থাকবে তো ?'

'কি জানি, ওর ঢং আছে ; ঢঙের মানুষ। কখনো এখানে এসে বসে—কখনো ওখানে গিয়ে শোয়। আকাশ পাতাল ভাবে। ঐ একরকম। ঐ যে আসছে।'

'মকবুল কোথায় গেল ইয়াসিন ?' সুতীর্থ এসে জিজ্ঞেস করল।'

'ও চলে গেছে।'

'যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেল না ?' সুতীর্থ ইয়াসিনের দুটো ছড়ানো ঠ্যাঙের ফাঁকের ভেতরেই এসে যেন বসল। দেখে ইয়াসিন মাথাটা ওপরের দিকে চাড় দিয়ে ঠেলে ঠ্যাং গুটোতে গুটোতে বললে, 'কী আর জানাবে ?'

'আমায় নাকি ফতিমা ডেকেছিল ?'

'কী আর হবে : আপনি তো পিকেটিং করছেন।'

'তা বটে, কিন্তু মকবুল আফশোস করছিল। ও ভেবেছে আমি ওদের সঙ্গে ফ্যানভাত খেতে নারাজ।'

'ওতে কিছু হয় না দাদা। ও কিছু মনে করেনি। ভাত খেতে নারাজ মানে ? ভাত কোথায় পাবে যে আপনি গিয়ে খাবেন ?'

'আমাদের কারুর—ঘরেই ভাত নেই।' বিশ্বম্ভর বললে।

'ফ্যান আছে, নুন আছে।' বললে নেপাল।

'কিন্তু কদ্দিন থাকবে আর ? কিন্তু তাই বলে লুকিয়ে চৌধুরীসাহেবদের খিড়কী দিয়ে ঢুকে কবুল করতে যাবে না বিনোদ সরখেলের মত কেউ।'

'আর বিনদে সরখেল ; ওর পরিবার হাঁচি দিলে ও তো কাপড় নোংরা করে ফেলে—' বললে অনন্তরাম।

শুনে হাসল কেউ কেউ ; হাসি মুখে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিশিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল। বিড়ি যে নেই তা নয়, কারু কারু ট্যাঁকে কিছু কিছু আছে, কিন্তু দেশলাই-এরই বড্ড অভাব। একটা মাত্র দেশলাই হাতে হাতে ঘুরে ফিরছিল। দু-চারটে কাঠি বাকি আছে তার। ফুরিয়ে গেলে দেশলাই পাওয়ার জো নেই—এ মুল্লুকে—খাস কলকাতায়ও সহসা কোনো দোকানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশলাই আনবার জন্যে কলকাতায় যাবে কে ? বাস-ট্রাম আর একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ তল্লাট থেকে ট্রামবাস ধরতে হলেও বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। ফ্যাক্টরির ভেতর অবশ্যি আগুনের অভাব নেই—আছে অঢেল দেশলাইও। কিন্তু কোনো মানেই হয় না। তবুও বিড়ি জ্বলে উঠলো অনেকের।

'আর চারটে কাঠি আছে কিন্তু রসুল।'

'মাত্র চারটে। এই নিয়ে সারা রাত কাটাতে হবে। আর কারু কাছে মাচিস আছে নাকি ধর্মঘটীরা—' হামিদ কলকী বাজিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শুধোল।

‘আছে আমার কাছে—’ অনেক দূর থেকে জানান দিল বিশ্বম্ভর।

একটা মরা গুঁড়ির আড়ালে বসে পেচ্ছাপ করছিল সে। কিন্তু ভালো মানুষ, জল খালাস করবার অবস্থাতেই হামিদের ডাকের জবাব না দিয়ে পারল না।

সুতীর্থ মিহি সুরে ভাবছিল: বিশ্বম্ভরের কাছে থাকবে না? ও তো বিশ্বকেই ভরে রেখেছে। সুতীর্থ অবাক হয়ে ভাবছিল: এ কি ভাবছি আমি, এ কি বোকার মত কথা ভাবছি।

‘খুব মাটির মানুষ বিশ্বম্ভর। কালো-রোগা-ঢ্যাঙাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি সব সময়েই গাল জুড়ে থাকে। আট দশটি ছেলেপুলের বাপ—স্ত্রী আবার পোয়াতি। পরিবারসুদ্ধ সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এত কাচ্চাবাচ্চার মালিকানা অবিশ্যি বিশ্বম্ভরের—কিন্তু এদের সকলেরই জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব যে তার একার নয় সেটা সকলেই প্রায় জানে। জানুক, তাতে বিশ্বম্ভরের এসে যায় না কিছু। সে তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে না; সে জানে, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার শোয়াবসা—রোজ রাতের; ছেলেপুলে অপরের হতে যাবে কি করে? অনেকে তার স্ত্রীকে রাঁড়ি বলে খোঁটা দেয়—বিশ্বম্ভরের মুখের ওপর রাঁড়ি আর ফড়ে বলে জেরবার করে দেয় তাদের দুজনকে। দিকগে, তাতে স্ত্রীর ওপর আসক্তি তার বেড়েছে বই কমেনি; এই তো এই মাঘ ফাল্গুনেই বিশ্বম্ভরের স্ত্রীর হয়ে যাবে একটা কিছু। সুতীর্থ জানে এই সব। তাকিয়ে দেখল বিশ্বম্ভর পেচ্ছাপ করে ফিরে আসছে।

‘আমার কাছে দেশলাই আছে হামিদ—’ হেঁটে আসতে আসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল বিশ্বম্ভর।

‘আহা, এই সব বেচারী মানুষের ভিড়। কি অবিস্মরণীয় এদের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর প্রাণপাত; পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষার খালুয়ের ভেতর ল্যাটামাছের মতন। কোনো সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই।’ সুতীর্থের মনে হল।

‘ক’টা দেশলাই আছে বিশ্বম্ভর?’

‘একটা শুধু।’

‘ক’টা কাঠি হবে?’

‘গুণে দেখতে হয়—’

বিশ্বম্ভর কাঠিগুলো বাঁহাতের চাটির ওপর ঝেড়ে নিয়ে এক এক করে গুনছিল।

'আরে দূর দূর! আন্দাজে বলতে পার না? রেখে দাও—রেখে দাও বাক্সর ভেতর—হিমে মিইয়ে যাবে বিশ্বম্ভর—' চীৎকার করে উঠল অনন্তরাম।

'এই গোটা পঁচিশেক কাঠি হবে হামিদ—' হেসে মাড়ি বের করে বললে বিশ্বম্ভর।

'আচ্ছা বেশ, চটপট ভরে ফেল সব। নাও, এখন দাও বাক্সটা আমাকে।' বললে অনন্তরাম।

'তোমাকে দেব অনন্তরাম?' হামিদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি নির্দেশ আসে না আসে, কি করবে না করবে—এ জীবনে কে'চোমাটি ওগরানো ছাড়ানো ছাড়া আর কিছুই যেন করা যায় না—এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বম্ভর।

'দিয়ে দাও অনন্তরামকে।' ফতোয়া এল হামিদের।

'চট করে দিয়ে দাও অনন্তরামকে, না হলে তুমি লগ্‌গি করেই মাচিসের জান খেয়ে নেবে—' বঙ্কু বললে।

'আর কার কাছে মাচিস আছে?' হাঁক দিল হামিদ।

আর কারু কাছে নেই।

সুতীর্থ বললে, 'এ জানলে আমিই তো কলকাতার থেকে আসবার সময় দু ডজন নিয়ে আসতে পারতুম।'

'ঠিক আছে সুতীর্থবাবু', ইয়াসিন বললে, 'বিলকুল।'

সুতীর্থ বললে, 'তোমরা কি সারা রাত এখানে থাকবে হামিদ?'

'হ্যাঁ।'

'এই খোলা মাঠে?'

'থাকব।'

'সারা রাত থাকবার কি দরকার?

'দরকার নেই অবিশ্যি, আমরা একটু বাড়াবাড়িই করছি। তবে ফ্যাক্টরির কাজ তো সারা রাত চলে। নাইট শিফটে কাজ করবার জন্যে আমাদেরই কেউ কেউ হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে ঝুলে পড়ব কিনা আন্দাজ করে নেবার জন্যেই সারা রাত থাকা দরকার। আমরাই আমাদের নজরবন্দী করে রাখছি।'

'ওঃ—' সুতীর্থ বললে। পকেটের থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে হামিদের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললে, 'বিলিয়ে দাও হামিদ।'

'আপনি চলে যেতে পারেন সুতীর্থবাবু।'

'না। আমি থাকব।'

'পুলিস আজ রাতে আসবে না আর।'

'তা আসবে না হয়তো।'

'আপনি কেন আমাদের খাতায় নাম লেখালেন সুতীর্থবাবু? আপনি তো কুলিকামিন নন—মিস্ত্রি প্লাম্বার নন—'

'আমি খেয়ালী মানুষও নই। অবিশ্যি আমি নাম লেখাই নি। নাম লিখিয়েছে বিশ্বম্ভর, লিখিয়েছ তোমরা সকলেই। আমার আজকাল হাতে খড়ি।'

ঘনশ্যাম (আই এস-সি পাস, যাদবপুরেও কিছুদিন পড়েছে) বললে, এটা সুতীর্থবাবুর তা দেবার সময়। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আপনি তো আমাদের মেসো-পিসে চাচা ফুফো নন, আপনি আমাদের নিজের বীটের লোক আমাদের এখানে বক্তৃতা করতে আসেন বক্তৃতা ফলাও হলে বক্তারা চলে যায়, কিন্তু আপনি এখানে থেকে যান মশাই। কেন থাকেন? আমাদের টানে নয়, নামডাকের জন্যেও নয়, আপনি এখানে থাকলেই স্ট্রাইকটা উতরে যাবে সে ভরসায়ও নয়। এখানে থাকতে খুব ভালো লাগে না আপনার: কেন মিছিমিছি মার খাচ্ছেন নিজের মনের কাছে? কেন ঘুরছেন? কেন ত্রিশঙ্কুর মতন কড়িকাঠের সঙ্গে হাওয়ায় ঝুলছেন—'

কেউ কোন কথা বললে না। কিন্তু সুতীর্থকে তারা হামিদ অনন্তরাম ঘনশ্যাম ইয়াসিনের মাথার ওপরে পাণ্ডা মনে করে নিতে কেউই রাজি ছিল না কিছুতেই। ত্রিশঙ্কুর মানে এরা কেউ কেউ জানে, অনেকেই জানে না।

ওরা ভাবছিল: ত্রিশঙ্কু তো বটেই, এ লোকটা স্পাইও হতে পারে। এ মানুষ স্পাই নয় হয়তো, কিন্তু ঘোড়েলও নয়। একজন বদমাশ শাঁসালো লোকের দরকার আমাদের—এ সব গান্ধীগিরি দিয়ে আমাদের হবে না কিছু।

সুতীর্থ অবিশ্যি গান্ধীধর্মী নয়—বিশেষ কোনো বাঁধা ছক নেই তার, কেবলি জীবনটাকে বুঝে দেখতে চায় যে সুতীর্থ এই ধর্মঘটীরা তারই একটা উপলক্ষ্যে, দার্শনিকতায় বিজ্ঞতর হয়ে উঠলে বস্তুপুঞ্জের এসব অস্পষ্ট বিমূঢ়তাকে যে পায়ে পিষে চলে যাবে সে—হামিদ প্রভৃতি সামান্য মানুষও যেন সুতীর্থের এই চালাকি ধরে ফেলেছে। এই বিরূপ বিমুখ ভিড়ের সামনে বসে—তবুও বসে থাকতে হবে তাকে, বসে থাকতে হবে, শুয়ে থাকতে হবে, মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে, জেগে উঠতে হবে, মরে যেতে হবে। এ না-হলে একজন

হতে পারবে না সে। হামিদ অনন্তরামরা 'হতে পারত' চেষ্টা করছে না, তারা 'হচ্ছে', সুতীর্থের মত সংকল্প করে তারা আবর্তের ভেতর এসে পড়ছে না, ছোট থেকে বড় হোক, অসার হোক নিষ্ফল হোক, সময় যেখানে তাদের এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আজকের এই ধর্মঘটের (কালকের বৃহত্তর বিপ্লবের) সব চেয়ে স্বাভাবিক নায়ক তারা; সমাজের সময়ের যে স্তরে যেরকম-ভাবে লালিত হয়েছে সুতীর্থ তাতে ওরকম নিদারুণ স্বাভাবিকতার তাগিদ নেই তার: আজকের এই ক্ষুদ্র আলোড়ন কিংবা কালকের বড়—বেশি বড় সব রক্ত বিপ্লবের সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে; সে রকম বিপ্লবের সম্পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব অনুভব করছে না সে, সে রক্তোৎসবের সহজ দৈন্য হয়ে দাঁড়াবার মত বিশেষ কোনো প্রেরণা নেই তার, তার বুদ্ধি ও জিনিস সমর্থন করে না। অবিশ্যি বুদ্ধি প্রেরণা সমবেদনা সংকল্প সবই তার, যারা বিপ্লব না ঘটিয়ে পারছে না তাদের জন্যে—মনে মনে; একটা দার্শনিক প্রস্থানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্থূলে বিপ্লব না ঘটিয়েও মানুষের ভালো হতে পারে; জনসাধারণ হয়ে উঠতে পারে সত্যই সফল মহাসাধারণ; বিপ্লবটা শান্তিতে শান্তভাবে পরিচালিত হতে পারে, পারে নাকি? সে রকম হলেই বুদ্ধি স্বপ্ন সংকল্পের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা মিলত সুতীর্থের, নিতান্তই দর্শন প্রস্থানের একটু বেসামাজিক উচ্চভূমি থেকে নেমে শান্ত অথচ অনবনমনীয় সমাজবিপ্লবের স্বাভাবিক কাজে সোজাসুজি হাত দিতে পারত সে; কবি নয় দার্শনিক নয় শুধু আর—অক্লান্ত অপরিমেয় কর্মী হয়ে উঠতে পারত সে।

কিন্তু আজকের অব্যবস্থায় মানুষ—সব মানুষই শুভার্থী মানুষেরাও এখনও খুব স্থূল, ভালো কাজ করতে গিয়েও রিরংসা খুঘু স্বাভাবিক, কল্যাণের জানালা খুলতে গিয়ে জননীকে নিরবচ্ছিন্ন হত্যা করা শোকাবহ বা অপ্রাকৃত মনে হয় না কিছু, সোজা চোরকাঁটা বেছে ফেলবার কাজ যেন: আজকের পৃথিবীর ইচ্ছা ও কর্মের মর্মার্থ তো এই। ইচ্ছা ও কর্মকে লালিত করা নয়, এ পৃথিবীতে চিন্তা ও অনুধ্যান ছাড়া বিশেষ কিছু সে করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজ করতে পারে সে—কিন্তু আরো একশো দেড়শো সুতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে, ঘনশ্যাম, বঙ্কু অনন্তরামদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করবার চেষ্টা করতে পারে সে—যেমন করছে; কিন্তু এ পরিবেশের আশ্চর্য দুর্বোধ্যতা ও প্রতিকূলতার জন্যে নিজের সবচেয়ে

উত্তম জিনিসগুলো দান করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। যে তথ্যকে সে সত্য বলে স্বীকার করে না, যে অনুমানকে ভুল বলে জানে, যে প্রণালীকে সমর্থন করে না—মনকে চোখ ঠার দিয়ে আজকের কালকের আরো পরের ভবিষ্যের একটা অস্পষ্ট কল্যাণের প্রত্যাশায় সেই অস্বীকার্য অপমানবীয় জিনিসগুলো গ্রহণ করেছে সে। এ ছাড়া এ যুগে সকলের সঙ্গে মিলে কাজ করবার উপায় নেই—উপায় নেই আর; কাজ করা ছাড়া পথও নেই এ যুগে; নিজের সত্তা যুক্তিতর্কের চিন্তা অনুশীলনের প্রভাবে অপরদের যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করে (ব্যর্থ সে চেষ্টা) নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বলয়ের ভেতর কাজ করা ছাড়া উপায় নেই—উপায় নেই এ যুগে।

তেইশ

এর পর সুতীর্থের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল : চিন্তা রইল না আর কেমন নিদ্রালু ভাবালু হয়ে পড়ল সে : ওদের একজন হয়ে পড়ার ভেতর বিশেষ কোনো মানে নেই। কি হবে অনন্তরাম হামিদ ঘনশ্যামের মতন হয়ে? মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবহার ও লক্ষের কাছে এরা ও এদের এই প্রাণান্তকর ধর্মঘটের সার্থকতা নিতান্তই স্থূল—ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবুও নানারকম আঘাটার ভেতর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে দৃষ্টি শুদ্ধ করে নেবার জন্যে, জীবন ঠিক করে তৈরি করে নেবার জন্যে। এই দার্শনিক সত্যের জন্যেও—কিন্তু তার চেয়ে বেশী ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণস্থাপনার কেমন যেন একটা অব্যয় উত্তেজনায় এই ধর্মঘট নিয়ে পড়েছে সে। প্রাণ-কল্যাণের সমুদ্র রচনা করতে গিয়ে এখানকার এই ছোট্ট সংগ্রামটুকু তো এক ঝিনুক জল; ঝিনুকটাকে স্বাতীর শিশিরের মত সেই জলে ভরে ফেলতে হবে। সৃষ্টির বড় সময়ের পারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছোট সময়ের দিকে তাকালে পৃথিবীর বড় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিককার প্রাদেশিক ছোট সময়ের ছিটেফোঁটার দিকে চাইলে, ওদের ভেতর একজন হয়ে পড়ার কোনো মানে নেই : কি হবে হামিদ ঘনশ্যাম ইয়াসিন অনন্তরামের মত হয়ে?

কিন্তু তবুও এখানকার এই এক ঝিনুক প্রাণপ্রবাহী জল সংরক্ষণ উৎসারণ

করা দরকার প্রাণকল্যাণের সমুদ্র সৃষ্টি করতে গিয়ে। দরকার? এইসব এক কড়ির ছাঁদার ভেতর থেকে সমুদ্র বেরুবে বুঝি?

'আপনি শুয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু?' হামিদ বললে।

'একেবারে চিত হয়ে মাটির ওপরে যে, একটা চাটাই এনে দিই—'

বঙ্কু বললে।

'তোমার তো সর্দি হয়েছে বঙ্কু—'সুতীর্থ অন্ধকারের ভেতর চোখ বুজে থেকে বললে, 'গলা ভারি হয়েছে তোমার। নাক ফোঁসফোঁস করছে। ক' রাত জাগলে?'

বঙ্কু কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল। সত্যিই সর্দিতে ঠাণ্ডায় সে বড কাবু হয়ে পড়েছিল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু।'

'আকাশের তারা দেখছি।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন হোথা ঐ ক্যাম্পে রেখে আসব আপনাকে পাঁজাকোলা করে—'

'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

'আমাদেরই; ধর্মঘটীদের।'

'না। এইখানেই থাকব আমি।'

'নিমুনিয়া হবে—ঠাণ্ডা লেগে—শিশিরে শুয়ে—'

'সমুদ্রে যার শয্যা, তার আবার শিশিরে ভয়,' দূরের থেকে বললে বঙ্কু। চুপচাপ পড়েছিল। সকলেই—রাত আর একটু থমথমে হলে একজন দুজন করে উঠে চলে যেতে লাগল, কে কোনদিকে যায় অনন্তরাম আর হামিদ কডা নজরে পাহারা দিয়ে দেখছিল।

সুতীর্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আধঘণ্টা পরে দূরে টর্চলাইট দেখা গেল।

'হ্যাঁ পুলিসই আসছে হামিদ', অনন্ত বললে।

'ঘনশ্যাম কোথায়?' হামিদ জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি না তো। এই বঙ্কু! বঙ্কু!'

'অত জোরে ডাকিসনেরে অনন্ত।'

'আমরা কি লম্বা দেব নাকি হামিদ?'

হামিদ মাথা নেড়ে বলে, 'গ্যাঁট হয়ে বসে থাক যে যার জায়গায় আছিস।'

'তারপর ?'

'পেটালে পড়ে পড়ে মার খাবি; গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে যাবি সঙ্গে-চলে, কাঁদুনে গ্যাস যদি ছাড়ে তবে কাঁদবি।—'

'আর গুলি করে যদি –'

তাহলে পিস্তত থাকবি—'

'পিস্তত ?'

'স্ট্রেচার আছে, হাসপাতাল আছে, মরলে আধপোড়া হয়ে গঙ্গা পাবি তো;—মোচলমানকে মাটি দেওয়া হবে; এ সবের জন্যে ভাবনা করিসনে। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'

কর্তৃপক্ষ ও পুলিস গ্যাস-গুলির ধার দিয়েও গেল না। হেসে খেলে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল শুধু, সুতীর্থকেও।

বাকি সবাইকে পুলিশের হেপাজতে চালান দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুখার্জি সুতীর্থকে নিয়ে ফ্যাক্টরির তেতলায় তার খাস কামরায় গিয়ে উঠল।

'আসুন, বসুন, আপনিই তো সুতীর্থবাবু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো কমার্শ্যাল ফার্মে কাজ করেন ?'

'কাজ করতুম—'

'আপনার চাকরী তো বহাল আছে—'

'আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

'নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে আমি নাচার। কিন্তু আজো ফোনে মল্লিক আপনার কথা বলছিলেন—'

কি বলেছিলেন জিজ্ঞেস করতে গেল না সুতীর্থ। কোন ঔৎসুক্য ছিল না তার।

'আপনি অফিস অ্যাটেণ্ড করলেই পুরো মাইনেতে আপনাকে এ কদিনের ছুটি দিতে রাজি। মল্লিক বললেন। আসুন—'

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে সুতীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুখার্জি বললে—'আসুন, নিন, আপনিই বেঙ্গল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সুতীর্থবাবু। সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাক্টরির কি সম্পর্ক সুতীর্থবাবু ?'

'আমি তা জানব কি করে বলুন।'

'ওটা হল কলকাতার এক প্রান্তে, এটা হল আর এক কিনারে। প্রায়

মাইল দশেকের ব্যবধান জুটোর মধ্যে। আপনি হলেন সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন ডিপার্টমেন্টাল হেড—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক সাহেবের—ইয়ে—মার্গ সঙ্গীত ; আবার আপনিই এখানকার কুলিকামিন হাম্বিদ অনন্তরামের গোঁসাই। এ সব দশঘাটের জল এক পীরের ঘাটে কি করে আনলেন দাশগুপ্ত মশাই ?'

'ঢল নেমেছে বলে এক হয়ে গেল সব।'

মুখার্জি একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মল্লিক সাহেব আপনাকে সমীহ করেন কেন জানেন ? আপনার কাজের নিপুণতার জন্যেও বটে, তাছাড়া গভর্নমেন্টের একজন বড় মিনিস্টার আপনার ডাকসাইটে ইয়ার!' মুখার্জি বললে।

'আমার ইয়ার ? না তো কোনো ডাকসাইটে পৃথিবীতে আমার দোস্ত নেই। কোনো মিনিস্টারকে আমি চিনি না ; তাদের কেরানীদেরও কৃপার পাত্র আমি মুখার্জি সাহেব। এগুলো কি ?'

'বোতল। হোয়াইট লেবেল।'

'হোয়াইট লেবেল ? এ সব ডুমুরফুল পেলেন কোথায় আপনি ? এ বাজারে তো এ অপয়াগুলোকে চোখেই দেখা যায় না। দুজনের জন্যে সরঞ্জাম দেখছি—'

'আপনি আর আমি—'

'আমি না—আমি ও সব খাইনে কোনোদিন।'

'এখন নয়—এক্ষুনি নয় সুতীর্থবাবু। গলা শুকিয়ে এলে ভিজিয়ে নেবেন গলা। যদি না শুকোয় নাই বা ভেজালেন। বমি হবে না, বন্দোবস্ত করে দেব। যদি তিতো লাগে, ম্যাজম্যাজ করে, মানুষ কি মেয়েমানুষকেও ছুঁতে যায় ? এ তো হোয়াইট লেবেল শুধু। ভোগের জিনিস আনন্দ দেবে বইকি।'

মুখার্জি বললে, 'দু হপ্তা ধরে এই স্ট্রাইক নিয়ে কুঁদছেন কেন আপনি—'

'বেছে বেছে আপনাদের ফ্যাক্টরির ওপরই যে আমার বিদ্বেষ তা নয় মুখার্জি সাহেব। আমাদের নিজেদের ফার্মেই ধর্মঘট হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হল না।'

কেন ?'

'সেটা পরে হবে। দৈবচক্রে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি—'

'কবে বলুন তো ?'

দিন পনেরো ষোল আগে।'

'সাহেবী পোশাক?'

'হ্যাঁ, বেশ জাঁকালো স্যুট পরে।'

'মাথায় হ্যাট ছিল তো? বলুন তারপর' মুখার্জি বললে।

সুতীর্থ সিগারেটটা পুরোপুরি না খেয়েই অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

'একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ করেননি সুতীর্থবাবু।'

'কি, বলুন তো।'

'আপনি আমারি মতন লম্বা।'

সুতীর্থ আপাদমস্তক মুখার্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ঘাড়েগর্দানে একটু বেখাপ্পা হয়েও আপনি লম্বা বইকি মুখার্জিসাহেব—খুব লম্বা। মুখার্জি সাহেব—খুব লম্বা।'

'আমি সব সময়েই সাহেবি পোশাকে চলিফিরি। আপনি হ্যাটকোট পরে যখন হাঁটে চলেন পেছন থেকে ঠিক আমারই মতন দেখায় আপনাকে।'

'কবে দেখলেন?'

'মুখের ছাঁদও আপনার কতকটা আমার মত। কিন্তু তাকালেই পার্থক্য ধরা প'ড়ে। কারু মতে আপনার মুখ বেশি সুন্দর, আমার বেশি পুরুষোচিত। এই দেখুন আমার ফোটো।'

সুতীর্থ ভোটোর দিকে তাকাল না। 'আপনাকেই তো দেখছি।'

'নানা মানুষের নানারকম মত থাকে বইকি। কিন্তু সে যাকগে আসল কথা হচ্ছে সাহেবী পোশাকে মেজাজী চালে চললে আপনাকে যদি কেউ মুখার্জি সাহেব বলে ভুল করে থাকে, তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না। নিন, আসুন, এইবারে শুরু করা যাক।' মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুখার্জি।

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না খাই যে তা নয়, কিন্তু খোঁয়াড়ি ভেঙে খাই নেই আজ আর।'

'নেই আজ? সাধব না তবে। আমি যদি একা পেরে না উঠি দয়া করে সাহায্য করবেন এই ভরসায় থাকব।'

বোতল ভেঙে খানিকটা মদ ঢেলে নিল সাহেব, খেল না, রেখে দিল এক পাশে সরিয়ে। 'সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন অফিসার আপনি। এখানে এসে মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে মিশে তাদের মড়ার ফ্যান খেয়ে বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচিয়ে স্ট্রাইক করছেন আপনি। লোকে শুনলে বলবে কি!'

সিগারেটের খোলা টিনটা টেবলের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল। একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আমি ওদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াতে এটার খুব জোর বেড়েছে মনে করেন?'

'যারা সব সময়েই নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলতে চায় সে সব বিজ্ঞ ভদ্রলোকদের চারদিকে বসিয়ে বেশ ঘোড়া ঘোড়া খেলা দেখাচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনার মাথা আছে—আবেগ আছে—আপনি ঝামেলা যে না বাধাতে পারেন তা নয়।'

'দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ দেখছেন? ফ্যাক্টরির ক্ষতি হবে মনে করছেন?'

'ক্ষতি! ফ্যাক্টরির জীবনমরণ নির্ভর করছে এই স্ট্রাইকের মীমাংসার ওপর।'

মুখার্জি বললে, 'এ সব গুহ্য তত্ত্ব আপনার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনি তো আমাদের লোক। আপনার কাছে রেখে ঢেকে কি আর লাভ।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে মুখার্জি বললে, 'অনন্তরাম, হামিদ ইয়াসিনও জানে।'

'কি করে?'

'ওরা সব জানে।'

শুনে সুতীর্থ ভরসা পেল খানিকটা, দেশলাইয়ে সিগারেটটা জ্বেলে নিল।

'ঘুষ কবুল করছি, কিন্তু বাগে আনতে পারছি না কাউকে?

'কাকে চান বাগে আনতে?'

মুখার্জি মদের গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে না খেয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'একে একে সকলকেই। আপনাকেও। আপনাকেই প্রথম। কান টানলে তবে তো মাথাশুদ্ধু চলে আসবে। মারপিট করব না, মন মেজাজ ভেঙে দিতে যাব না। চেষ্টা করলে দুটোই পারি; কিন্তু সেরকমভাবে কতগুলো ন্যাতন্যাতে মানুষকে দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোও যা অন্ধকার রাতে একটা বালিশকে ধানজমি ভেবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাই। সে সব করে কে আর সোনার সন্তানদের বাপদাদা হতে পেরেছে—'

এবারে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলে মুখার্জি বললে, 'তাছাড়া আধুনিক যুগের মানুষ মানে মানুষবাদ আমার ভালো লেগেছে। ওরাও মানুষ। তাই তো।'

'কি করবেন তাহলে?'

'ওদের বাইশ দফা দাবি আপনিই বেঁধে ঠিক করে দিয়েছিলেন?'

'ওদের সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে খসড়া তৈরি করেছি।'

'ওদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শীলমোহর সেঁটে রেখে দিন।'

'তাহলে কি করে স্ট্রাইক ভাঙে?'

'ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো আমরা মেটাব, কিন্তু অনেক দাবিই অন্যায়।'

'এ আমরা মনে করি না। আমরা ভালো করে বিচার-বিবেচনা করেই দাবিগুলো ঠিক করেছি।'

'কিন্তু বাইশটা দাবি থাকলে যদি এগারোটা মেটে সেই কি যথেষ্ট নয়?'

সুতীর্থ বললে, 'আখখুটে ছেলের বায়না হলে তা হত, আমি বুঝি মুখার্জি; কিন্তু এতো তা নয়, নুন-ভাতের—বাঁচা মরার জিনিস—'

'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন সুতীর্থবাবু?'

সুতীর্থ তৎ নগদ কোনো উত্তর দিল না।

মুখার্জি কিছুক্ষণ চুরুট টেনে তার পরে বললে, 'কোন পথে যাব আপনি দয়া করে নির্দেশ দেবেন নাকি? ওদের যারা মা গোঁসাই তারাই আমাদের গুরু গোঁসাই। তাই বলছি একটা পথ বলুন।'

'পথ চান, মেনে নিন দাবিগুলো।'

'কটা?'

'সব কটাই।'

'এই মন নিয়ে আপনি পলিটিকস করছেন সুতীর্থবাবু?

'আমি পলিটিকসের বাইরে।'

'তাই বুঝি? খিড়কীর ছ্যাঁচা দিয়ে একেবারে সদরে প্রবেশ করেও এই কথা? হেঃ হেঃ হেঃ—' মুখার্জি পাইপ বের করে বললে, 'অগত্যা এটা আপনার না বুঝলে চলবে না যে কিছু খেতে হলে কিছু ছেড়ে দিতে হয়। কমপ্রোমাইজ ছাড়া পলিটিকস ইকনমিকস সামাজিক জীবন কিছুই চলে না।'

'একথা আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি মুখার্জি। কিন্তু ঐ বাইশটে দফাই তো কমপ্রোমাইজ—দাবিগুলোকে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠাতে পারতুম।'

পঞ্চাশের কোঠায়—একশোর কোঠায়—মানে ইয়াসিন হামিদ অনন্তরাম বিশ্বম্ভর—সকলের জন্যেই এক একটা বাগানবাড়ি করে দিতে হবে, সাতটা করে বাঁদী রেখে দিতে হবে, চোদ্দটা করে বেশ ফর্সা রায়বেঁশে দাবনা—ভদ্দরঘরের থেকে যোগাড় করে—'

'আমি উঠলুম।'

'শুনুন আরো কথা আছে।'

চব্বিশ

মুখার্জিসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত পেছনে বেঁধে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'শীত পড়েছে।'

ফিরে এসে গেলাসে ভর্তি করে মদ ঢেলে নিয়ে এক-আধ চুমুক খেয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল গেলাসটা।

'উঠছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন ভাবছিলেন ? স্ট্রাইকের চাঁইরা তো সব চলে গেছে। এখন একা গিয়ে মাঠে শুয়ে থেকে কি লাভ ?'

'না শুলে ঘুমোব কি করে ?'

'এইখানে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গয়ানাথ মালোকে আপনি চেনেন ?'

শুনে সুতীর্থ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'গয়ানাথ মালোর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি বইকি।' সুতীর্থ আর একটা সিগারেট বার করে নিল টিনের থেকে।

'গয়ানাথ মালো খুন হয়ে গেছে ?' মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে। তার খুনের খবর তো আমাকে দিয়ে যায় নি।'

'মানুষটাকে চিনতেন তো আপনি ?'

'ঘটনাচক্রে চেনা হয়ে গিয়েছিল।'

'শুনে সুখী হলুম যে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। আপনি কি করে গয়ানাথকে চিনলেন ? ওরা—মানে ধর্মঘটীরা তো মনে করে যে, সে খুন হয়েছে —আমরাই করেছি তাকে খুন।'

সুতীর্থ চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

'গয়ানাথের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা কার হয়েছিল ?'

কোনো কথা বললে না সুতীর্থ ; কথা বলার মাছি হয়ে মাকড়সার জালের দিকে উড়ে গেলেই যে সে আটকে পড়বে, কিংবা আটকে পড়লেই যে আকাশ

ভেঙে পড়বে মাথার ওপর—তা কিছু নয়;—স্বতীর্থ এমনিই কথা বলবে না এখন আর। কথা যা বলার তা বলাও হয়ে গেছে; কথা বাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই আর।

'বলুন।'

'বলবার কিছু নেই আমার।'

মিঃ মুখার্জি পায়চারী করতে করতে কথা বলছিল; চেয়ারে এসে বসে বললেন, 'কোর্টে; তো জবাব না দিয়ে পারবেন না।'

'আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে স্বতীর্থবাবু। জলের মত পরিষ্কার সব। আজ থেকে ষোলো দিন আগে আপনি একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে হ্যাট কোট পরে একেবারে এই এলাকায় এসে হাজির হয়েছিলেন।'

স্বতীর্থ শুনছিল।

'কেন এসেছিলেন তাও জানি। তখন বেলা চারটে হবে। আপনি এসেছিলেন হামিদ আর সত্যকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। হামিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, আমাদের ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক চলেছে। আপনার কাছে কিছু টাকার সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল হামিদ। সে ভাবতেও পারে নি যে, গায়েপড়ে এরকমভাবে সাহায্য করতে আসবেন ওদের। আপনি একেবারে দড়িটড়ি ছিঁড়ে বাছুরদের ভেতর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে স্ট্রাইক করবেন—এতে ওরা নিশপিশ নিশপিশ করছিল।' বলতে বলতে মুখার্জি উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর পায়চারী করতে করতে বললে, 'হামিদের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'অনেক দিনের।'

'কি করে হল—আলাপ?'

'হামিদ কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানদার আলতাফের ছেলে। সে দোকানে প্রায়ই যেতুম আমি বই নিতে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা সব; হামিদ তখন ছোট ছিল।'

'আমাদের ফ্যাক্টরিতে যে ও কাজ করছে তা জানতেন?'

'শুনেছিলুম ভালো মিস্ত্রি হয়েছে। কিন্তু কোথায় কাজ করছে জানা ছিল না আমার। অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। আমি কোনো খোঁজখবর নিতে পারিনি।'

'আপনি যে সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করছেন কি করে জানল হামিদ?'

'অনেকদিন আগে বাসে দেখা হয়ে গিয়েছিল একবার। তখন বলেছিলুম।'

মুখার্জি টেবিলে ফিরে এসে এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ফেলে দেরাজ থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল। ইজিচেয়ারে বসে বললে, 'আপনি যে আমাকে এ সব কথা বলছেন এ কোনো কোর্টেই আপনার প্রামাণ্য বক্তব্য বলে স্বীকৃত হবে না। কোনো সাক্ষীসাবুদ তো —কেউই নেই; আপনি আর আমি শুধু। মনে হয়, অবিশ্যি যে জেরা করছি আমি ব্যারিস্টারের মত, আবহটা হাইকোর্টের মতই। কিন্তু হাতে-কলমে নথিপত্রে সেঁধুচ্ছে না কিছুই। আমার কাছে বলছেন একরকম; যদি বলেন গিয়ে আরেক রকম আর এক জায়গায়, বাধা দেবার কেউ থাকবে না তা হলে—কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে তার কোনো সাধু প্রমাণ থাকবে না।'

'সত্য কথা ছাড়া আমি বলি না কিছু।'

'মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন হলে বরং চুপ করে থাকেন। তা আমি জানি। সে যা হোক, এখানে আপনার দ্বিধার কোনো কারণ নেই। আপনার কোনো কথাই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার মতলব নেই আমার। আপনি আপনার খাঁটি গল্পটা পরিষ্কার করে বলে গেলেই আমি খালাস—আপনিও। তারপর ঘুমোবেন গিয়ে পাশের ঘরে।'

'পাশের ঘরে কেন?'

'কোথায় যাবেন তবে এত রাতে?'

'বাড়ি গিয়েই ঘুমোব।'

'কোথায় আপনার বাড়ি? বালিগঞ্জে। ওঃ, আমি নিজেই গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব আপনাকে।'

মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন ষোলো আগে আপনি বিকেল চারটে নাগাদ—এ পাড়ায় এসেছিলেন?'

'এসেছিলুম।'

'হামিদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কিছু টাকা দেবেন ভেবেছিলেন?'

'ভেবেছিলুম। তাকে শুধু নয়, সমস্ত ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার জন্যে—'

'স্ট্রাইকটা যাতে খুব জোর চলে?'

'সেই জন্যেই তো টাকা দিলুম, নিজে এলুম—'

মুখার্জি বললে, 'এ জন্যে কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও ছাড়েন নি আপনি। মল্লিক সাহেবের দেরাজ ভেঙে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন—'

'ভেঙে নয়, তার দেরাজ খোলাই ছিল—'

'খোলা ছিল? না, চাবি দিয়ে খুলেছিলেন?'

'খোলা ছিল।'

'দেরাজ খুলে সোদপুরে গিয়েছিলেন তিনি আশ্রম দেখতে?'

'তিনি কাছেই বসেছিলেন। আমি তাকে দেখিয়েই বলেছিলুম যে আমার মাইনে—দু দিন বাকি ছিল মাস শেষ হতে—দু দিন আগেই নিচ্ছি। স্যালারি বিল তৈরি হয়েছিল; আমি তাতে সই করে টাকা নিয়েছিলুম—'

'উনি রাজি হলেন?'

'তক্ষুনি, এক কথায়।'

'মানে গররাজি হলেন না।'

'স্যালারি বিলে সই করে উনিই আমাকে টাকা নিতে বললেন।'

'আপনার মাইনে তিনশো টাকা তো ছিল—'

'পাঁচশো টাকা হয়েছে গত মাস থেকে—'

'মল্লিক আমাদের কাছে বলেছেন যে, আপনি টাকা চুরি করেছেন ওর দেরাজ থেকে—'

'চোর তো ও নিজেই।'

'আমিও জোচ্চোর নিশ্চয়ই?'

মুখার্জি সাহেব টেবিলের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিল। নিবে গিয়েছিল, চুরুটের মুখে ছাই জমে গেছে; টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'চারটে নাগাদ এদিকে এলেন। পরনে অফিসের স্যুট—স্যামুয়েল ফিটজের বাড়ির!'

সুতীর্থ একটা মশা তাড়িয়ে বললে, 'একরকম চীনে ধূপ দিয়ে মাঝে মাঝে মশা মেরেছি আমরা। আজকাল নানা রকম স্প্রে বেরিয়েছে। এ ঘরে মশা নেই বললেই হয়, তবে একেবারেই যে নেই তা নয়।'

'সেদিন বিকেলবেলাই দিকবিদিক অন্ধকার হয়েছিল। সমস্ত আকাশ ছিল মেঘে ভরে; অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল—একনাগাড়ে। পথঘাট বেশ পেছল হয়েছিল।'

বেশ তো বলে যাচ্ছে মুখারজি। কী করে বলছে? কোথায় ছিল সে

সেদিন? সুতীর্থের খটকায় ঘোরটা কেটে উঠছিল না। অবাক হয়ে সে একবার তাকাল, কিন্তু হতবাক হল না। কিন্তু তবুও বললে না কিছু—বলবার ছিল না কিছু তার; মুখার্জি তো নিজেই সাফ কথা বলে যাচ্ছে।

'নিন, এইবার আসুন।' আর একটা বোতল ভাঙল মুখার্জি।

'আর একদিন এসে খেয়ে যাব—'

মুখার্জি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললে, 'কথা রইল তা হলে, মনে যেন থাকে।' গেলাসে একটু ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললে, 'আপনি সেই মেঘলা অন্ধকারে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর পেছল পথ ভেঙে যাচ্ছিলেন হামিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে। ফ্যাক্টরিটা বন্ধ ছিল সেদিন। এখন চলছে দ্বিতীয় দফার স্ট্রাইক দশ দিন ধরে তখন চলছিল প্রথম দফার ধর্মঘট; ধর্মঘটীদের সঙ্গে আমাদের মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল প্রায়। স্ট্রাইকাররা কাজেও এসেছিল শেষ পর্যন্ত কাজ চলেও ছিল দু-তিন দিন। কিন্তু আপনার নির্দেশে এই দফার ধর্মঘটটা শুরু হল।'

মুখার্জি গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু সেদিন হামিদের দেখা পান নি আপনি। ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল, হামিদ চলে গেছল মেটেবুরুজে নাকি খিদিরপুরে—দু জায়গায়ই ও রাঁড় আছে।'

'রাঁড়?'

'ও তো সিফিলিসের রুগী: সিফিলিস হয়, ইনজেকশন নেয়। সেই জন্যেই তো ওদের এত ধর্মঘটের ঘটা। বাজারের স্ত্রীলোকদের ধর্মরক্ষা করছে ওরা, তারা ধর্মপুত্র দিচ্ছে, সিফিলিসের ডাক্তারকে দিয়ে সে সব সারিয়ে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে ধর্মঘট; ঘুরছে ধর্মচক্র।'

মুখার্জি চুরুট জ্বালিয়ে নিল।

'মালিকের গলা টিপে ধর্মের নামে এই যে টাকা আদায় করে নেওয়া একেই বলে ধর্মঘট—'

মুখার্জির মুখে কোনো হাসি নেই, বিষও নেই। সংকল্প আঁটা হচ্ছে, আঁটা হচ্ছে, ফেঁসে যাচ্ছে এমনিই একটা ভাব তার মাথার ভেতর খুব কেজো বটে; কিন্তু চোখে মুখে কোনো বাষ্প নেই সে সবের, কোনো জঞ্জাল নেই।

'হামিদের দেখা না পেয়ে আপনি পেছল পথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিলেন।'

'চলেছিলুম বটে, কাউকে হাতের কাছে পাবার জন্যে।

'কিন্তু জনমানব কোনোদিকেই কেউ ছিল না। দুচারজন মজুর মিস্ত্রি অবিশ্যি তক্কে তক্কে ছিল আমাকে খুন করবার জন্যে নয় ঠিক—তবে বাগে পেয়ে একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে। এদের মধ্যে গয়ানাথ মালোই ছিল সবচেয়ে বেশী কাপ্তেন। দেখতে ভিজে বেড়ালের মত, বেঁটে ঠুঁটো লিকলিকে; হাতে পায়ে মাথায় গিজগিজ করছে ভালুকের মত চুল, মাংস নেই, হাড্ডি নেই, রক্ত নেই, দাঁতের মাড়ি অবধি নেই; চামড়া ফুঁড়ে রাশি রাশি যেন সাদা শনের জঙ্গল বেরিয়েছে। ময়মনসিং-এর ম্যাস্তা ক্ষেতের ভূত।'

'শুনেছি গয়ানাথ মালো—'

'ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল—সাত বছর ধরে ম্যালেরিয়া। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে মানুষ এ রকম ভোম হয়ে যায়! ওকে দিনের বেলা দেখলেও আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কেমন যেন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকত খিড়কির পুকুরের উদবেড়ালের মত; হ্যাঁচকা চোখে পড়ে গেলেই সেদিনটা বেশ শুভে লাভে কেটে যেত দাদা—আঁদাড় পাঁদাড় তুকতাক দিয়ে জেরবার করার মতলব মশাই চব্বিশটা ঘণ্টা।'

মুখার্জি চুরুটের মুখে ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর চুরুটটা; টেবিলের কিনারে এসে দাঁড়াল।

সুতীর্থ বললে, 'যদি বলি গয়ানাথ আপনাদের ফ্যাক্টরিরই তৈরি জিনিস—আপনাদের কমটাটকা মাল—তা হলে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু তবুও ওর চেহারা ছাপিয়েই আপনাদের ফ্যাক্টরির গালামোহর তৈরি করা উচিত; আমি যদি এখানে কাজ করতুম এই মোহরই বুকে লটকে ফিরতুম—'

'আপনাদের ফার্মের কি মোহর?'

'এইটেই। এই সব কারখানা ডক কুলি মজুর নিয়ে যে পৃথিবী সেটার হুণ্ডি হ্যাণ্ডনোট হ্যাণ্ডবিলের ফাঁদলে আঁটবার মত মোহর এ ছাড়া আর নেই।'

'সেই মেঘলা অন্ধকারের ভেতর পেছল পথে বেশ উঁটের মাথায় হেঁটে চলেছিলেন আপনি। এ পাড়ার যে কেউ তখন আপনাকে দেখলেই মনে করত মুখার্জি সাহেব চলেছেন। গয়ানাথ মালো আপনার পেছনে ছিল, হিসেব আছে আপনার?'

'বাসিমুখে হেঁটে চলেছিলুম মনে আছে আমার। গয়ানাথ পেছনে ছিল?'

'গয়ানাথ মালো চলছিল আপনাকে খুন করতে—ভেবেছিল মুখার্জি সাহেবকে বানাতে চলেছে। আর একটু হলেই হয়ে গিছল—'

সুতীর্থ বললে, 'কেমন বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলুম সেদিন।'

'কি রকম?'

'মনে হচ্ছিল আমি চলেছি গয়ানাথ পেছনে পেছনে আসছে আমার—আর উয়ের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের আর বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে চৌধুরী ফ্যাক্টরির রামছাগলটা।'

মুখার্জি বসেছিল। চুরুটে টান দেওয়া হয় নি শীগগির। এইবারে টান দিয়ে দিয়ে চুরুটের মুখে আগুনের ফুলকি বার করে বেশ একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমেজ লাগিয়ে বললে, 'গয়ানাথ সাঁ করে আপনাকে ছোরা মারতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের একটা খাদের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে সে ছোরা তার নিজের পেটের ভেতর সাঁধল কি করে?' মুখার্জি একটা ঝাড়াঝাপটা উত্তর চেয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল।'

'পেটে সেঁধেছিল?'

'পেটে না কলজের না হৃৎপিণ্ডে; কোথায় সেঁধেছিল সুতীর্থবাবু? আপনিই তো সবচেয়ে ভালো করে জানেন—'

'রাত হয়ে গেছে মুখার্জি সাহেব—'

'আপনি তো ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন। আপনাব কোট শার্ট টাই রক্তে ভিজে গিয়েছিল সব।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে আন্দাজ করছিল। গয়ানাথ মালোর খুনের দায়িত্ব তার ঘাড়েই চাপাবার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট; এ চেষ্টা আইনেও টিঁকবে হয়তো। টিঁকুক—যদি টেঁকে। কিন্তু সে তো খুন করেনি।

'গয়ানাথ মালোকে আমি দেখিনি কোন দিন—নামও শুনিনি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক দৌড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে আমার সামনে একটা খাদের ভেতর পড়ে গেল। এমনই অদ্ভুত বেকায়দার পড়েছিল যে, ওর হাতের ছোরাটা ঘ্যাস-ঘ্যাস করে ঢুকে গেল ওর পেটের ভেতর—'

'পেটের ভেতর: বুকে নয়?'

'শরীরের নীচের দিকে ঢুকেছিল। কিন্তু লোকটার খুব বাহাদুরী বলতে হবে। আমাকে এগোতে দেখেই ছোরাটা সে অসাধ্যসাধনে টেনে বের করল।'

'টেনে বের করল? চোখে দেখেছিলেন?'

'তাই তো মনে হল।'

'ছোরাকে পেটে ঢুকতেও দেখেছিলেন আপনি?'

'দেখেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'আর কি দেখেছিলেন ?' মুখার্জি হাসতে হাসতে বললে।

'আমাকে বিশ্বাস করুন আপনি—আমি যা দেখেছি তাই বলছি।'

'চর্মচক্ষে দেখেছিলেন সুতীর্থবাবু ? পেট থেকে ছোরা খসিয়ে আপনাকে মারবার জন্যে রুখে এল বুঝি ?' মুখার্জি ঘাড় হেঁট করে হেসে চুরুটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমাকে রোখেনি। কি করে রুখবে ও ? তবে চেয়েছিল তাই। ও আমাকে মুখার্জি সাহেব কিংবা তার দলের কোনো ত্যাঁদড় মনে করেছিল হয়তো কিন্তু ওর নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল। আমি যখন ওকে কোলে তুলে নিলুম—'

'কেন ? কোলে নিলেন কেন ?'

'কোথাও ডাক্তার হাসপাতাল রেডক্রশ টেলিফোন—যা হোক কাছাকাছি কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তখন ও ছটফট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি তো এই ফ্যাক্টরির কেউ নন—' বললুম, 'না তো—আমি এ পাড়ার লোক না', বললে, 'আমার নাম গয়ানাথ মালো, যদি দয়া করে সত্যকিঙ্করের কাছে আমার কথা বলেন, আমার ছেলেপুলে পরিবারকে যদি দয়া করে আগলে থাকতে বলেন। আমাকে বললে, অনেক দয়া আপনার, আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম ওদের সব—'

'ওর পরিবারকে আপনার হাতে দেওয়া হল ?'

'সত্যকিঙ্কর কে ?'

'জেলে আছে।'

গয়ানাথ মালো কথা বলতে পারল না আর। কাৎরাতে লাগল। আমি তাকে খুব আলগোছে আগলে চলেছিলুম। সমস্ত জামাকাপড় আমার রক্তে ভিজে চটচট করছিল। একটা জনপ্রাণী দেখলুম না কোথাও।'

'না দেখে ভালোই হয়েছিল।'

'আর এগোতেও পারা গেল না। মানুষটা মরছিল—ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল। আমি তাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখলুম। তখনই সে মরে গেল। আমার কোলে থাকতেই মরেছে বোধ করি।'

'তারপর ?'

'এ খবর আমি দেব—কে বিশ্বাস করবে—যে মরেছে সে তো মরেই গেছে—

পরে এসে এক সময় তা পরিবারের জন্তে ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি কলকাতার দিকে ফিরে গেলুম।'

'যদি বলা যায়, গয়ানাথ মালোকে আপনি খুন করেছেন!'

'তা বলা যেতে পারে অবিশ্যি। মোকদ্দমা সাজালে পেরে ওঠা কঠিন আমার পক্ষে।'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত প্রমাণ সবই আমার কাছে রয়েছে। আপনার কোট নেকটাই জুতো রক্তে কাঁই কাঁই করছে সব। সবই আমাদের কাছে। সবই আপনার নিজের জিনিস। সবই গয়ানাথ মালোর রক্ত। অস্বীকার করবেন আপনি?'

'এখন তো অনেক রাত হয়ে গেল।'

'কিন্তু খুনের দায়ে পড়েছেন যে।'

'গয়ানাথ মালোকে আমি খুন করিনি!' সুতীর্থ বললে, 'সে তো নিজের হাতেই নিজে মরেছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আপনাকে?' মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারী করতে করতে বললে, 'বড় জঞ্জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন মশাই—'

'কোট টাই সবই আমার। কিন্তু রক্ত যে গয়ানাথ মালোর তার প্রমাণ কি?'

মুখার্জি হে হে হে হে করে হেসে চুরুট জ্বালাল। 'কার রক্ত তা হলে?'

'যে কোনো জীবিত মানুষের।'

'তা হলেও তো ব্যাপারটা রাহাজানি।'

'আমার নিজের গায়ের রক্ত।'

'নিজের গায়ের?' কিন্তু সেজন্তে এখন যদি নিজেকে কেটে ছিঁড়ে ফেলেন তা হলে ডাক্তারী পরীক্ষায় টিঁকবে কি? নাকি আগেই শরীরে ছুরি মেরে ঠিক করেছিলেন? তাও টিঁকবে না।'

'উঠি এখন।'

'বসুন। আপনার কোট টাই সবই গয়ানাথ মালোর লাসটার কাছে পড়েছিল। আমরা এসে দেখলুম সব। যাদের দেখবার দরকার একে একে সকলেই দেখেছি। অনেক ফোটো উঠে গেছে—প্লেট আছে সব আমাদের কাছে।'

সুতীর্থ বললে, 'ফোটোগ্রাফের প্লেট কি মানুষকে খুনী বানায়। সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তা বানাতে পারে—আইনের চোখে। আমার নিজের চোখে তো আমি খুনী নই।'

'চোখ তো আইনেরই। মানুষ কে? আইনের পরজায়। মানুষের কোনো চোখ নেই।' মুখার্জি চুরুট টানতে টানতে বললে।

চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কোনো খুনী বলেছে কোনোদিন যে সে খুন করেছে? আপনি খুন করে কবুল করবেন?'

'খুন করে এতদিন রেহাই পেলুম কি করে আমি, সাহেব?'

'আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি এ কেসটা।'

'কি মতলবে?'

'আপনি এসব ছেড়ে চলে যান। মল্লিক সাহেবের ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে গিয়ে বসুন। যা নিয়ে ছিলেন চিরদিন তারই চর্চা করুন গে যান। আমরা আপনাকে বলব না কিছু আর।'

সুতীর্থ কথা ভাবছিল, কিন্তু কথা ভাবতে গিয়ে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছিল শুধু কোনো মীমাংসা হচ্ছিল না; সুতীর্থ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে, কিন্তু গয়ানাথ মালোকে তো আমি খুন করিনি।'

'আমরা তা জানি। আপনি নিজেও বলেছেন, অন্য লোকের কাছ থেকেও শুনেছি আপনি মারেন নি।'

'কে বললে? কেউ তো সেখানে ছিল না।'

'ছিল, আপনি দেখেন নি। বঙ্কুকে চেনেন?'

'বঙ্কু তো ধর্মঘটীদের সর্দার—।'

মুখারজি হাঁটতে হাঁটতে ট্রাউজারের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বার করে দুটো পিল ঢেলে নিয়ে বললে, 'সর্দারও বটে, আমাদের পোদ্দারও বটে। ও যাতে সর্দার হতে পারে এই কড়ারে ওকে আমাদের দালাল করেছি। বঙ্কু সেদিন গয়ানাথ মালোকে পাহারা দিচ্ছিল। গয়ানাথের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনে নিয়েছিল যে, আমাকে খুন করার তক্কে আছে সে। ছোরা ছিল না মালোর। আমরা বঙ্কুকে বললুম তকে তকে থাকতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কিন্তু আপনি এসে গয়াসুরটিকে নিকেশ করে যা সাজিয়ে দিলেন ব্যাপারটা ওরকম করেও বিছানা সাজিয়ে বসে থাকে নতুন বউ।'

মুখার্জি বললে, 'মড়াটার গায়ের ওপর আপনার কোট টাই জুতো পড়ে রইল, আপনি চলে গেলেন কলকাতায়—'

সুতীর্থ দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনাদের মতে এটা বেকুবি।'

'আমাদের কোনো মতটত নেই।' পিল দুটো সোডা দিয়ে গিলে ফেলল মুখার্জি। খানিকটা সোডায় মদে মিশিয়ে গেলাসটা সরিয়ে রাখল।

'কেমন যেন নিশির ডাকে হেঁটে চলেছিলুম।'

'কেউ কি ওরকমভাবে চলে? চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও চলে?'

'সচরাচর চলে না।'

'তবে কেন চলেছিলেন আপনি?'

'গয়ানাথকে কে খুন করেছে?'

'আপনি।'

সুতীর্থ হেসে বললে, 'গয়ানাথের ভূত যদি উঠে এসে আপনাকে বলে যে, আমি তাকে মেরেছি তা হলে বিশ্বাস করবেন আপনি? আপনি তো জানেন আমি গয়ানাথকে মারি নি, কে খুন করেছে তাও জানেন আপনি।'

সুতীর্থ যখন কথা বলছিল মুখার্জি জল খাচ্ছিল। জলের গেলাসটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কিন্তু আইন বলছে সুতীর্থ গুপ্তের জামা জুতো রক্তে ভিজে ক্বাথ হয়ে গয়ারামের লাসের ওপর পড়েছিল। কি বলবেন আইনকে আপনি?'

'কিছু বলবার নেই আমার।'

'আমাদেরও বলবার নেই কিছু। যা বলবার গয়ানাথ এসে বলবে।' টেবিলে ঠাণ্ডা জল ছিল কুঁজোর ভেতর। খেতে ইচ্ছে করছিল সুতীর্থের মুখার্জিরও তেষ্টা পেয়েছিল; জল। কুঁজোর থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল সুতীর্থ।

মুখার্জি বললে, 'ভুল সকলেরই হয়। শয়তানের হয় না অবিশ্যি। কিন্তু জামা জুতো লাস সব ছত্রখান করে ফেলে গেলেন এত ভুল আপনার?'

সুতীর্থ জলের গেলাসটা শেষ করে মেঝের ওপর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললে, 'অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিশিতে পাওয়া রোগ ছিল। এ কয় বছর ভালো ছিলুম। রোগটা আবার ফিরে আসছে মনে হচ্ছে। গয়ানাথ যেদিন মারা যায় তার মৃত্যু অবদি হুঁস ছিল আমার তার মরবার পর কি করেছি না

করেছি কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই মনে করতে পারছি না। অনেক ট্রাম বাস বদলে—অনেকবার ঠিকানা ভুল করে খুব বেশি রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলুম—'

'তা হবে' মুখার্জি বললে, 'সব কিছুরই সব রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবগুলোই কি আর আইন আদালতে টেঁকে। শাশুড়ীর কাছে রামকানাইয়ের বায়নাও টেঁকে—রামকানাই তার জামাই বলে। কিন্তু আদালত কার শাশুড়ী?'

ভর্তি গেলাসটা পড়েছিল টেবিলে; মদটা খেয়ে নিল মুখার্জি।

'বঙ্কু আপনাদের স্পাই?'

'এ কথা বলে বেড়াবার কোনো অনুমতি নেই। তবে আপনাকে বলা যেতে পারে আপনি আমাদের হাতের মুঠোর ভেতর এবার। ঘনশ্যামও আমাদের স্পাই।'

'ঘনশ্যামও?' সুতীর্থ একটু চমকে উঠল। 'আর কে কে?'

'আরো আছে কেউ কেউ।'

'হামিদ?'

'না হামিদ নয়।'

সুতীর্থ বল্লে, 'আমি তাহলে উঠি এবার—'

'কলকাতায় যাবেন?'

'হ্যাঁ। অনেক রাত হয়েছে—'

'চলুন, গাড়ি ঠিক আছে। আমারও একটু যাবার দরকার আছে ওদিকে।'

'এত রাতে?'

'আমাদের রাত বিরেত নেই।'

মোটরে উঠে সুতীর্থ বললে, 'আমার জামাজুতোর ব্যাপার আপনি একাই জানেন শুধু?'

'বঙ্কু জানে। সে তো কাছেই ছিল।'

'আর কেউ?'

'না।'

'ফোটো তোলা হয়েছে বুঝি ও সবের?'

'তুলে রাখতে হয়। ফোটোর বিশেষ কোনো মানে নেই।'

'বঙ্কু বলে বেড়াবে?'

'তাহলে তার সর্বনাশ হবে বলে দিয়েছি।'

'জামা জুতো ফিরে পাওয়া যেতে পারে ?'

'বেশ দামী নতুন জিনিষ তো ওগুলো ? মুখার্জি একটু ভেবে বল্লে, 'ব্যবহার করবেন ?'

'না এমনই ।'

'এখন পাবেন না ।'

গাড়ি সাঁ সাঁ করে চলছিল । চালাচ্ছিল মুখার্জি নিজেই ।

সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি স্ট্রাইকে আবার এসে যোগ দিই কি করবেন ?'

'গয়ানাথ মালোর খুনের খবর বেরিয়ে পড়বে—ওরা আপনাকে ধরে জরাসন্ধের মত ছিঁড়ে ফেলবে দুই দাবনার মাঝখান দিয়ে ।'

'একটা মিথ্যে কথা রটিয়ে দিয়ে আমাকে ঠেকাবেন আপনারা ?'

'আপনাকে ঠেকাবার দরকার যে ।'

'বাইশ দফা দাবির কটা মেনে নিতে রাজি আপনারা ?'

'না মেনে নিলেও চলে । না হয় এক আধটা মেনে নেব ।'

'ভাঙবে ষ্ট্রাইক তাহলে ?'

'হামিদকে হাত করতে পারলে হবে সব ।'

'পারবেন করতে ?'

'টাকা দিয়ে পারব না, কিন্তু আপনি সরে গেলে পারব ।'

সুতীর্থকে তার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে মুখার্জি যেন বিদ্যুতের তারে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বল্লে, 'ও এই বাড়ি ।'

'হ্যাঁ । এই তো ।'

'এটা কার বাড়ি ?'

'অংশুবাবুর ।

'অংশুবাবু ?' মুখার্জির মুখটা কেমন ছুঁচোলো হয়ে উঠল—নাকটা আরো লম্বা আরো ছুঁচোলো—শীত রাতের অন্ধকারের ভেতর—সুতীর্থকে বল্লে, 'এখানে মণিকা দেবী বলে কেউ থাকতেন না ?'

'অংশুবাবুরই তো স্ত্রী তিনি ।'

'অংশুবাবুর স্ত্রী ?' মুখার্জি সুতীর্থের আগাপাশতলা সবদিকে ভালো করে চোখ ছানিয়ে নিয়ে মোটর ঘুরিয়ে চলে গেল ।

পঁচিশ

জয়তীর স্তাবক ও প্রেমিকের মধ্যে ক্ষেমেশ চৌধুরী ও আরো দু-একজন এখনো অবিবাহিত ছিল; বাকি সকলেই বিয়ে করে সংসারে তলিয়ে গেছে। এরা কেউই বিরূপাক্ষের বাড়িতে জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে যায় না বড় একটা।

বিরূপাক্ষের সঙ্গে জয়তীর বিয়ের ঠিক পরেই—মাঝে মাঝে যেত বটে, কিন্তু ইদানীং দু-এক বছর মোটেই আসা যাওয়া নেই আর। বিরূপাক্ষের টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে ক্ষেমেশ চৌধুরীর বাড়ি অনেক দূরে—বেলগাছিয়ায়। বেলগাছিয়ার বাড়িতে ক্ষেমেশ একাই থাকে; ক্ষেমেশের আত্মীয়স্বজন নেই বিশেষ কেউ, যারা আছে কেউ কলকাতায় থাকে না বড় একটা। ক্ষেমেশের বাবা বেঁচে নেই, মা দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসা-যাওয়া ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন, এবারের শীতে কলকাতায় আসেননি আর ফাল্গুনের বাতাস ছাড়লে আসতে পারেন হয়তো, কিংবা আসবেন বর্ষাকালে।

নিজের বাড়িতে ক্ষেমেশ আজকাল একাই ছিল। জয়তীর সেসব দিনের পরমাইরা আজ যখন সম্পত্তি ও সন্তানের বহর বাড়িয়ে চলেছে, ক্ষেমেশই তখন আধবুড়ো একা, সাংসারিক চালচলনও ক্রমে পড়ে যাচ্ছে তার সংসারের।

'ভালো করেছ জয়তী তুমি এখানে এসে।'

'চা খাচ্ছ তুমি। আজ সকালটা কিরকম রোদে বাতাসে ঝরঝরে দেখছ।'

'মাঘ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার এ বাড়িটা তো ঝাড়জঙ্গলের মত বানিয়ে রেখেছ তুমি—'

'হ্যাঁ, খুব চুপচাপ; গাছগাছালি ঢের, নানারকম পাখি আসে।'

'আমি পাখি খুব ভালবাসি।'

'কিন্তু কটা পাখির নাম বলতে পার? নানারকম নতুন পাখি আসে—নিবেশী পাখি—উপনিবেশী—ঝাঁকে ঝাঁকে—আমি ওদের চিনি—কিন্তু ওদের অনেকেরই কোন দিশি নাম আছে বলে জানি না—কেন দাঁড়িয়ে? বোস—বোস।'

'বলব বইকি। তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—'

'আমি ?' ক্ষেমেশ একটু হেসে বললে, 'পরে বলছি। নানারকম লতাপাতা উঁচু উঁচু গাছ দেখা যায়। সে সবের দিশি নাম কি বলতে পারি না আমি। তুমি জান ?'

চশমার ভেতর দিয়ে খানিকটা চুম্বকের টানে যেন জয়ন্তীর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ।

'একেবারে না জানি তা নয়।'

'আমাকে বলে দাও তো ঐ গাছটার নাম কি—ঐ যে উঁচু হয়ে উঠেছে—যার ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাইরের সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে। দেখেছ ?

অনেক উঁচু উঁচু গাছ তো আছে।'

'আমার আঙুলের সোজাসুজি যেটা—ডালপালা বেশি—পাতা কম—কাজেই জাফরি কাটার কথা এল—মেঘ থাকলে কেন সাদা—না হলে নীল জানালাটা চোখে পড়ে বড় আকাশের।'

জয়ন্তী খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কি জানি, নাম তো আমি বলতে পারব না।'

চোখ ঘুরে গেল জয়ন্তী পরম্বাৎ অন্য একদিকে ক্ষেমেশের, ঠোঁটে তার হাসি লেগে ছিল।

'তোমারও আমার মত দেখছি। আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনেকেই নানারকম গাছপাখির দিশি নাম জানে না।'

'এত নাম নেইও হয় তো।'

আমাদের দেশের লোকেরা কেবল ভেতরের দিকেই তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে বলতে চাও তুমি ? গাছপালা পাখপাখালির দিকে তাকিয়েই নিজের ভেতরটাই দেখে—ওদের দেখে না : এই বুঝি ?'

'অনেকটা তো তাই।'

'তাই তো। ম্যাক্সমূলার থেকে কীথ অলডজ হক্সলি, ইশার উড এই নিয়েই তো আটখানা। কিন্তু ভেতরে ডুব দিয়ে রেশমী জাল বানায় তো আমাদের দেশের লোকেরা—রেশমী জাল—ইন্দ্রজাল,—মাকড়সার জাল—বাইরের পৃথিবীর খোঁজখবর বড় একটা রাখে না ?'

'তুমি আজ পাখিটাখির খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি ক্ষেমেশ। এও তো বহিরাশ্রয় নয়—বারফটটা কেমন একটা জিনিস যেন এতো পৃথিবীর কল্যাণে লাগে না, তোমার নিজের মন খুশি—'

'না, না, আমি যা বলতে যাচ্ছি তুমি সেটা এড়িয়ে গেলে।'

'বুঝেছি।' জয়ন্তী সোফায় এসে বসল। 'কিন্তু কোন জিনিসের কি নাম না জেনেও জিনিসের আস্বাদ পাওয়া যায়—'

'তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাম জানা থাকলে মন চরিতার্থ হয় বেশি। তোমাকে চা দেওয়া হয়নি তো—'

'আমি চা নিজেই বানিয়ে খাব। তোমার মা কি এখানে?'

'না।'

'দেশের বাড়িতে?'

'কাল চিঠি পেলুম তিনি বর্ধমান থেকে এলাহাবাদে গেছেন বুড়ো সরকারের সঙ্গে প্রয়াগে চান করবার জন্যে। এত শীতে যাওয়া ভাল হয়নি—'

'কে আছেন এখানে?'

কেউ না।'

'একেবারে একা তুমি?'

'রঞ্জন আছে।'

'সে কে?'

'আমার চাকর।'

'ওঃ আমি ভেবেছিলুম—। খুব মালদার নাম, হরির চেয়ে তুলসী পাতার হরির নামের দাম বেশি। সেই রূপচাঁদ পক্ষীর গান: মনে আছে তোমার? আমি তোমার এখানে কয়েকদিন থাকব ক্ষেমেশ।'

'বেশ থেকে যাও, ওদের মতামত—তোমার বাবুর মত আছে তো?' যেন সবই আছে সবই ঠিক, সবই ভালো—এরকম স্থির সুনিশ্চয় চোখে জয়ন্তীর দিকে একবার তাকিয়ে নিল ক্ষেমেশ।

'তুমি কোথা থেকে এসেছ জয়ন্তী?'

'সেইটেই তোমার প্রথম জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমাকে দেখেও তুমি পাখি আর তিত্তিরাজ গাছ নিয়ে পড়লে—'

ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে 'তুমি তো বিরূপাক্ষ রায়কে বিয়ে করেছিলে?'

'কেন, বিয়ের আসরে তুমি উপস্থিত ছিলে না?'

'তোমার স্বামী আজকাল কোথায়? কলকাতায় তো? তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছিলুম। এখনও কি সেইখানেই আছ তোমরা?'

'টালিগঞ্জে উঠে গেছে।'

'তোমার স্বামী কোথায়? তাকে দেখছি না তো'—ক্ষেমেশ বললে, 'কলকাতায় নেই বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বইকি। তুমি কোনোদিন বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়েছ বিরূপাক্ষ রায়ের, যে সে তোমার এখানে আসবে?'

'বললুমই তোমাকে। বার চারেক তো খুবই গিয়েছি তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবু তো একদিনও আমার এখানে আসেন নি—'

'এলে তুমি খুশিও হতে না ক্ষেমেশ। তুমি ঢাকুরিয়ায় গেছ কয়েকবার কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ঠিক নয়, তার সঙ্গে একটা কথা বলেছ কোনোদিন?'

'না'। নিশ্চিত সত্যকথনের মত নির্ভাবনায় বললে ক্ষেমেশ। ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না জয়তী। ঐ লোকটাকে আমি চিনতে চাইও না।'

'মনে করবার কিছু নেই আমার।'

'তুমি কার সঙ্গে এলে?'

'একাই।'

'এখন তো ট্রাম স্ট্রাইক চলছে।'

'বাস তো বাদুড় ঝুলিয়ে উড়ে বেড়ায় দিন রাত। সেই টালিগঞ্জ থেকে দশ পাড়া ভেঙে অ্যাদ্দুর আমার মতন কোনো মেয়েমানুষের একা বাসে চলাফেরা করা অন্যায়—'

'অন্যায় কেন হবে?' ক্ষেমেশ চশমাটা খুলতে চেয়ে তবুও না খুলেই জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, তবে বাঙালী মেয়েদের পক্ষে পেরে ওঠা কঠিন।'

ক্ষেমেশ তার ডানহাতের মুঠো সম্পূর্ণ খুলে প্রসারিত করে কররেখার কুটিল বিন্যাসের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে জয়তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'বাসে এসেছ? ট্রাম স্ট্রাইকটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে? তুমি সবই পার। তুমি কি না পার আমাকে বলে দেবে জয়তী?'—সাত আট বছরের আগের সেই চাঁদ নক্ষত্রাবিষ্ট মানুষের স্বর শোনা গেল যেন ক্ষেমেশের গলায়। কিন্তু তবুও গলা আজ কত অভিজ্ঞ ও আত্মস্থ।

'বিরূপাক্ষবাবুর দুটো গাড়ি আছে?' বললে ক্ষেমেশ।

'আছে।'

'আমি একটা ক্যাডিলাক কিনেছিলুম, বিক্রি করে দিতে হল—'

'কেন?'

'খরচ পোষায় না। আমি তো বাস্তবিক কিছু করছি না—'

'কিছু করছ না? আজকাল তো সমস্ত পৃথিবীই মুখ চেয়ে আছে। দুটো দুটো যুদ্ধে সব ঘাঁটি উড়ে গেল—ভাবুক লোকেরা কাজের লোকেরা কোথায়—এসো; যা ভালো হবে খুব ভাঙবে না আর, সেই সব সৃষ্টি করে যাও,—তাতে সকলেরই তো হাত দিতে হবে। তোমাদের তো বিশেষ করে। তুমি তো গিফটেড ক্ষেমেশ—'

'আমি?' আড়চোখে জয়ন্তীর দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'উৎখাতের জের চলছে এখনও। তৈরিটৈরি কিছু আরম্ভ হয়নি। সে সবের পরিকল্পনাও ধোঁয়াটে। এখনও কে কোথায় ভাগ বসাবে,—কে কার গ্রাস কেড়ে খাবে—এই নিয়েই হাটরা হাটরি।

'তোমার ঘরে এত সব বই ক্ষেমেশ—চোখে ধাঁধা লেগে যায়।'

'বইগুলো কিনেছিলুম,—আমার বাবার কোন লাইব্রেরী ছিল না। তিনি আজীবন জমিদারি ঘেঁটে গোঁসাই মালপো কেস্তনের কুদরতি করে শেষে টের পেলেন ওটা তাঁর নিজের জমিদারি নয়—'

'কি রকম?'

'সে অনেক আইনের মার প্যাঁচ আছে। আমিও বুঝি না—তুমিও বুঝবে না। সমস্ত সম্পত্তিই ছেড়ে দিতে হল তাঁর সৎভাইয়ের নামে। এক ফাঁকে কলকাতার এ জায়গাটা কিনে রেখেছিলেন, তাই মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা আছে।'

'দেশের বাড়িও তো আছে?'

'সেটা বাবার সব নয়—সিকিভাগ বাবার—'

'তিনচার বিঘে?'

'বিঘে দশেক হবে; একটা দেড়তলা বালিরঙের—বালিহাঁস রঙের দালান আছে—এ ছাড়া মফঃস্বলে আমাদের আর কোথাও কোনো জায়গা জমি নেই। ছিল ঢের, বাবার তত্ত্বদারকে বেড়েও ছিল খুব, কিন্তু মোকদ্দমায় টিকল না কিছু।'

'এই নিয়ে আফসোস?'

'আফসোস কোথায় ? 'বড় বড় চুলের ভিতর হাত চালিয়ে সমস্ত মাথাকে বসন্ত বাউরার বাসা বানিয়ে স্থির চোখে জয়ন্তীর দিকে একবার তাকিয়ে পলকের মত মাথার চুলগুলো পাট করতে করতে ক্ষেমেশ আকাশ বাতাসের দিকে চোখ ফেরাল আবার ; 'তুমি জিনিসটা ঠিক ধরতে পারলে না। বাবা যা যা করে গেছেন সেটায় মশকরার কোন মানে হয় না ; করতেও হচ্ছে না ; ভালোই হল, আমি বেশি স্পষ্ট কিছু করবার সুবিধা পেয়েছি।'

'সেটাই মিথ্যে কথা।'

'কেন ?'

'দশ বিঘে জমি দরদালান মফস্বলে—কলকাতায় এত জায়গা জমি ঢালাও ইঁট সিমেণ্টের এই পুরী—এটা সামন্ত আমলের ধ্বংস ? সকলের সঙ্গে মিলে যাবার এইটেই যদি সোজা রাস্তা হয় তা হলে অস্পষ্ট অসাধ্য রাস্তাটা কোথায় ক্ষেমেশ ? তোমার দেশটা খুব স্নিগ্ধ। স্বপ্ন ভালো ; কিন্তু ভিয়েনে চড়লেও সত্যের দরকার বেশী। আমাদের মনে লোকের পক্ষে সত্যেরই দরকার সবচেয়ে বেশী।'

'সত্য কি ?' জানতে চাইল ক্ষেমেশ। চোখে চশমায় কেমন একটা ভাবনা সন্তাপে খানিকটা আলোড়িত হয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তুমি কোন পার্টির জয়ন্তী ?'

'কিচ্ছুর না।'

'নও ? হওয়া তো উচিত ছিল, তেতলার ড্রয়িং রুমে বসে যারা বস্তির লোকেদের জন্যে লড়াই করছে তাদের মতনই তো কথা বলছ তুমি। বিরূপাক্ষবাবুর তিনটে বাড়ি আছে—দুটো গাড়ি—কলকাতার চেম্বার অব অব কমার্সের তিনি চাঁই। মাথায় খদ্দরের টুপি—হাতে হুণ্ডী—রাজনীতিক সভাসমিতিতে গেলে মাইকেও যেতে হয় না, মুখের মুচকি হাসি দেখেই সকলে হাসি মুখে মটকা মেরে থাকে : এ হেন লোকের টাকায় খেয়ে-দেয়ে মুখ মুছে তুমি যদি না এ সব কথা বল তা হলে কে বলবে ?'

'কি সব কথা ?'

'এই যে সব সত্য অসত্যের কথা আমি অসত্যের পথ ধরে চলেছি বলছিলে—'

'নির্জলা সত্যের পথ ধরে চলেছ কি তুমি ক্ষেমেশ ? আমি কি চলেছি ?'

'সত্য কি ? বললে না তো। বলতে পার ?'

'সত্য কি তা তুমি জান ক্ষেমেশ।'

'যা জানি তারই দিকে নাক বরাবর চলেছি। এ ছাড়া কোনো উপায় আছে ?'

'বাপের টাকায় খাও-দাও পাখি দেখ ?'

ক্ষেমেশ তাকাল জয়তীর দিকে। জয়তীর মনে হল ক্ষেমেশ হয়তো বাস্তবিকই নিজের পথ বেছে নিয়েছে। যখন নিজের সবচেয়ে ভালো সাধনার ফলগুলোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে মানুষের নিজেরই বিজ্ঞান বা সভ্যতা, তখন দুচারটে লোক যদি এই আত্মমন্থন ও আত্মলোপাটের হইচই ও আহাম্মকির থেকে খানিকটা দূরে সরে তাদের বাড়ির পৃথিবীতে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তা হলে সত্য কোন দিকে আছে—কিই বা সত্য—আমাদের আজকের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে—সেটা নির্ণয় করা কঠিন—বলা কঠিন। কিন্তু তবুও এ উদঘাতী সভ্যতাকে নিজের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা উচিত। ক্ষেমেশ হয়তো মনে করে ভুলটা স্বাভাবিক ; শোধরাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না ; সেই বিরাট টিকটিকিরা যেমন করে মরে গেল, নিজের মৃত্যুবীজের স্বতসিদ্ধতায় মানুষও মরতে চলেছে—খুব শীগগির মরতে চলেছে হয়তো। সে যা বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছেও সত্য নয়, হয়তো—কিন্তু ক্ষেমেশের মন খুবই শিক্ষিত স্বাধীন মন যা সত্যিই বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছে সত্য হয়তো ?

জয়তীর চোখে মুখে সকালবেলার রোদের ধ্বক এসে পড়েছিল। কেমন একটা আলোর সাগরে বারুণীর শাশ্বতী রূপসীর মত দেখাচ্ছিল তাকে। শাড়ির নীচের দিকটায় যে অংশে ছায়া পড়েছে—নীল সাগর শঙ্খ বুদবুদ ফেনা গন্ধ আলো গতি সচ্ছলতার কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা, নিরবচ্ছিন্ন অনিমেষ-দেশ সৃষ্টি করেছে—উপলব্ধি করছিল ক্ষেমেশ।

'পাঁচমিশেলি নিয়ে আমাদের জীবন', ক্ষেমেশ বললে, 'কেউ কি ছাঁকা পলিটিকস করছে, কিংবা নিছক সাহিত্য ? যে যার নিজের দলের মোটামুটি নিয়মগুলোর কাছেও কি সত্য ও সার্থক ? তা নয়—সবই সুবিধের ব্যাপার—তাড়াহুড়োর জোড়া তাড়ার জিনিস। কোথাও কারু হাতে সময় নেই—সব দিকেই দিনরাত পড়ি কি মরি হুজ্জোতে—তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে নিতে হবে—এই হল আজকের যুগের ঘরপোড়া গোরুদের কথা। এখনও চারদিকে তাদের সিঁদুরে মেঘ। মেঘটা ঘনাতেও পারে।'

'তুমিও ঘরপোড়া ক্ষেমেশ এত বড় ঘরবাড়ি নিয়ে ?'

'ঘরবাড়ি এক্ষুনি পুড়ে যাবে। যেটুকু সময় আছে আমি পাখি দেখেই দিন কাটাচ্ছি।'

'এর পর তেল মেখে বাঁশের লাঠি পাকাবে হয়তো সমস্তটা শীতকাল।' জয়ন্তী একটু হেসে বললে।

'বাঁশের কাজ করলে আড়বাঁশী তৈরি করব, কিংবা বেত আর বাঁশ দিয়ে চেয়ার টেবিল, চায়ের টেবিল, আরামচেয়ার বানাব। তুমি তালপাতার ব্যাগ তৈরি কবতে পার ?'

'তুমি পার ?'

'দেখছিলুম সেদিন—'

'একা মানুষ ; এত জিনিস তোমার। কিন্তু কি সদ্ব্যবহার করছ এদের ? তালপাতার ব্যাগ নয়—মানুষ তৈরি হবে না ?'

'মানুষ : মানে যারা মারণমন্ত্র, শেল তৈরি করতে পারে ? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশী মানুষ। যারা একশোবার করে ইউরোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়—একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে ;—আর তাদের তাঁবেদাররা—ব্যাঙ্কে অফিসে—ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশী মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে—বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই—কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে—কি করে শান্তি পাবে ?'

ক্ষেমেশ বললে, 'এত জিনিস আমার ? তা বলতে পার। এই বাড়িটাকে তুমি প্রাসাদ বলেছ : তা হতে পারে। কিন্তু বাড়িটা তো ধ্বংসে পড়ছে। খুব বেশী দিন অবিশ্যি বাঁচব না আমি, মরবার আগে বাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে মনে হয় না ; প্রকৃতির দোহাত্তা মার বাংলাদেশে হয় না ; সমাজে রাষ্ট্রে হবে কিনা সন্দেহ ; আমার নিজের মনেও ঘরবাড়ি ফাঁসাবার তেমন কিছু ডাকসাইটে নেশা আছে বলে টের পাচ্ছি না। তা হলেও একটা বড়—কিন্তু

বড় ভাঙা বাড়িতে আছি—এ বাড়ির কোনো অংশও কাউকে ভাড়া দিচ্ছি না আমি। কেন দিচ্ছি না? কেন? কেন দু বিঘে জমি নিয়ে কলকাতায় আছি? আমিও অবাক হয়ে ভাবি কেন করছি—এ সব? অনেকে দশ বিঘে একশো বিঘে জমি নিয়ে আছে বলে? দশ জায়গায় দশখানা বাড়ি ফেঁদে রয়েছে বলে? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সভ্য লোকেরা সবচেয়ে বেশী সুখে লালসায় মত্ত বলে? চারদিকে সবাই সকলকে উচ্ছন্ন করছে বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই; তাই। আমিও ওসব মানুষের পাল্টা ঘরের মানুষের মত মৃত্যু হিংসা কামে নয়—খানিকটা পরিসর ও শান্তি খুঁজছি প্রকৃতির ভেতর; এটা কি অন্যায়? খুব বেশী আত্মপরতার প্রমাণ দিচ্ছি আমি! আমারও মনে মাঝে মাঝে খটকা বেধেছে জয়ন্তী। এতদিন নিজের ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছি যেটাকে—সেই পাখি আকাশ ঘাসের ওপর শুয়ে থাকাকে সত্যিই অবিশ্বাস করব যখন তখন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব আমি।'

ক্ষেমেশের এ সব দূর, অব্যয় কথা জয়ন্তীর কানে ঢুকল না হয়তো। জয়ন্তীর মনের ধাঁচ অন্য রকম: তাতে নিবিড়তা আছে হয়তো কিন্তু পরিসর নেই, নিবিড়তাও বেশী নেই, সেটা নলকূপের; অর্জুনের বাতা বাণমুখের নয় যা ভোগবতীকে এনেছিল; কপিল সগরের মত নয় যাদের বড় কোলাহলের ভেতর থেকে গভীরতার আনন্দ নিয়ে সাগরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তবুও খুব খাঁটি কথা বললে জয়ন্তী।

'কলকাতায় এমন জায়গা আছে', জয়ন্তী বললে, 'যেখানে একটা কলে একশো পরিবারের জল সংস্থান করতে হয়; তুবি যে ঘরে বসে একা একা চা খেয়ে লম্বা ছাড়ছ এরকম কামরা পেলে পঁচিশটে পরিবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে হেঁসেলে হাঁসফাঁস হয়ে মস্তকের ইঁদুরের মত সাবাড় হতে হতে ভাগাড়ের শকুনের মত ঝাপটা মেরে নেচে ওঠে আবার। এ তো মৃত্যু—কিন্তু তবুও জীবনও বটে। জীবন ছাড়া এ আর কী? এ জীবনকে জায়গা দিতে হবে।'

'তা দিতে হবে; কিন্তু এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

'বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।'

'কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?'

'যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।'

‘তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে ?’

‘তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গেই মেশনি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও না তুমি। পরে হবে সে কথা। আমি তোমার বাবার জমিদারির কথা বলছিলুম—’

‘মড়াটাকে তো ঘেঁটেছ ঢের—আর কি হবে ?’

‘কোথায় আর মরল। তেলও কি মরেছে খুব ? অনেক আগেই নিকেশ হবে কথা ছিল—তোমার আমার শুধু নয়—সকলের সব জমিদারি—’

‘নিকেশ হোক। আমিও তো তাই চাচ্ছিলুম। জমিদারেরা দুঃখ করছে না কি করছে জানিনে। কিন্তু আমি জমিদার নই, দুঃখ নেই আমার।’

‘সুখ নেই। তোমাকে দেখে মনে হয়, ক্ষেমেশ, তুমি যদি লুক্রেশিয়সের মত কবিতা লিখতে পারতে, কিংবা রিলকের মত, আমাদের দেশের কৃষ্ণ মজুমদারের মত, কিন্তু কিছুই লিখতে পার না। যদি পারতে তা হলে এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তোমাকে গাল দিতে যেতুম না আমি। ও সব জিনিস তোমার কাছেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠত তখন, মনে অন্য বোধ আসত, বিষাদ বেড়ে যেত হয়তো, কিন্তু আরেক মূর্তি নিত। মরা জমিদারির জন্যে দুঃখ করতে না তুমি। এমনি মানুষের যা দুঃখ সেখানে তোমার দর্শনের আলো পড়ত—হয়তো তোমার কবিতায়—সহজ ভাষায়, তবুও তোমার নিজেরই ভাষায় ; সেই জন্যেই তোমার মৃত্যু হত না। লোকেরা পাত না নেড়ে পড়ত ওষধির মত শান্তি দিতে তুমি, শান্তি পেতে।’

দু কাপ বেশ ঘন চা দিয়ে গেল রঞ্জন।

‘তোমার চাকর আমাকে ঠকিয়েছে ক্ষেমেশ।’

‘কিছু বিস্কুট দাও রঞ্জন। সন্দেশ নিয়ে এসো—এক হাঁড়ি এনো—বড় হাঁড়ি। রকমারি আনবে ; ওসব নাম তো তোমার মুখস্থ। কি একটা আছে রঞ্জন যা বেলগাছিওয়ালা খাওয়ায় বালিগঞ্জিনীর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, নাকি টালিগঞ্জওয়ালী জয়তী তুমি ? মফস্বলের জায়গা জমি বাড়ি মা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে বলেছি কলকাতার এ বাড়ির কোনো অংশই কাউকে ভাড়া দিই না আমি।’

‘কেন ?’

‘দিলে ভাড়া দেব না, এমনিই ছেড়ে দেব।’

‘কাকে ?’

'যাদের খুব দরকারী বেশী।'

'এমন বহু লোক তো আছে কলকাতায়—'

'আছে। মানুষকে ভালোও বাসি আমি। কিন্তু ভেবে দেখছি কয়েকটি পরিবার এনে আমার এখানে বসালে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যে রকম জীবন আমি চালাচ্ছি সেটা সম্ভব হবে না আর।'

'তুমি কি একেবারেই একা থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারেই একা?' জয়তী আবার জিজ্ঞেস করল—ক্ষেমেশেরই শুধু নয়—পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গ লোকদেরই প্রাণের কাছে এসে পড়ে কেমন দায়ভাগিনীর মত যেন।

'কে: আমি?' ক্ষেমেশ একটা আকাশগামী হাঁসের মত বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় পাশের মরালীকে দেখে নিল যেন একবার, তার পরে ডানার বেগে উড়ে যেতে লাগল আবার: নীলিমা-কণিকা রাশির ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে চলেছিল যেন তারা দুজনে।

জয়তী বললে, 'আছে মানুষ আছে খুব শ্রদ্ধা করবার ভালোবাসবার মত। তবে এও একরকম মন্দ করনি তুমি, পাখি দেখছ, আকাশ নক্ষত্র দেখছ। কিন্তু কোনো সময়ই কি কাছে গিয়ে বসবার মত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না?'

'এই তো হয়েছে; আজ হল, অনেকদিন পরে।' ক্ষেমেশ বললে। কথাটাকে একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তার পরিণতি অনুসরণ করতে গেল না ক্ষেমেশ, জয়তীর মুখের দিকেও তাকাতে গেল না; দূরের ঝাউগাছে একেবারে উঁচু ডালপালায় একটা কাককেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—অবাক হয়ে দেখছিল।

'শুনেছি তুমি তোমার বাবার বাড়িতেই বেশী থাকতে? বিয়ের পরেও?'

'হ্যাঁ, এবারেও যেতুম বাবার ওখানে, কিন্তু চলে এলুম তো বেলগাছিয়ায়।'

'বিয়ে তো তোমার বছর তিনেক হল হয়েছে?'

'তা তুমি গুণে ঠিক কর ক্ষেমেশ।'

'কতদিন ঘর করলে বিরূপাক্ষের সঙ্গে?'

'মাস পাঁচ-ছয়।'

'মোটে? কেন?' ক্ষেমেশ বললে, 'সেদিন গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন।

আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেল রঞ্জন। গেছলুম। দর্শনের জন্যে যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর তোমাকে দেখলুম মনে হল, গিয়েছিলে তুমি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ গিয়েছিলুম, তুমি কোথায় ছিলে ? দেখিনি তো তোমাকে। ওমা, আমাকে দেখেছিলে ! আমাকে দেখলে তো কাছে এলে না কেন ? কোথায় বসেছিলে তুমি ?'

'গান্ধীকে দেখতে যেতুম না, রঞ্জন আমাকে টেনে নিলে। না হলে সেদিন আমার ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবার কথা ছিল। শুনেছিলুম নতুন পাখি এসেছে ওদিককার জঙ্গলে।'

'পাখি দেখা হল না তবে ?'

'না। গান্ধীকে দেখাবেই রঞ্জন। আমি তো দেখেছি একবার এর আগে। আবার কেন ? বলছিলুম রঞ্জনকে। কিন্তু যেতে হল।'

'একবার দেখেছ মাত্র ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায় ?'

ক্ষেমেশ মনে করতে চেষ্টা করে বললে, 'অনেক জায়গায় দেখেছি, কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ছবিতে দেখেছ ক্ষেমেশ।'

'তা হবে। সেদিন গেলে সোদপুরে ; আলো পেলে জয়ন্তী ?'

'আমি তো তোমার মতন বলছি না যে, কোথাও মানুষ নেই। মানুষ আছে, অনেক আছে।'

'সোদপুরে আলো পেলে ?'

'মাঝে মাঝে আলোর উৎসের কাছে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বিচার হয়তো অন্য রকম, কাজ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু তবুও যে সব মানুষ এরকম অশান্ত পৃথিবীতে এতদূর শান্তি, সত্য পেয়েছে তাদের কাছে গেলে ভালো হয়। হয়তো কিছু পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না। কিন্তু গান্ধী নিজে উপকার পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর পথে চলে অনেকে ; —বুঝতে পেরে আশা আসে মনে। সেটা লাভ। চারদিককার পৃথিবী তো বলছে আশা নেই। সেটা ক্ষতি।'

'বিরূপাক্ষকে বিয়ে করেছিলে বলে সোদপুরে যাওয়ার দরকার হয়েছিল। তোমার।'

ঝাউগাছের অনেক উঁচুর ঝিরঝিরানির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'কোনো পাখি নেই সেখানে এখন আর।'

'তার মানে ?'

'তা না হলে তুমি যেতে না যে তা নয়, কিন্তু এতটা তাড়া থাকত না। বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সব, এত বেশী ভালো লাগল তাই।'

'যেন মহাত্মার নিজের কোনো আকর্ষণ নেই ?'

'তা আছে। প্রভাব আছে। সব আছে। সোরহাবর্দ্দিও তা বোধ করছেন। আমি যা বলেছি তা অস্পষ্ট নয়।'

ছাব্বিশ

জয়ন্তী ক্ষেমেশের বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে ঠিক করেছে। একদিন তো কাটল। পরদিন সকালবেলা ক্ষেমেশের পড়ার ঘরে, (এইটেই বসার ঘরও ক্ষেমেশের) বসে চা খাচ্ছিল জয়ন্তী আর ক্ষেমেশ।

'বাড়ি ভাড়া দাও না তোমার কোনো আয় নেই তা হলে ?'

'না।'

'চলে কি করে ?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে এখনও।'

চাকর বিস্কুট ও সন্দেশের হাঁড়ি ও দুটো বড় দুটো ছোট চীনেমাটির রেকাবি একটা তেপয়ের ওপর সাজিয়ে জয়ন্তীর কাছে রেখে গেল। চায়ে টাগরা গলা টনসিল পুড়িয়ে (ভালো লাগল জয়ন্তীর, ঠাণ্ডায় কেমন ব্যথা করছিল গলার ভেতরটা) একটা দুটো চুমুক দিয়ে জয়ন্তী বললে, 'ব্যাঙ্কে কত টাকা ?'

'হাজার পঞ্চাশেক হবে।'

'সুদ খাচ্ছ ?'

'আসলে হাত দিতে হয়।'

'প্রতি মাসেই।'

'হ্যাঁ। বিরূপাক্ষের তো পঁচিশ লাখ আছে।'

'কি জানি।' অনেক দূরে যে নির্ঝর ঝরে পড়ছে সে তো রক্তের, আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি : মনে হল যেন জয়ন্তীর কণ্ঠ শুনে।

'ক্ষেমেশ, তোমার নিজের রোজগারের কোনো পথ নেই ?'

'না, কোনো ব্যবসা-ট্যাবসা করছি না। চাকরি করব না।'

'ইচ্ছে ক'রে কি মানুষ চাকরি করে? তোমার চেয়েও অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষের চাকরি করে খেতে হচ্ছে। অবোধ অবুঝের গোলামী করে জীবন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে তাদের। ঈশাকেও ভেড়ার পাল চরাতে হয়েছিল। কি করবে—এ ছাড়া উপায় নেই তো। খাওয়া-পরার স্বাধীনতা চাই তো মানুষের।'

'স্বাধীনতা আছে আমার', ক্ষেমেশ জয়ন্তীর মনকে ঠেক ধার দিয়ে বললে, 'ব্যাঙ্কের টাকা আছে। দায় পড়লে আমারও চাকরি করতে হত। সে রকম দায়ে এখনও পড়িনি আমি। পড়তে হবে একদিন; তখন ঠিক করে নেব পথ। চা খাচ্ছ না? সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে দাও।'

'তুমি খাবে?'

'খাব বইকি! তুমি কি একাই খাবে সব?'

'কটা এনেছে?'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে। একা খেতে পারবে?'

'এত সন্দেশ কি হবে?'

'ও-বেলা খাব, রঞ্জনকে দেয়া যাবে, কালও খেতে পারা যাবে, এক-আধ দিনে সন্দেশ নষ্ট হবে না।'

রেকাবিতে সন্দেশ সাজাতে সাজাতে জয়ন্তী মনে মনে ভাবছিল: কেমন একটা ভাঙা সোঁদা সোঁদা জমিদারি মেজাজ এখানকার সবদিকেই। বড় হাঁড়ি —অঢেল সন্দেশ—নিঃসাড় ঘরদোর পুরী—মুনাফা নেই, ব্যাঙ্কের টাকা আছে, তবুও নেই; ব্যবসা নেই, চাকরীর মত গোলামী কে করে, পাখি উড়ছে; বাড়িটা এত বেশি বন-জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে যে, সে সবের ভেতর দিয়ে একটা গোরু বা বাছুর চলে গেলে বিদ্‌ঘুটে সবজির গন্ধ ছড়ায় চারদিকে, বিশৃঙ্খলভাবে জন্মেছে সব গাছপালা, এবড়ো-খেবড়ো ফসল, অদ্ভুত সব আগাছার চাঁদমারি; সবুজ বটে, কিন্তু তবুও এগুলো সত্যিই কি সেই সবুজ? প্রকৃতি বটে, কিন্তু তবুও কি প্রকৃতি? ক-খ লাহার বা গ-ঘ পালচৌধুরীর সাজানো বাগানবাড়ির প্রকৃতির ভক্ত নয় অবিশ্যি জয়ন্তী, কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের, কিন্তু তবুও ক্ষেমেশের বাড়িতে কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি যেন প্রকৃতিকে; অরণ্যের মাহাত্ম্য নেই এখানে, বাগানবাড়ির কাঁচিছাঁটা শৌখিনতা নেই। প্রকৃতি নেই। আছে? ভালো করে তাকাল আবার অনেক গাছ,

অনেক লতা, আগাছায় বিস্তর সমৃদ্ধির ভগ্নাবহতার শোকাবহতার দিকে; কেমন যেন মনটা লাগল জয়তীর। জীবনের গল্প ফুরিয়ে গেলে এ-সব ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এদেরই ভেতর মিশে যেতে হয় একদিন; সময় কাজ করতে থাকে তারপর, নিওলিথ মানুষের কথা আর মনে থাকে না কারু।......ক্ষেমেশ তো আট বছর আগেও অক্‌স্‌ফোর্ডে যাবে ঠিক করেছিল, ডিগ্রী আনবার জন্য। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এসে একটা কলেজে প্রফেসারি পেত হয়তো। সেও তো এই জিনিসেরই রকমফের; কিংবা ব্যারিস্টারি পাশ করে এলে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার হয়তো বড় জোর পাঁচ লাখে দাঁড়াত। কী হত তাতে। জীবনে একটু অদ্ভুত বলাধান হত হয়তো; মন আকাশের বিদ্যুতের মত নয়—এ-সি ডি-সি ক্যারেন্টের মত চমকে হুমকি দিয়ে বসত; বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে করিতকর্মা পুরুষ হয়তো ওরা বলত ক্ষেমেশকে; কেউ কেউ বলত লোচ্চা বদমায়েশ—ক্ষেমেশের ব্যক্তিক জীবনের এক ঝুড়ি কেলেঙ্কারি রটিয়ে বেড়াতে ওরা। কী হত এই সবে।

পরের দিনের সকালবেলা এল। ক্ষেমেশের বসবার ঘরেই বসেছিল দুজনে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির হতচ্ছাড়া নষ্টচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নয়—এই অনেক দিনকার উইয়ে কাটা ঘুণে খাওয়া ভালো খারাপ সুন্দর কাতর পৃথিবীটার কথা মনে করে নিঃশ্বাস ভার হয়ে এসেছে। ক্ষেমেশ যাতে টের না পায় এমনি করে হাল্কা নিশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা করল জয়ন্তী: কিছু পারল, কিছু পারল না।

'তোমাকে কেমন গম্ভীর দেখছি।'

'আমি কথা ভাবছিলাম ক্ষেমেশ; এক-আধটা কথা এসে পড়ল—দেখছি—হাসিমুখে ভাবতে পারি না।'

'কথা ভেবে কোনো কিনারা পাবে না দেখ কেমন চমৎকার রূপশালি ধান-দূবোর পাড়াগাঁর মত রোদ চারদিকে; আকাশে কত যে সাদা মেঘের পাল চিকচিক করছে। সূর্যির হাতে থোকা থোকা বকফুলের পাপড়ির মত ছিঁড়ে পড়ছে লোটন পায়রাগুলো। ভোগবতী দেখনি কোনোদিন, দেখবে না। কিন্তু আকাশ-গঙ্গা দেখ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ জয়ন্তী। কবেকার কথা মনে পড়িয়ে দেয় এজন্মের ওজন্মের কত দেশের দূর দেশের।'

'কই, তুমি তো অক্‌সফোর্ডে গেলে না?'

'না, সে আর যাওয়া হল না। বাবা মোকদ্দমায় আটকে গেলেন—'

'চাকরী না কর ব্যবসায় আপত্তি কি?'

‘টাকা নেই।’

‘পঞ্চাশ হাজার তো রয়েছে।’

‘আজকালকার বাজারে ওতো চণ্ডুর পাশে তামাকের ছিলিম, ওতে কোনো কাজ হয় না। ব্যবসার কথা পাড়লে যখন, আমি একটা কথা তোমাকে বলি—’

ক্ষেমেশের মস্ত বড় সোফাটার এক কিনারে গিয়ে বসল জয়ন্তী, দু’ রেকাবি সন্দেশ সাজিয়ে তে-পয়টায় রাখল দু’জনের মাঝখানে। সন্দেশ নিয়ে সাধতে গেল না সে ক্ষেমেশকে। নিজে তুলে নিল গোটা দুই। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আমি বুঝেছি কি করতে হবে আমাকে। বিরূপাক্ষের লাখ পাঁচেক টাকা বার করে ক্যাপিটালের জোগাড় করে দিতে হবে তো?’

ক্ষেমেশ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে একটা উড়ন্ত পাখির পানে—পাখি ফুরিয়ে গেলে—নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ‘তোমরা তো দু’তিন বছর ধরে এই জিনিসটাই চাচ্ছ।’

‘আমরা কারা?’

‘আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ি যারা আনাগোনা করত, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে; কিন্তু তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষের তিন-চার-পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়া, পঁচিশ লাখের ভেতর পাঁচ লাখের দাবি তাদের; বিরূপাক্ষের ভাণ্ডারী আমি; আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্কে খাজাঞ্চির সঙ্গে মাছির যা। মাছি মধু খায়? না খাজাঞ্চিকে?’

ক্ষেমেশ একটা সন্দেশ মুখে গলিয়ে দিল (আগের দুটো হয়ে গেছে তার), একটু সময় কাটিয়ে আর একটা; বললে, ‘খাজাঞ্চিকে খায় মাছি।’

জয়ন্তী মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে, ‘কেন?’

‘তবে কি খাজাঞ্চিকে ছেড়ে মধু খাবে মাছি? মাছি কখনো টাকা ছেড়ে মধু খায় শুনেছি কি?’

ঘরের পাশেই বুনো বেগুনের ছড়ানো পাতার ওপর একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছিল: এত হাল্কা যে পাতাটা নুয়ে পড়ছিল না, কাঁপছিল না। পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ: কি নাম পাখিটার? খুব গাঢ় সবুজ, লাটিমের মত ছোট; শীতের সকালে খুব চমৎকার আনকোরা সবুজ মখমলের জামা পরে এসেছে মানা হয়। কি নাম? উড়ে গেল পাখিটা।

ক্ষেমেশ বললে, তুমি বিরূপাক্ষের খাজাঞ্চি হয়ে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি? ওরা

সেইজন্যেই তোমার কাছে যেত? যেত, একেবারে কেটে পড়েনি তো; সম্পর্ক একটা রেখেছে শেষদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে।'

'তা রেখেছে ক্ষেমেশ। রঞ্জনকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলবে?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' ক্ষেমেশ এক টি-পট চায়ের হুকুম দিল।

'এক টি-পট বলেছি আমি? চাকর বাকরের সামনে গেঁজেল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

'রঞ্জন গেঁজেলদের খুব শ্রদ্ধা করে।'

'খুব বড় টি-পট তো তোমার। ওরকম ঢাউস টি-পটের গেঁজেল আমি নই।'

'তুমি খাবে, আমি খাব, বাকি থাকলে রঞ্জন খাবে। চা-খাও, চা-খাও। শীতের সকালে চা।'

চা এল। জয়ন্তী ক্ষেমেশের কাপে ভরে দিল, নিজের পেয়ালাও ভরে নিল।

'টি-পটে অনেক চা আছে ক্ষেমেশ।'

'খাচ্ছি। ওটা পরে খাব।'

চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'রোজগার করবই এরকম একটা হন্তদন্তভাবে না চলে মানুষ যদি খুব স্থির মনে ধীরে সুস্থে টাকা উপায়ের পথে যায়, তাহলে তার অভাব হয় না। মন দিয়ে ভালো করে লিখে একটা ইংরেজি আর্টিকেল তৈরি করতে আমার তিনচার দিনের বেশি সময় লাগে না। এজন্যে আমি পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশো টাকাও পাই, বেশিও পাই।'

'ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখ, বাংলায় লেখ না?'

'লিখব ভাবছি।'

'এইবার শুরু করে দাও। বিরূপাক্ষের কাছ থেকে কি পাঁচ লাখ চাইছ তুমিও?'

'যোগাড় করে দিতে পারলে সুবিধে হত।'

'কি করতে?'

'গোটা চারেক প্রেস কিনতাম।'

'এত টাকা লাগে তাতে?'

'শুধু জব প্রিন্টিঙের প্রেস তো নয়।'

'ওঃ বির্লাটির্লার চালে; খবরের কাগজও বেরুত একটা?'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুকে দিতে গিয়ে পেয়ালাটা ডান হাতে ধরে রেখে বললে,

'না, না, খবরের কাগজ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমি পাড় না ও-সব।' তাচ্ছিল্য বেদনা করুণা ঘেন্নায় কেমন কঠিন হয়ে উঠল যেন তার মুখ। ক্ষেমেশের পেয়ালার চা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে জয়ন্তী টি-পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'বল কি হে খবরের কাগজ পড় না, আমি তো চায়ের পেয়ালা মুখেই তুলতে পারব না একদিন কাগজ না পেলে।'

'পৃথিবীর সব খবরই আমার জানা। মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে; ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার বোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তবুও উৎরে যাবে—হয়তো শ্মশানের শান্তিতে কিংবা অন্য কোনো এক ঠাণ্ডা—আগেরটার চেয়েও ঢের ঠাণ্ডা ইণ্ডাজ ভ্যালির সভ্যতায়। মানে মৃত্যুতে? না, জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে ও-সব হবে না কিছু। আমাদের আজকের হইচই যা নিমেষে চোখ ধাঁধিয়ে মনে হয়, সে সভ্যতার কোনো রং নেই—অর্থ নেই—কিন্তু শান্তি আছে।'

নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জয়ন্তী বললে, 'কাগজও বের করবে না, এত প্রেস কিনতে চাচ্ছ?—'

'পাঁচ লাখ যোগাড় করে যদি দিতে পার আমাকে—'

'না অসম্ভব। কাউকে দিই না।'

'তাহলে—'

'তোমার এখানে থাকব বলেই আমি এসেছি।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষ কলকাতায় আছে? তুমি যে এখানে এসেছ তা জানে? না কি না জানিয়ে এলে। অবিশ্যি তোমার নিজের ব্যাপারে কেমন যেন শিশুর মতন ঠেকছে ভদ্রলোককে আজকাল।'

'তুমি ওকে আমল দিতে না, তবুও বিয়ে করলে। বিয়ে করে ঘর সংসারে ঢুকে গেলে বলেই তো মনে হল; একদিন নয়—কটা বছর। এ-সব কি করে সম্ভব হল আমাদের কুশপুতুলের মত মাথা ঘামিয়ে যদি তা বুঝে দেখতে চেষ্টা করতুম—' বললে, ক্ষেমেশ।

আরো বলত, কিন্তু বাইরে শূন্যের ভেতরে কি যে কি দেখে চুপ করে থেমে গেল।

'কি হত তাহলে?'

সমস্ত রাত শুয়ে যেখানে ছায়াপথ ছিল—ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে

ব্রহ্মাণ্ডের সেই কোটি কোটি শতাব্দীর কোটি কোটি মাইল আকাশের দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবীর—জয়তীর দিকে ফিরে বললে তারপর, 'জয়তী এসেছ।'

ক্ষেমেশের গলায় অনেকদিনকার আগের মোমশিখার কাঁপুনি যেন—কেমন যেন গভীর, স্নিগ্ধ শাদ্বল এবং সংকল্প উজ্জ্বল ; কিন্তু অভিজ্ঞ ও সমাহিতও বটে ; তবুও একটু চিড় খেতে আপত্তি নেই। সেই ছ্যাদার পথ ধরে যে বালি ঢুকে পড়তে পারে সেদিকেও লক্ষ্য যে নেই তা নয়।

জয়তীর চোখ ঠোঁট থুতনি আঁটিসাঁটি হয়ে উঠল খানিকটা।

'আমি এ বাড়িতে এসেছি।'

'তা তো দেখছি।'

ও-পাড়ায় বিরূপাক্ষ আছে তার নানান গরম নিয়ে ; আমি চলে এসেছি বলে যে সে আমাকে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না। দেখে নেবে সে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। তুমি না থেকে কোনো শক্ত লোক যদি এ বাড়ির ছেলে হত, তাহলেই স্বস্তি পেতাম।'

জয়তীর কথা শুনে ক্ষেমেশ ভালো বোধ করল না, কেমন একটা আক্ষেপের হাসি ফুটে উঠল তার মুখের ভেতরে। ক্ষেমেশ যে শক্ত মানুষ নয়—নরম মানুষ নয়—মানুষ—তা জানে জয়তী। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে (এক সুতীর্থ ছাড়া), মিতভাষী জয়তী। কিন্তু ক্ষেমেশের সঙ্গে কথাবর্তা বলতে গিয়ে ক্ষেমেশের মত মিতভাষী নয়। এই মেয়েটি যদি ক্ষেমেশের যৌন ও জীবন সাহচর্যে এসে পড়ে—যেমন ক্ষেমেশের মা এসেছিল তার বাবার জীবনে তার চেয়েও প্রাণঘন ও ধীসরস গভীরতায়—তাহলে তা আর কি—ভালোই হয়—খুব ভালো হয়। এর চেয়ে বেশি ভালো—এক ঝাঁক সাগরগামী হরিয়াল সারস যদি আজ সকালবেলা এখানে এসে পড়ে, তাতেও হবে না। ক্ষেমেশ কে কি বিয়ে করবে—শুধু কাঁচা শুধু কালো—রাত্রির অপরিমেয় প্রহরের মত চুলের গুচ্ছ নিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে রাত্রিকে যা দেবার দিনের উজ্জ্বলতাকে যা দেবার : কারণ শরীরে ভেতর থেকে যা দান করে ? ভাবতে ভাবতে সাগযানী হাওয়া আলোর—হরিয়ালদের কথা মনে পড়ল আবার ক্ষেমেশের। সে সব হরিয়ালের রৌদ্র কোলাহল যদি এসে পড়ে এখন—

'তোমাকে একটা আলাদা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি জয়তী ; যেটা খুশি। কিন্তু কি করে একা থাকবে তুমি ? একজন ঝি আনিয়ে নেবে ? আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব ?'

'ঝির ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এক্ষুনি না পেলে জলে পড়ব না আমি। জ্যান্ত বা মড়া ভূত চিমড়ে মামদোর ভয় নেই আমার। সন্দেশ খাচ্ছ না তো?'

'আমার গোটাদশেক হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকছ তবে।'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন—'

'বুঝেছি।'

'বসবাস করতে এসেছি তোমার এখানে। বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কেন হল?'

'হয়ে গেল।'

'আর যাবে না ওখানে?'

'বোকার মত কথা বলছ কেন ক্ষেমেশ?'

'একেবারেই ছেড়ে এলে, অথচ বিয়ে করেছিলে। বিয়ে করবার সময় মানুষের মন সমুদ্রের ফিনফিনে কাঁকড়ার মত পথ খুঁজে পায় না—ফেনাবাতাস ওড়ে?'

'সেই রকমই উড়েছিল ক্ষেমেশ, দেখছ তো।'

টি-পট থেকে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে জয়ন্তী বললে, 'চলে এসেছি। চলে এসেছি কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আইনের মারপ্যাঁচ আপাতত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু আইন বেআইন সবের ওপরেই মানুষের মন। আমি ওখানে আর যাব না।'

ক্ষেমেশ চায়ের পেয়ালা একবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আবার কি মনে করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঘুরছিল যেন অনেক পাখি, অনেক ছবি ক্ষেমেশের। সেই সাত সকালে রানী সারসদের কথা মনে পড়েছিল তার। মনে হতেই কেমন বোশেখী বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেছিল তারা, অন্য সাংসারিক দশ কথার চাপে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে রাজসারসদের কথা মনে পড়ল ক্ষেমেশের আবার। এখানে যদি একপাল রানীসারস চলে আসে এখন! তা যদি হয়, তাহলে আর কিছুই চায় না, কেমন যেন এক মন্ত্রসিদ্ধি জানা আছে ক্ষেমেশের যাতে সে সমুদ্র হতে পারে, হতে পারে সিন্ধু ফেনা, উজ্জ্বল সূর্যের দিন, কত শত সারস শরীর মনের কত বিশ্বম্ভর আগুনে বাতাসে নক্ষত্রে বর্ণালিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

জয়ন্তী চা খাচ্ছিল—টি-পটের থেকে শেষের তলানিটুকু ঢেলে নিয়ে—মাথা হেঁট করে। ক্ষেমেশের মুখের দিকে তাকাবার কথা মনেই ছিল না তার। নিজেরই নিতান্ত সব—কি যেন ভাবছিল জয়ন্তী। ক্ষেমেশ এখনও সারসদের কথা ধ্যান করছিল—জয়ন্তীরও কথা। ও সব রানী সারস বাংলার পাখি নয়, কিন্তু অলোকসামান্য পাখি : জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে যে সব বহতা নদীর জল ছলকে জলছানি দিয়ে নীলিমাকণিকা সূর্যগুড়ির উচ্ছ্বাসে উৎফলিত হয়ে পাথর উল্টে, শ্যাওলা ছিঁড়ে পায়রাচাঁদা চাপেলী নাচিয়ে শরবন কাঁপিয়ে কলরোল করে চলেছে, সে সব অবিরল জলঠাণ্ডার দেশে জলগন্ধের দেশে—জলঠাকুরানীর—জলদেবীর—নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের ভেতর এই সব পাখি থাকে। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মোড় ঘুরে গেল ক্ষেমেশের অর্থ ও অন্তঃসার বদলে গেল, এতক্ষণ যে ক্ষেমেশের ভাবনা-তন্ময়তা অবাস্তব ছিল তা নয়, কিন্তু আমরা যাকে বাস্তব বলি প্রায় সেই প্রদেশে ফিরে এল ক্ষেমেশের মন। সাগর সূর্য পালক পশম কি এক দিব্য ফোকাসের আলো অন্ধকার থেকে উদ্গত হয়ে যে জয়ন্তীর সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে হঠাৎ তা টের পেয়ে মনের ভাবনায় থেহয়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল—একটু শব্দ করে হেসে ফেলল ক্ষেমেশ।

জয়ন্তী ঘাড় হেঁট করে নিজের মনের পথে হেঁটে অনেক দূর চলে গিয়েছিল যেন—ক্ষেমেশের হাসির শব্দ শুনতে পেল না সে হয়তো ক্ষেমেশের দিকে ফিরে তাকাল না। কেমন সুন্দর সব—পাঁচটিকে—এমন কি ছটিকে ছাড়িয়েও কেমন যেন এক সপ্তম ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছিল যা এতক্ষণ ক্ষেমেশকে সুন্দর জয়ন্তীও : ভাবছিল ক্ষেমেশ ; কিন্তু তবুও দুটো মনচ্ছবি যদি ওরকম ওতপ্রোতোভাবে মিশে যায় (জয়ন্তীর শাড়িটা রোদে ছায়ায় যে রকম কমলা বাসন্তী সাদা গেরুয়া আভার দেখাচ্ছে তাতে না মিশে পারে না আর।) জয়ন্তীকে তাহলে পাখিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার শক্তি থাকে না আর—দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেমেশের এমনই স্খলন হয় যে সুন্দর জিনিস দেখেও হাসি পায় তার, হাসি মুছে যায় আস্তে আস্তে ছায়া পড়ে হৃদয়ে—কেমন যেন করুণার পাত্র মাঠ বন পাহাড় মৃত্যুর পাখি—আর এই জয়ন্তী পাখি—দেখ, কেমন মাথা উপুড় করে চুপচাপ কথা ভাবছে। হাসল না এবার ক্ষেমেশ, মন করুণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার। তবুও তারপর আগাগোড়া এই সব পাত্রপাত্রীর দিকে এবং এই সকলের দিকে তাকিয়ে আছে যে ক্ষেমেশ তার দিকে তাকিয়ে পরিহাস বিশুদ্ধি পেল তার—দুর্নিবার ব্যাপ্তি পেল হাসির বলয়। এই সচ্ছল,

অনুপম বিমুক্তি না থাকলে করুণ। এসে মানুষকে বেশি নিস্তব্ধ করে ফেলে—নিজেকে এই পৃথিবী গ্রহের উপযুক্ত মনে হয় না আর।

'আমি মাকে এলাহাবাদ থেকে এখানে নিয়ে আসব। তোমরা এক সঙ্গে থাকবে। আমি আজই যদি এলাহাবাদে যাই রঞ্জন তোমার ঘরের রোয়াকে শোবে।'

'না, মাসিমাকে এখানে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'ওঁরা হলেন সেকালের লোক। মুখ দেখাতে পারব না।'

'কিন্তু মুখ দেখাবার দরকার হবে তো—পৃথিবীতে থাকতে হলে। চেড়ীরাজ্যে অশোকবনে ছিলে—চলে এসেছ। তোমাকে ঘিরেছে কেমন একটা আচ্ছন্ন অশোকবনগ্রন্থি—সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

জয়তী একটু হেসে বললে, 'সত্যিই কোনো গ্রন্থি নেই আমার—পণ্ডিতরা যেই বলুন না কেন। মাসিমাকে এখন এলাহাবাদ থেকে আনার দরকার নেই।'

'এক-একটা পুরোনো দালানে নাগকন্যা থাকে। চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না যে রূপ মানে অত রূপ। কিন্তু চোখে তাকে দেখা যায় না। জয়তী, তোমাকে তো দেখেছি। তুমি কি করে মানুষের চোখ এড়িয়ে নাগকন্যা হয়ে থাকবে?'

'চোখে তো দেখছ,' রোদের ভেতর ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ঘুম এল না—আলাদা পটভূমি এল আলাদা সূর্য জেগে উঠল জয়তীর মনে; কিন্তু পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়, এই সূর্যই তো; আকাশের দক্ষিণ কিনারে—দূরত্বে—কাছেই; জয়তী আস্তে আস্তে বললে, 'সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ কে?'

'সুতীর্থ গুপ্ত—চেন না?'

'ওঃ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।'

'বিরূপাক্ষের একটা বাড়ি আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'কটা বাড়ি ওর?'

'গোটা তিনেক।'

'এর ভেতর একটা তোমার?'

'হুঁ, আইনত, দলিলপত্র আমার কাছে আছে।'

কথাটা ক্ষেমেশের কানেই গেল না যেন—কাছেই একটা সজনে গাছের হালকা ডালে ঘাসের চেয়েও বেশি গাঢ় সবুজ একটা পাখি এসে বসেছিল। সচরাচর এরকম পাখি দেখা যায় না—কেমন একটা হেমন্তগভীর দৃষ্টিলাবণ্য নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ: কি নাম এই পাখিটার? বাংলা নাম কি?

'পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাঙ্কে তোমার নামে রেখেছিল বিরূপাক্ষ?'

'রাখিয়েছিলুম।'

'কোন ব্যাঙ্কে? গিয়ে খতিয়ে দেখেছ তো নিজের চোখে—'

'লয়েডসে, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ায়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আরো আছে এদিকে সেদিকে। ঠিক আছে।'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?'

'না। ভেকেণ্ট পজেশন।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'বালিগঞ্জে। ভাড়াটে বসাব নিচের তলায়। ওপরে তিনটে কোঠা আছে—আমি থাকব।'

ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে একটা উড়ন্ত আগন্তুক পাখির দিকে নিঝুম হয়ে তাকিয়েছিল; কি প্রগাঢ় নীলের তেজ কেমন ফিকে নীলে মিশে গেছে; কমলা লেবুর রং সোনালি হয়ে যাচ্ছে; বুকের কাছে দুধের মত সাদা পালক। কী নাম এই পাখির?

'বিরূপাক্ষের টাকা তুমি না নিলেও পারতে হয়তো জয়তী।'

'কেন?'

'টাকাই কি সব?'

'সব নয়? মাস্টারি করে খেতে বলছ হয়তো আমাকে, অথচ নিজে তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার বাবার পঞ্চাশ হাজারে তো চালাচ্ছ।'

'বিরূপাক্ষের মতন একটা মানুষ—ওর টাকা তো ভদ্র অভদ্র সব ঘরের ঝাঁট টেনে আদায় করা।'

'তার মানে?'

'মানে—ওটা আমার একটা উপমা।'

'উপমাটা বেল্লিকের মত হল। বিরূপাক্ষের টাকা ছুঁলে আমার কুষ্ঠ হবে

না। পঁচিশ লাখ টাকা—তিনটে বাড়ি—বাড়িগুলো—সমস্ত সম্পত্তিই তো আমার প্রাপ্য। টিঁকে থাকলে পেতুম সব—কিন্তু সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি : মানুষের প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায় বলে।'

জয়তীর কথা শুনে সেই পাখিটার দিকে ক্ষেমেশ ফিরে তাকাল আবার। পাখিটা একা কেন ? ক্ষেমেশের বাড়িতে—সমস্ত বেলগাছিয়া তল্লাটে—সময়ের প্রবাহের ভেতরেই কেমন একটা অপরিচিত যেন পাখিটা। এসব পাখি তাহলে জন্মলাভ করে! হাওয়ার ভেতর থেকে ? কেউ আছে ? কাছে লুকিয়ে ? সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?

'তুমি বড় ভালগার ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ চমকে উঠে জয়তীর দিকে তাকাল। 'আমি ? কেন, কি করেছি বলতো জয়তী ?'

'কি করেছ তুমি ? যা করতে পার তাই করেছ। ভেবেছিলুম বড় হবে,—এড়িয়ে যাবে। ছি, ছি, বড্ড নোংরা। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।'

'কিন্তু কয়েকটা বছর বিরূপাক্ষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে তো তুমি। তা যদি সম্ভব হল—'

জয়তীর কান্নার সাড়া—খুব অস্ফুট—টের পেয়ে ক্ষেমেশ কথা বলতে বলতে থেমে গেল।

সাতাশ

অনেক রাতে মুখার্জি সুতীর্থকে তার বাড়ির ফটকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। নিচের সদর দরজা খোলাই ছিল—দোতলার কোলাপসিবল গেটও। ওপরে উঠে সুতীর্থ দেখল তার ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল মণিকা সুতীর্থের সোফায় বসে আছেন।

'এতো রাতে তুমি এখানে।' সুতীর্থ বল্লে।

'তুমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে ;' মণিকা বল্লে, 'একবার বল্লেও না কোথায় যাচ্ছ—'

'আমি তো গ্রেফতার হয়েছিলুম—'

'পালিয়ে এলে বুঝি তারপর ?'

'মনটা কেমন জোর হারিয়ে ফেলেছে ; কেমন হয়ে গেছে যেন—'

'তা তো দেখছিই। মুখ পুড়ে কালি হয়ে গেছে, খুব কড়া রোদে ধর্মঘট করছিলে বুঝি।'

'অনেক কথা আছে। জ্যোতি কি জেগে আছে ?'

'না।'

'অংশুবাবুর টান ওঠেনি তো ?'

'আজ রাতে একটু ঘুমুচ্ছেন।'

'ব্রোমাইড দিয়েছিলো বুঝি ?'

'না, ডাক্তার এসে একটা মিক্সচার দিয়ে গেছেন। তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াচ্ছি। আগে ইনজেকশন দিয়ে গেছলেন।'

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি আমি চলে যাবার পর ?'

'ডাক্তার তো ডাকতে হল।'

'সারারাত তুমি জেগে আছ ?'

'রোজই তো জাগি। চা দিতে বলব জ্যোতিকে। যাই উপরে। বলি—'

'অংশুবাবুকে ওষুধ দেবার সময় হয়েছে ?'

'না। এই দিয়ে এলুম। আর তিন ঘণ্টা পরে।'

'তাহলে এইখানে তোমাকে বসতে হবে। আমার চায়ের দরকার নেই।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়েছিল—সোফার এক কিনারে—শীত ধরেছে বলেই খুব সম্ভব আঁট-সাঁট হয়ে বসে বল্লে, 'বসছি। তুমি ওদিককার সোফায় বস। উনি যদি জেগে ওঠেন, টের পাবে তুমি। আমি কানে কম শুনতে শুরু করেছি। তাছাড়া, তুমি আমার চেয়ে হুঁশিয়ার সুতীর্থ। উনি জেগে উঠলে আমাকে খবর দেবে। তুমি মোটরে এলে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তুমি তো এই ঘরেই ছিলে ?'

'না। দরজায় মোটর থামল, তাই নেমে এলুম। ওপর থেকে দেখেছি আমি সব। ও লোকটাকে তুমি কোথেকে জোটালে সুতীর্থ ?'

'কার কথা বলছ ?'

'যে তোমাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল।'

'ও তো মিঃ মুখার্জি।'

'চিনি আমি।'

'তুমি চেন !'

'এ বাড়িতে ভাড়াটে ছিল—'

সুতীর্থ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'তাই তো তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'জিজ্ঞেস করবেই তো ; ওর মুখে আমি চাবুক মেরেছিলুম।'

'বটে ? কেন ?'

'চাবুক হাতে ছিল—তাই।'

সুতীর্থ মণিকার নিরবচ্ছিন্ন চুলের কালকেউটে জড়ানো মাথার দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ক বছর আগে হল এ সব ?'

'বছর পনেরো হবে।'

'তখন তুমি না জানি কিরকম ছিলে, মুখার্জির কি অন্যায় ?'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'আজো তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। অংশুবাবু তোমার স্বামী শুনে কেমন কেমন যেন হয়ে গেলো। কেন, ও কি জানে না যে অংশুবাবুকে বিয়ে করেছ তুমি ?'

'কেন, কি বলছিল ?'

'অংশুবাবুকে চেনে না মনে হল।'

'তা না চেনারই কথা।'

'কেন, এ বাড়ির ভাড়াটে তোমাকে চেনে, চিনে চাবুকও খেয়েছে। আর অংশুবাবুকে চিনবে না ?'

মণিকা বল্লে, 'এত রাতে মুখার্জির সঙ্গে মোটরে ঘুরে কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে ফিরলে সুতীর্থ ?'

'আমি যা জিজ্ঞেস করলুম—'

'অংশুবাবুকে ও দেখেনি ? না যদি দেখে থাকে সেটা আমার বরাত। ও তাকে না চিনলে আমি কি করব বল।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'এটা কোনো উত্তর হল না। পূবের জানালা দুটো খুলে দিই। বড় গুমোট।'

'তা হলে তো রাস্তার লোক টের পাবে এত রাতে ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে এখানে বসে থাকা—কথা বলা—চারদিকে নানা রকম নমুনার লোক আছে—'

'যা খুশি বলুক গে, আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি তো স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু আমি তো আমার কথা না ভেবে পারি না।'

'বাঃ, বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে রাতে তিনটের ; মাঘ গেল—ফাগুন এসে পড়েছে—'

'মুখার্জির মত একটা বদমায়েসের সঙ্গে মোটরে টহল দিয়ে বেড়ানো হচ্ছিল রাতবিরেতে। মুখার্জির বাঙালীয়ানা তো অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। ও তো দালাল—সাহেবপাড়ার দালাল।' মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'এ বাড়িতে ভাড়াটে থাকতে ছত্রিশগড়িয়া ভাষায় কথা বলত কে একটা মেয়েকে নিয়ে—'

'ওর বউ ?'

'না। মেয়েটার ধবল ছিল।'

'ধবল ? ধবলকুষ্ঠ ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'মুখে নয়—অন্য কোনো জায়গায়।'

'ও, ধবল ছিল বুঝি' ; সুতীর্থের জানালার কাছে গিয়ে বাইরের কলকাতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে দেখিয়ে গেল বুঝি সেই ছত্রিশগড়িয়া মেয়েটি ?'

'আমাকে দেখাবে না ? আমাকে না দেখালে চাবুক খাবে কি করে তার মিনসে ?'

সুতীর্থ মোটা সোজা রাস্তাটার দুধারি ঘন গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে শেষ গ্যাস লাইটগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, কোনো কথা বললে না।

'ফিরিঙ্গি মেয়েরা আনাগোনা করত এ বাসায় তখন। মদ খেত গোরু শুয়োরের মাংসের মৌতাতে ড্যাকরা মিনসেগুলোর সঙ্গে মিশে। কথা বলত চিড়িয়াখানার টিয়ে চন্দনাগুলোর মত ডাকসাইটে চীৎকার পেড়ে—'

সুতীর্থ জানালার পাশেই বসেছিল, মণিকার কথা শুনছে কিনা বুঝতে পারা গেল না, কোনো উত্তর দিল না ; চিন্তিত হয়ে নেহাতই কোনো মন্ত্রগুপ্তির সাত পাঁচ ভাবছিল মনে হচ্ছিল।

'সুতীর্থ, তোমার স্ট্রাইক বুঝি এখন পাতালে ভোগবতী ?'

'কি করতে বল স্ট্রাইক সম্বন্ধে তুমি ?'

'আমি কিছু বলি না।'

'পরামর্শ দেবে না ?'

'আমি কি দেব ?'

'স্ট্রাইকফাইক ভেঙে ফেলে আমাকে আবার কুণ্ডু মল্লিকের সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিপার্টমেণ্টাল ইন-চার্জ হয়ে বসতে বল তুমি ?'

'আমি ? কেন ? তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে।'

'কেন, মুখার্জির সঙ্গে রাতে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে তো আমার। কফি হাউসে গেলুম, ফার্পোতে গেলুম, চীনে টাউনে টহল দিলুম, হুমায়ুন প্লেসে গিয়ে ক্যাসানোভা হয়ে তারপর অলিগলিতে ঘোরা গেল। নানারকম নিউম্যাটিক বুননে গিয়ে বসলুম বাঙালী চীনে ইহুদি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের —বেশ ভালো লাগল আমার—'

সুতীর্থ ঝোঁকের মাথায় কথা বলছে টের পেল মণিকা ; কিসের থেকেই বা থিতিয়ে উঠছে এই ঝোঁক ? সুতীর্থের মনের নিথিতির থেকে ? কিন্তু সেই নিথিত মনকেই নির্মাণ করছে সুতীর্থ আবার। ঢেলে সাজিয়ে যা ইচ্ছে তাতে ওর মনের আগেকার সেই বর্তমান দৃঢ় বয়স্কতা ভেঙে যাচ্ছে, সেই সময়কার দুচারটে বিহ্বলতারও জড় মরছে না। বলছে বটে, কিন্তু তবুও মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি মিশ খেতে পারে নি সুতীর্থ; সেটা অসম্ভব।···কথা বলতে বলতে সুতীর্থ নিজের সোফায় এসে বসল।

মণিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল সুতীর্থকে, কিন্তু বলা হল না, গায়ের লেডিজ কোটটার বোতাম আঁটতে আঁটতে মণিকা বললে, 'আমার সময় নেই। কি কথা তোমার বলে ফেলো। রুগী মানুষ ওপরে রেখে এসেছি।'

'স্ট্রাইকটা হামিদের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?'

'তুমি বেরিয়ে আসবে ?

'হ্যাঁ।'

'সেটা তুমি বুঝে দেখ।'

'মনটা তোমার কেমন ভারি হয়ে আছে মনে হচ্ছে মণিকা দেবী।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি অফিসে অনেক দিন কামাই করেছি। কিন্তু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক আবার কাজে ডেকেছেন আমাকে। তাঁর অফিসের চাকরিটা নেব আবার ? কি বল তুমি ?'

মণিকা কোনো কথা না বলে আলস্টার খুলে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে আবার উঠবার উপক্রম করল। কিন্তু বসে থেকে বললে, 'সারা রাত বিছানায়

শুয়ে বসে মীমাংসা করতে পারবে সুতীর্থ তুমি? শীতের রাত আছে—লম্বা রাত আছে—?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মণিকা—

'বিরূপাক্ষ আজ রাতে এসেছিল?'

'বিরূপাক্ষ?' মণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কে?'

'কেন, আমার বন্ধু; তার কথা বলিনি আমি তোমাকে?'

'কার স্বামী বিরূপাক্ষ?'

'পত্নী পরিচয় তো জানা নেই। কিন্তু পরশু রাতে ক'টার সময় সে চলে গেল?'

মণিকা এক নিমেষের জন্যে নিজের মহৎ সম্বিতের ভাবটা হারিয়ে ফেলল। দুচার মুহূর্ত কেটে গেলে পরেও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে সময় লাগছিল তার; মণিকা উপলব্ধি করল যে দু মিনিট আগেও মনের যে অবস্থা ছিল তার সেটা ফিরে পেতে কত সময় লাগবে তা সুতীর্থের ওপর নির্ভর করে অনেকটা: কী দেখেছে সুতীর্থ? দেখে কী ভেবেছে? বিরূপাক্ষ ও মণিকাকে পাশাপাশি একই সোফায় অত রাতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে সুতীর্থ যে মতামতে পৌঁছেছে সেটা ছেলেমানুষী হবে না—ভালো জিনিসই হবে ক্রমে ক্রমে আস্তে সুতীর্থের দিকে চোখ তুলে তাকাল মণিকা।

'তুমি দেখেছ?' সুতীর্থকে বললে। 'কটার সময়ে এসেছিলে রাতে?'

'অনেক রাতে।' সুতীর্থ বললে।

'কোনো কথা বলবার নেই আমার', মণিকা দাঁড়িয়েছিল; সোফার এক কিনারে বসে বললে, 'তুমি তো দেখেছ; আমি শুধু এই—' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিকা বললে, 'না, কিছু আর বলবার নেই আমার।'

'পরশু রাতে ঐ জায়গায় ঐ সময়ে আমি না এলেও পারতুম। মানুষকে অপ্রস্তুত করে যে জ্ঞান—তাতে আলোর চেয়ে আলোর মাছি ঢের বেশী।'

'তুমি এসে পড়াতে—সেদিন অত রাতে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এসে পড়াতে—' মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে আলস্টারের পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে ফেলতে বললে, 'তোমাদের কাছে আমি খালাস হয়েছি।'

'হয়েছ?' সুতীর্থ আড়চোখে মণিকার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে।

কোটের পকেট থেকে কয়েকটা এলাচ ও লবঙ্গ তুলে দিল সুতীর্থকে মণিকা। সেগুলো জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুতীর্থ।

মণিকা একটু হেসে বললে, 'বিরূপাক্ষ নাক ঢেকে খেলা করতে চায় মানুষের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু তবুও বাইরের সমাজে তার বিবেক বলে কোনো জিনিস নেই; যা তা রটিয়ে বেড়াতে পারে যেখানে সেখানে—কিন্তু তুমি এসে নিজের চোখে দেখলে তো সত্য কি। তুমি পরশু রাতে ছিলে—দেখেছিলে—ও জানে? না জানলে ওকে জানিয়ে দেবে।'

সুতীর্থ ঘাড় হেঁট করে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে কোনো এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কাউকে কিছু বলতে যাবে না। বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়—কিন্তু নাড়ীজ্ঞান আছে। ওর টাকা তো এই সবের জন্যেই, নিজের আসল ভাঙিয়ে খেতে যাবে বিরূপাক্ষ?'

'তুমি কি বলছ সুতীর্থ?'

'আমার কিছু বলার দরকার নেই। বিরূপাক্ষ আমার কাছ থেকে হুঁশিয়ারি শিখবে? তবেই হয়েছে। সে নিজে জানে কত।'

কটকটে সূর্যের ঝাঁঝ যেন হঠাৎ চোখে এসে লেগেছে এরকম মাছের মত সচকিত হয়ে সুতীর্থ জলের ভেতর ডুব দিল আবার নিস্তব্ধতার ভেতর।

'তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?'

'করি যদি কি এসে যায় তোমার?'

'তোমার নিজের কিছু এসে যায়?'

সুতীর্থ মাথা হেঁট করে বললে, 'আমি তো পাশগাঁয়ের সুতীর্থ গুপ্ত। আমার স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। এইবারে তাদের কলকাতায় আনতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতে কি থাকব আমি? এ বাড়িতে তো গন্ধগোকুল ঢুকেছিল; জুঁই ফুলের পাপড়ি শুঁকে সেটা বোঝা শক্ত হবে; কিন্তু মুশকিল হবে ঘেঁটু ফুলের বেলা। তার তিতো গন্ধটা তার নিজের না পরের কে কবে কতবার করে তা ঠিক করে দেবে?'

'এ কি কথা—কি হিজিবিজি পরিভাষা তোমার সুতীর্থ?'

'কথার ভেতর ডুবে যেতে হবে তোমাকে। তুমি—'

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, ধোঁয়ার মত কথা বানিয়ে বলো না। তুমি বিরূপাক্ষকে জিজ্ঞেস করো।'

সুতীর্থ হাঁটতে হাঁটতে জানালার দিকে সরে গিয়ে বললে, 'কি দরকার

আমায় জিজ্ঞেস করবার। তুমি যা বলেছ তার চেয়ে বেশী কি বলবে বিরূপাক্ষ আমাকে? সব শুনে বিরূপাক্ষ কি বলে শুনতে হবে আমাকে?'

'কি শুনেছ তুমি। আমি যা বলেছি তা যদি শুনে থাক, তা হলে তো আমাদের কথা ফুরিয়ে গেল। এখন অন্ত কথা পাড়।'

সুতীর্থ নিজের সোফায় ফিরে এসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে দু-চার পা হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবার।

'তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছ না সুতীর্থ।'

সুতীর্থ পুবের দিকের জানালা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল; শীত রাতে কোনো বাতাসের প্রত্যাশায় নয়; এমনিই। বসতে পারছিল না সে।

'ওটা কি তোমার অভ্যেস? ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

'বসে আছ তুমি মণিকা দেবী; বেশ তো বসে আছ তুমি। আমি পিরালি বামুনদের পরিবেশন করছি। বসে বসে কি করে তা করব?'

'কি পরিবেশন করছ; মনের সন্দেহ? সন্দেহ ছাড়া কি আর দেবে তুমি কাকে। তোমার মনের সন্দেহ ঘুচল না—'

'এইবারে ঘুচিয়ে ফেলছি', সুতীর্থ বললে। 'বিরূপাক্ষের চোখে লাগছিল বলে সে আলো নিভিয়ে দেবে—আর সেই অন্ধকারের ভেতর বসে থাকবে দুজনে রাত দুটো অবধি?'

'বলেছিল তার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোবার আগে ঘরটাতে অন্ধকার থাকলেই ভালো। আর ভালো মন্দতে অবিশ্যি এসে যাচ্ছিল না আমার। সুতীর্থ—'

আটাশ

সুতীর্থ যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল, অস্পষ্ট চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাতে তাকাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যেন তার চোখ—সন্দেহে না সাহসে পৃথিবী মিথ্যে এই ব্রহ্মোপলব্ধিতে—না সবই সত্য এই সঙ্কল্প স্থিরতায়?

'খুব বেয়াদবি হল বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষের। কিন্তু মানুষকে কখনো শিশুর মতন মনে হয়। আমরা নারীরা মায়ের মতন—' মণিকা বললে, 'বিরূপাক্ষ যে মতলব নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেটা প্রথম রাতেই তার চেহারা দেখে বুঝেছি আমি। বাতিটা নেভাও সুতীর্থ।'

বাতি নেভাতে গেল না সে।

ঘরের বারান্দার সবদিকের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে খুব বেশী অন্ধকারের ভেতর মণিকা বললে, 'আমি তোমাকে সেদিনকার কথা বলব শোন। এর ভেতর কিছুই নেই বলেই না বললেই ভালো হত; কিন্তু তবুও তোমার শোনা দরকার। তুমি সে রাতে এমন সময়ে এসে এমন অবস্থা দেখেছ যে, নিজের কাণ্ডজ্ঞান বা মর্মজ্ঞানে যখন কিছুই বুঝলে না—অগত্যা সবই তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে আমার।'

সেদিনকার ব্যাপারটা সত্যিই জলের মত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল মণিকা। মণিকা যে সত্য কথা বলছে উপলব্ধি করল সুতীর্থ। কোথাও কোন খিচ রইল না আর।

মণিকা তারপরে বললে, 'আমায় উইল দেখিয়েছে, উইল শুধরে দিতে বলেছে, ওর বিষয়সম্পত্তির ট্রাস্টি হতে বলেছে বিরূপাক্ষ। চেক কেটেছে, ভাঙিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি মানুষকে সহজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা বলি: চাকরটা খুব বিশ্বাস, নায়েবমশাই বেশ বিশ্বাসী মানুষ। বিরূপাক্ষের কথাবার্তা কাজকর্ম দেখে সব সময়ই প্রায় আমার মনে হয়েছে চাকরটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও বুঝেছি চাকরটা মোটেই বিশ্বাসী নয়।'

মণিকা হাই তুলে কুঁড়েমি ভেঙে বললে, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে ছিল ও সব। যেমন নীলু চাকর—বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী, রামচরণ খুব ধর্মভীরু। কোথায় গেছে সে সব।'

মণিকা আগে তুড়ি দিয়ে তারপর আলসেমি ভাঙতে লাগল; হাই ছাড়তে লাগল একটার পর একটা; অনেক আলসেমি জড়ো হয়েছে শরীরে।

'তুমি ঘুমোলে তোমার সোফায়, গেল বিরূপাক্ষ?'

'তাই তো গেল, না হলে এল কখন? আমি জেগে থাকতে আসেনি তো।'

'ঘুমোলে কেন?'

'ওকে দিয়ে কোনো পাপ হবে না জেনেই ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম এসে পড়ে আমার, সেদিনও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ মুখার্জির মত হলে ঘুমের আগে ওপরে উঠে যেতুম আমি।'

'যে পাপী তাকে দিয়ে পাপ হবে না নিষ্পাপিনীরা কি তাই মনে করে? কে বললে, তাই মনে করে?'

'তুমি ওরকমভাবে প্রশ্ন করলে আমি কথা বলব না।'

'অনেক নিরপরাধিনী তো আমি দেখেছি।'

কোনো কথা বলল না মণিকা।

'তারা তোমার মতনই সতর্ক।'

সুতীর্থ অপোগণ্ডের মত কথা বলে ভাবছে সেটা শ্লেষ—ভাবছিল মণিকা; কি উত্তর দেবে—মিছে উত্তর খুঁজে মরছিল না তার মন।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?'

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না মণিকাকে। সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে? সুতীর্থের প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিতে গেল না, বলেছে যা বলবার। আর কিছু বলবার নেই।

'বিরূপাক্ষকে সামনে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে।' মণিকা উঠে দাঁড়াল।

'বিরূপাক্ষের লালা তোমার ব্লাউজের ওপর লেপটে পড়েছিল সেদিন। তার মাথা তোমার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু ঘুমন্তকে যদি ঘুমন্ত বিষ খাওয়ায় কিংবা অমৃত তাতে কার কি অপরাধ?'

'দেখেছি আমি—তুমি খুব বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে সেদিন।' মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর নিঃশব্দে নিজ মনে পায়চারি করছিল—

'এত ঘুমের ভেতর কেউ যদি কিছু করে ঘুমন্তের সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়। থেকে যায়?'

আর কিছু বলবে না ভেবেছিল সুতীর্থ, কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে তার এই কেমন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল বলে একটু কুঁকড়ে গেল সে। সে জানে, মণিকা কিছু করে নি। তার স্বচ্ছ ধারালো অন্তর্ভেদী চোখ সত্য দেখেছে; সে সত্য সৎ। মিছিমিছি তবু কথা বাড়াচ্ছে সুতীর্থ?

'কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে বেশী কথা শুনতে চাও তুমি, বারবার শুনতে চাও। কিন্তু যা বললুম এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার নেই আমার।' বলতে বলতে মণিকা শীতের রাত ভেঙে বনঝাউয়ের মত শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে গেল যেন যেখানে কোনো অভিজিৎ নক্ষত্র নেই সেই তেতলার অন্ধকারের ভেতর।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল সুতীর্থের—অনেকক্ষণ আগে। সে

জ্বালাল না আর। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট করুণার সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত জননীর মত সেই শিশুর, বসে রইল সে। মোটামুটি এইরকমভাবে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। তারপর আর খারাপ লাগছিল না তার। ভালো না লাগবার কথা নয়। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল স্তীর্থের ঘরের ভেতর যেন একটা রাধাঠুঁটী পাখি ঘিয়ের মত ডানা পালক মেলে ঝরঝর জলজল ঝরঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরের মত শব্দে কথা বলে গেল। স্বচ্ছ জল সেই নদীর নির্ঝরের শব্দ—নির্মল, শাশ্বত।

তন্দ্রায় ঢুলে ঢুলে পড়ছিল স্তীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টার মশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ—চাকরটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী; রামচরণ খুব ধর্মভীরু; কোথায় গেছে সে সব? অনেক ওপরের হাওয়ার থেকে কে যেন বলছে এই সব তন্দ্রায় ঢুলে মনে হল স্তীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির ময়দানে—নিশুথির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা—কী স্থিত দাঢ্য নিবিড় অনন্ত আকাশ সন্ধির অবিরল হাওয়া—অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে—তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুরছে। কিন্তু স্তীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু বরফের মত শাদা, বেলফুলের মত ঝর্ঝরে পাখিদের পালক, জুঁয়ের মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোনো রক্ত নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মার এক মেয়েমানুষের নিবিড়তর বাতাসের ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে স্তীর্থ—কোনো শরীর নেই সেই নির্ঝরের ভেতর—কোনো সময় নেই সেই অপরিমেয় আলোয়—অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।

পরদিন সকালবেলাও নিজের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রোদের ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল স্তীর্থ।

'কটা বাজে স্তীর্থ?' মণিকা জিজ্ঞেস করল।

স্তীর্থকে নিরুত্তর দেখে মণিকা বললে, 'তোমার হাতঘড়িটা দেখছি না তো।'

'আছে।'

'কোথায়?' মণিকা দেরাজ খুলে বললে, 'এখানেও তো নেই।'

'তাহলে চুরি হয়ে গেছে।'

'স্ট্রাইক ফণ্ড ছাড়া আর কোথাও চুরি হবার জায়গা তো দেখছি না। অমন দামী জিনিসটা দিয়ে দিলে?'

মণিকা কাল রাত্রের সেই সোফার ঠিক নির্দিষ্ট কিনারা দখল করে বসল। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত রৌদ্রের অদ্ভুত জেল্লায় ঘর বার ভরে গিয়েছিল সব। ফাল্গুন আসেনি এখনও—তবুও বাতাসে তার অস্পষ্ট দিব্যতা—কেমন স্নিগ্ধ আগুনের ঘ্রাণ—মাঝে মাঝে করুণ আগুন। রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে—বাকি সব বিশ্বম্ভর প্রকৃতির; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ীর নীলাম্বর যেন।

'হাতঘড়ি মানুষের কব্জিতে খুঁজতে হয় নাকি?'

সুতীর্থের ঘড়ি তার শার্টের আস্তিনের নিচে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'কাল রাত থেকে বড় মনের ধাঁধায় আছি সুতীর্থ। সবই কেমন বেভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি ধাঁধা?'

'এখন কটা বেজেছে?'

'নটা।'

'এই ঘুমের থেকে উঠলে বুঝি?'

শার্টের হাতার বোতাম খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে সুতীর্থ। 'সাত মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।'

'আমি তো দেখেছি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি। আমি চলে গেলুম। তুমি ঠায় বসে রইলে; এখনো বসে আছ। কেন?'

'তোমার কথায় মনে পড়ে গেল: ঘড়িটা খাঁটি সোনার—অনেক দাম হবে এখনকার বাজারে। দেব ধর্মঘটীদের?'

'ওটা কোনো কাজের স্ট্রাইক নয়—'

'ওরা বোকা, তা আমি জানি। কিন্তু ওদের পরিবার তো না খেতে পেয়ে মরছে—'

'সে সব ভাবনা মুখার্জির হাতে ছেড়ে দাও। ও-ই তো ফ্যাক্টরির মালিক। মানুষ নয়, কিন্তু মিটমাট করবার শক্তি মুখার্জির আছে, তোমার নেই।'

'তার মানে?'

'তুমি তো চাঁদের বুড়ীর চরকার বাতাস—'

'রূপকে কথা বলছ মণিকা—'

'এ রূপকের কোনো মানে নেই বুঝি?'

'কি মানে?'

'তুমি যা চাও তা কি করে পাবে? কেউ কস্মিনকালেও তা পায় না। স্থান কাল জিনিস বিচার করে কাজ করতে হবে তো। এ সব ধর্মঘটীরা কে? কেমন হৃদয় মন? কি শিখেছে তারা? কতদূর জানে? না খেতে পেয়ে সুকটি মরেছে, তবুও কথা বলে বলে ওদের মন মজানো হচ্ছে এমনিই, যেন কথা খেয়েই থাকতে পারবে এই-ই মনে করা ওরা। মুখুজ্যে যদি আরো কিছুদিন গোঁ ধরে থাকে, কিংবা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে এখুনি যদি কিছু রফা করে নেয় তাহলে কথা-গেলা হাড়গিলের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুখুজ্যের কোলে আদর খাবার জন্যে। মুখুজ্যে ছাড়া ওদের কোনো মিটমাট হতে পারে না।' মণিকা বললে, 'মিছেমিছি কেন বক্তৃতা দিতে যাও?'

উঠে গিয়ে একটা জানালা বন্ধ করে এল। কড়া রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে। 'তোমার বক্তৃতা শুনিনি কোনোদিন আমি। কেমন দাও?'

'আমার নিজের কানে তো মন্দ শোনায় না।'

'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বল?'

'এমনি, খালি গলায়। থাকে মাইক মাঝে মাঝে—'

'বক্তৃতা দিতে পার, কোনো পার্টিতে ভিড়ে গেলেই তো হয়। যদি বিশেষ কোনো বালাই না থাকে তোমার মনে তাহলে তো সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাবে। সেই-ই তো সবচেয়ে সোজা পথ—টিট পাখিদের পক্ষে। কাজ করবে চাকরবাকর চেলা চেংড়ীরা; পল্লী-সংগঠন, ধর্মঘট, শিল্পবিপ্লব, রক্তবিপ্লব—ওদের হাতে ছেড়ে দাও সব। কথা বলে হদ্দো মাত করে রাখ।'

'তোমার চেয়ে ভালো কথা আমি বলতে পারি?'

'তোমরা বাইরের পৃথিবীর মানুষ।'

'তুমিও বাইরে চলো না আমার সঙ্গে।'

'সে রকম একটা রক্তবিপ্লব হলে আমাকেও নামতে হবে।'

'বড় বিপ্লব হবেই তো।'

'হলে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে বিপ্লবে আমি নাল ঠুকতে যাব কেন?'

'না আমার সঙ্গে নয়—আমি ভাড়াটে—' সুতীর্থ হেসে বললে। 'বিপ্লব

হলে আমিও কারো ভাড়াটে হতে যাব না। নিজে একটা দিক নিয়ে দাঁড়াব।'

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মেঝের রোদে দক্ষিণ দিকের জানলায় লোহার গরাদের বিচিত্র নকশার ছায়া পড়েছে। সূর্যকে মা বলে অনুভব করে তারি স্বচ্ছ শিশু সন্তানদের মত যেন রোদ। কত মাছি উড়ছে রোদে। সুতীর্থ আবার তাকিয়ে দেখল চায়ের পেয়ালায় সোনালি কিনার ঘিরে মাছি; রোদের ভেতর পেয়ালাগুলো হ'রেকবের ধূসরতা পেরিয়ে হঠাৎ হীরে হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

'কোন পার্টিতে যাবে বললে?'

'সে তুমি জান। এটা নিজের ঠিক করে নিতে হয়।'

'আমার তো মনে হয় আমি কংগ্রেসরই চারআনা সদস্য হতে পারতুম যদি—'

সুতার্থের যদিটা শস্তের মত ফলে উঠছিল যেন, কিন্তু বুলবুলিরা এসে খেয়ে গেল; কিছু বললে না সে আর, চুপ করে বসে রইল সতৃষ্ণ বিষণ্ণভাবে অনেক দূরের একটা গ্যাসের বেলুন—হাওয়া অফিস থেকে ছেড়েছে হয়তো—সেই দিকে তাকিয়ে।

'সোসালিস্ট পার্টিতে যেতে পার।'

'আমার মনে হয় আমার কোনো পার্টিই সইবে না।'

মণিকা রোদের ভেতর ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে উঠতে উঠতে বললে, 'তা সয় না আত্মারাম চিড়িয়ার। কোনো পার্টিই ধাতে সয় না, অথচ সবই সয়ে যায়। পার্কে ময়দানে একটা ভিড় জমলেই হাতের ভেতর একটা লেত্তি খুঁজে পাওয়া যায়—পৃথিবীটাকে চমৎকার লাট্টু ঘোরাবার জায়গা বলে মনে হয়; পাঁচটা পার্টির স্বতোবিরোধের ওপরে উঠে নিজের মর্যাদায় দাঁড়িয়ে কথা বলা বক্তৃতা দেওয়া— ।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

আপাদমস্তক জ্যোতির দিকে চায়ের ট্রের দিকে বিরস কটাক্ষে তাকাল মণিকা; কেমন অশ্রদ্ধার ব্রন ফুটে উঠল যেন সমস্ত মুখ ভরে।

'এত দেরিতে চা এল যে মণিকা দেবী?'

'চা তো ও এনেছে। আমি তো ওকে চা তৈরি করতে বলিনি; আনতে বলিনি।'

'কেন?'

'কেন, তোমার চাকর নেই ?'

'তুমি জান না সে পালিয়ে গেছে ?'

'আমাকে বলে পালিয়ে গেছে, আমাকে না জানিয়ে তোমার কুটুম্ব পালায় ?'

জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'চায়ের সঙ্গে পাঁপড় এনেছিস কেন ? একশোবার তো তোকে বলেছি ওসব কাশীর পাঁপড় ডাক্তারবাবুর জন্যে রেখে দিয়েছি। সুতীর্থবাবু তো পাঁপড় খেতে ভালোবাসে না।'

'ফাঁপর এনেছে জ্যোতি—এটা খেতে ভালবাসি আমি—' সুতীর্থ একটু মুখ মিঠিয়ে হেসে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

'নিয়ে যা এসব পাঁপড় জ্যোতি। নাকি তুমি খাবে সুতীর্থ ?' জ্যোতিকে পই পই করে বলেছি এসব পাঁপড় কাশীর ডাক্তারের জন্যে।'

'ডাক্তার কাশীর ?'

'না না, কাশীর পাঁপড় ডাক্তারকে খাওয়াব ভেবেছিলুম।'

'আরো তো আছে, সব পাঁপড়ই কি ভেজে নিয়ে এসেছে জ্যোতি ? ডাক্তারটি কে ? চাটুয্যে ? অংশুবাবুকে দেখছেন যিনি ?'

'হ্যাঁ।'

'ভিজিট নিচ্ছেন না ?

'কেন নেবেন না ? আমরা প্রত্যেকটি কলে ভিজিট দিই ; দিনে চারবার এলে চারবার—'

'তবে আর পাঁপড় কেন ?'

মণিকার ঠোঁটের কোণ মুচড়ে উঠল কেমন একটা হুলে বিঁধে যেন ; গম্ভীর হয়ে মণিকা বললে, 'আমরা ডাক্তারকে দিতে ভালবাসি।'

'দিচ্ছই তো ভিজিট দিনে চারবার করে।'

'যার যা বরাত। কই আর দিতে পারলুম, ডাক্তারের পাঁপড় তুমিই তো খাচ্ছ।'

জ্যোতি চলে গিয়েছিল, হয়তো বিড়ি টানতে ; আবার এল—কেউ তাকে ডাকেনি যদিও।

মণিকা বললে, 'বাবু কি ঘুমুচ্ছেন জ্যোতি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আর দিদি ?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখনও!' সামনের শূন্যতাকে চোখ দিয়ে একটু আস্তে ঠোকর দিয়ে সুতীর্থ বললে।

জ্যোতি চলে গেল।

'ঘুমুচ্ছে তো। জীউ নিয়ে শুধু বেঁচে থাকা যেমন আমার স্বামীর, তেমন আমার মেয়ের।'

সুতীর্থ চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে পিরিচের ওপর সেটা রেখে দিল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার মেয়েকে তো বেশ ভালোই দেখায়। অসুখ আছে? কি অসুখ?'

'হার্ট খারাপ,' মণিকা বললে, 'এই অল্প বয়সে এতটা যে খারাপ হতে পারে,—হল তো।'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি, মনে হয় আমার।'

'মনে হলে মনেই রেখে দিও মণিকা ঘোষাল! পাঁপড়ের একটা কিনার ভেঙে টোকা দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুতীর্থ বললে।

'ঘোষাল কেন?'

'অংশু মজুমদাররা নাকি আগে ঘোষাল ছিলেন, তোমার নিজের হার্ট কেমন?'

সুতীর্থের এ প্রশ্নের একটা বাঁকা উত্তর দেবে ঠিক করেছিল মণিকা, অপারেশন টেবিলে ছুরির মত কাজ করে এমনি একটা জবাব মুখে এসে পড়েছিল প্রায় মণিকার, কিন্তু ভালো লাগে না, চোখ বুজে আসে, উৎসাহ বুতে যায়, মণিকা বললে, 'আমাকে তো থিওগার্গিনাল খেতে হয়। যখন তখন। হার্টের জন্যে।'

'দেখিনি তো খেতে তোমাকে কোনোদিন।'

'খাই। হার্ট খারাপ।'

'তোমার চেয়ে ভালো হার্ট মুখার্জির আছে?'

'মুখার্জির চেয়ে সুস্থ মানুষ বুঝি তোমার চোখে পড়েনি আর?'

'ও তো ঢ্যাপসা নয়—দোহারা।' 'সুতীর্থ বললে, কিন্তু তোমার পায়ের নখে ওগুলো কি পড়ে আছে? চাঁদ? কিন্তু মুখার্জি চাঁদ নয় বলেই ওখানে নেই। ওখানেও নেই।'

যে শিশু মাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—এবং যে মা জানে যে চাঁদ পেড়ে দেওয়া যায় না, তাদের আকুতি ও অভিজ্ঞতার কয়েক মুহূর্ত জড়িত হয়ে থেকে তারপরে আস্তে আস্তে নিজের স্বতন্ত্র জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ফিরে এল স্বতীর্থ।

মণিকা একটা পাঁপড় তুলে নিয়ে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আধাআধি, চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, মুখুয্যের গাড়িতে চড়ে আমাদের ফটকে নামলে রাত তিনটের সময়। কি ব্যাপার বল তো স্বতীর্থ—'

'ওরা স্ট্রাইকটা ভেঙে দিয়েছে।'

'জবরদস্তি করে ?'

'হ্যাঁ। আমি দলের সর্দার নই অবিশ্যি—তবুও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের মুখপাত্র হিসেবেই। ওদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমারও জেল হবে—কিন্তু তা হল না আপাতত—'

মণিকার দিকে তাকিয়ে স্বতীর্থ বললে, 'বড্ড বিশ্রী বেকায়দা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে ?'

'গয়ানাথ মালোর কথা তোমাকে বলেছিলুম ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে ধর্মঘটী খুন হয়েছে ?'

'প্রমাণিত হয়েছে আমিই নাকি ওকে খুন করেছি।'

মণিকার চোখেমুখে বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছিল যেন একটু দমে গিয়ে মুহূর্তের ভেতরেই সাব্যস্ত হয়েছে। ওর শরীরের ভেতরেই যেন সঞ্চিত আছে সে জিনিস যাতে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা করে স্থির করে নেয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খুন করনি। করেছ ?'

স্বতীর্থ বললে, 'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি মণিকা দেবী—'

গয়ানাথ মালোর মৃত্যু সংক্রান্ত আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বললে মণিকাকে সে। এর ভেতর মুখার্জির কতখানি হাত, মুখার্জির চেহারার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য, মানুষ যা ভাবে বলে করে সে সমস্তকে অতিক্রম করে সময়পুরুষের ভিন্ন রকমের সিদ্ধি সমস্তই মণিকার কাছে পরিষ্কারভাবে আনুপূর্বিক বিবৃত করল।

'কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত।'

'মনে হয় যেন বানিয়ে বলছি।'

'না, তা নয়। তবে—'

'গয়ানাথকে কি আমিই খুন করেছি মণিকা?'

'কথা বলছ সহজভাবে—কিন্তু মনটা তোমার আড় ভাঙছে না। একটা কথা তোমাকে বলব আমি—' মণিকা সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'বল।'

'গয়ানাথ তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল না।'

'কি করে বুঝলে?'

'গয়ানাথ তোমাকে মুখুয্যে বলেও মনে করেনি, মুখুয্যের চেহারার সঙ্গে তোমার কোন সাদৃশ্য নেই—'

'নেই?' সুতীর্থ মণিকার চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমার নিজের চেহারা আমি নিজে তো দেখি না, আরশিও নেই আমার ঘরে। মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন দিক দিয়ে কতদূর কি সাদৃশ্য বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি বলছ আমাদের চেহারায় কোনো মিল নেই—'

'নেই,' মণিকা বললে, 'আছে মনে করে ছোরা বাগিয়ে তোমার দিকে সে ছুটেছিল একথা যারা বলে তাদের বেকুবির সঙ্গে পারবে না তুমি। কিন্তু বেকুবি নয়—' মণিকা একটু থেমে বললে, 'অভিসন্ধি স্পষ্ট না হলেও সোজা ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে আবছা ঠেকছে?'

'কেন ছুটেছিল তবে গয়ানাথ?'

'তুমি বলেছিলে না বঙ্কু ওর পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বঙ্কুই ছোরা মেরেছে ওকে—তোমার সামনে খাদের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তাই লোকটা—'

'কি যে বল তুমি। তা হলে বঙ্কুকে দেখতুম না আমি—'

'তুমি পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলে?'

'কোনো দিকেই তাকাইনি আমি—যে খাদে পড়ে গেল তার দিকে ছুটে গেলুম আমি—'

'জায়গাটার আশেপাশে ঝাড়জঙ্গল ছিল?'

'দেখিনি আমি—তবে মাঠজঙ্গল নিয়েই জায়গাটা। আচ্ছা আমি আরেকবার ঘুরে দেখে আসব। তুমি যা বললে তার—কিন্তু জায়গাটা দেখে আসব আমি।'

'গেলে হবে কি? যে জায়গায় হয়েছিল এসব তো তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না; সব জায়গাই একই রকম মনে হবে তোমার কাছে; চেলেটেলে বের করতে পারবে না কিছু—গুলিয়ে যাবে সব। কাচাছাড়া ভাবের মানুষ তুমি, মুখুয্যের মতন কাজের মানুষ তো নয়—'

'কিংবা বিরূপাক্ষের মতন। না, তা নই।'

'বিরূপাক্ষ কাজের লোক বইকি; বাড়ি-মোটর পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে তার। তোমার মতন ভাড়া না দিয়ে পরের বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই তো তার—'

মণিকার কথাটা যে তার পেটের থেকে বেরুচ্ছে, হৃদয়ের থেকে নয়, মাথার থেকে নয়—উপলব্ধি করেও পাল্টা রগড় করতে গেল না, কেমন নিঃশব্দ হয়ে রইল সুতীর্থ।

'ক' মাসের ভাড়া বাকি তোমার?'

'সাত-আট মাসের তো বটেই—'

'তোমাকে দশ মাসের ভাড়া দিয়ে দেব আমি—'

'অতটা পাওনা কিনা বলতে পারি না।'

'সেলামিও দিয়ে দেব।'

'দেবে তো বেশ করবে—' মণিকা বললে, 'কিন্তু মুখ লম্বা করে আছ কেন? তুমি যখন এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলে তখন সেলামির রেওয়াজ ছিল না তো। তবুও দেবে—এক কান কাটলেই দু-কান কাটা হয়—নিজেরই হয়। আর কার কি হবে। তা দিও—দিয়ে দিও দশ মাসের ভাড়া—সেলামী—' মণিকা হাসতে হাসতে বললে। 'ভাড়া দেও না বলে অবিশ্যি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যেত; নতুন ভাড়াটে বসানো যেত। কিন্তু অংশুবাবু আর আমি তো চড়কের গাজন গেয়ে গেয়ে মাথা খারাপ করিনি—আমাদের ঠাণ্ডা মাথা; তুমি এরকম বিগড়ে যাচ্ছ কেন?'

মণিকার কথা, গলার আওয়াজ কানের পটহে গিয়ে আঘাত করে, আঘাত করবার অনুমতি দিলে মনে হয় মর্মেও। কিন্তু কারু অনুমতিসাপেক্ষ মেয়ে মণিকা নয়, যদি হত তা হলে এরকম ষোলো আনা মানুষ হতে পারত না সে। মণিকা নিট ষোলো আনা নয়, তবুও খাদ আছে বলেই নিখাদ সোনার মত। সুতীর্থ যা চায় ঠিক সেরকমভাবে কথা বলছে না বটে মণিকা, কিন্তু তবুও খুব খারাপ লাগছে সুতীর্থের?

উনত্রিশ

'জানালাটা খুলে দাও সুতীর্থ, রোদ পড়ে গেছে, এখন একটু হাওয়া আসুক।'

জানালাটা কে খুলে দিল টেরই পাওয়া গেল না যেন। হাওয়া আসছিল। শীত কমে গেছে একেবারে; হাওয়া না থাকলে ঘরের ভেতরটা কেমন গুমোট।

ফুরফুরে হাওয়ার ভেতর বসে থেকে মণিকা বললে, 'দেবে তো বলেছ, কিন্তু কবে দেবে ভাড়া?'

'আজ কালই দিয়ে দেব।'

'দশ মাসের নয়, তবে মাস আষ্টেকের নিশ্চয়—আট মাসের ভাড়া পাওনা আছে তোমার কাছে।'

'আমি পরশুই দিয়ে দেব।'

'পরশু পেতে আমার আপত্তি নেই। টাকার ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠেনি আমার মন, কিন্তু পরশু তুমি ভাড়ার টাকাটা দেবে না জানি। তুমি তো ওয়াদা দিচ্ছ—'

'ওয়াদা?' সুতীর্থ একটু হাঁফের অসুবিধা বোধ করে যেন বললে, 'আমি পরশুই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা আমি এক্ষুনি তোমাকে চেক দিচ্ছি—একটা সিগারেট জ্বালিয়ে সুতীর্থ বললে।

'চেক নেব না আমি।'

'কেন?'

'ক্যাশ চাই। কেমন যেন বাজে মনে হচ্ছে তোমার চেক বইটাকে—'

শুনে সুতীর্থ কলকাতার একটা বড় সিডিউল্‌ড ব্যাঙ্কের চেক বইটা সরিয়ে রেখে দিল।

'ধর্মঘট করছ সত্যকে ছাপাতে না দাঁড় করাতে! দাঁড় করাতে তো! কিন্তু জীবনের অন্য সব ব্যাপারে মিথ্যে ফেঁদে স্ট্রাইকটাকে সত্য করবে তুমি। তা

কি করে হয় ?' মণিকা বললে, 'এখানে ধর্মঘট করছ মুখুয্যের সঙ্গে ওখানে বড় হাতের পোলিটিকস্ চালাচ্ছ সিঙ্গি রুথে—ধর্মের ওপর নির্ভর করে, সত্যকে সহায় করে, যেন সব সত্যেই তোমাদের দিকে এরকম প্রাণবল সংগ্রহ করে। কিন্তু সব সত্যই কি তোমাদের দিকে ? যে বাড়িতে থাকা হয় সেখানে আট দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলে ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে কোথায় প্রভেদ কর্মকর্তার ? সমাজের, অফিসের শাসনের বড় বড় ব্যাপারে তো বটেই, সাংসারিক খুঁটিনাটিতেও এ সব বিষে বিষিয়ে উঠল সব।'

যা অনুভব করেছে সেইটেই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সুতীর্থের। কেমন অমৃতের পুত্রের মত তাকিয়ে আছে মণিকা জানালায় ভেতর দিয়ে সুতীর্থের মত বিষ কন্যার সম্পর্কের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

'তোমার দশ মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারি সে টাকা আমার কাছে আছে।'

'আছে ? এইখানেই ?'

'এইখানে—এই ক্যাশ বাক্সে। কিন্তু তবুও তোমার বক্তৃতায় মন ভিজল না আমার। এ টাকা তোমাকে আমি দেব না।'

মণিকা নিরুপায়ের মত হাসতে লাগল, হাসতে লাগল আজকের বিশৃঙ্খল লৌকিক পৃথিবীর ক্ষতের ছ্যাঁদাটার গভীরতার দিকে তাকিয়ে নিঃসহায়ের মত। কিন্তু তবুও হাসিটা নিষ্ফল নিরুজ্জ্বল নয়।

'হাসছ ?'

'তোমাকে একটা খৎ লিখে দিতে হবে ; তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি আমি।' মণিকা বললে।

'কিসের খৎ ?'

'তোমার মনিবকে লিখে দেব। লিখে দেব : কুকুরটা এইখানেই থাকবে খাবে—এঁটিলি কামড়াবে—আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াবে ;—বেড়াক—কোনো চারা নেই।'

'লিখে দিও কুকুরের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব সামনের শীতে।'

মণিকা গম্ভীর হয়ে বললে, 'ক্যাশ বাক্সে টাকা আছে, আমাকে দেবে না, ও টাকাটা দিয়ে কি করবে ?'

'যাদের দিতে হয় তাদের দেব।'

'ধর্মঘটীদের পরিবারদের ? কিন্তু স্ট্রাইক তো ভেঙে গেছে—'

'জেলে গেছে ওরা। কিন্তু ধর্মঘট চালাতে হবে, পরিবারদের খেতে পরতে হবে—' সুতীর্থ কেমন যেন নালার ওপারের চিতেবাঘের মত তাকাল মণিকার দিকে।

নালার এপারের সেয়ানা হরিণীর মত তাকিয়ে মণিকা বললে, 'তা হবে বইকি। কিন্তু আমার খয়রাতের টাকা দিয়ে ওদের খাওয়ানো ? আমি তো মুখুয্যের দিকে। আমি কেন টাকা দেব মুখুয্যেকে যারা রুখছে সে সব মিনসে মাগীদের ফ্যানভাতের জন্যে ?' —ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল মণিকার দৃষ্টি ; জ্যোৎস্না রাতের নদী বনের ভেতর কালো ডোরাকাটা সোনালী রঙের সুন্দর জিনিস যেন তার প্রিয়কে না দেখে একটা ইতর বাঘকে দেখেছে এমনই নিদারুণ হয়ে উঠল মণিকার ঠোঁট। 'কোনো পুরুষমানুষ এমন করে। বিরূপাক্ষ করত না নিশ্চয়ই, মিঃ মুখার্জিও না।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিল মণিকাকে। মণিকা তাকিয়ে দেখল ক্যাশ বাক্সের আনাচে-কানাচে একতলায় দোতলায় দু'চার টাকার খুচরো ছাড়া ক্যাশ আর কিছু নেই—একটা পাঁচ টাকার নোট অবধি না। চেক সে সুতীর্থের কাছ থেকে নেবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু না নিয়েই বা করবে কি ? কাঁচা টাকা দেবে কোত্থেকে সুতীর্থ। টাকা ও জমায় নি কোনোদিনই—সেটা জানে মণিকা ; সম্প্রতি চাকরিও নেই ; যে চেক দিয়েছে সেটা হয়তো কোনো সমিতি বা পরিষদের ফণ্ডের টাকা ; পরিষদের সম্পাদক সুতীর্থের হোক না হোক, চেক কাটবার পরোয়ানা আছে তার। এ চেক ডিজঅনার্ড হবে না। চেকটা ব্যাঙ্কে নির্ঘাত মার খাবেই জেনেশুনে মণিকাকে তা গছিয়ে দেওয়া—, অত দূর অধঃপতন হয়নি সুতীর্থের। অধঃপতন তার হয়ইনি, কিছুটা চন্দ্র চাঞ্চল্য হয়েছে ভাবছিল মণিকা ; তুয়োলে-বুয়োলে কিছু হবে না, যখন সারবে নিজের থেকেই সেরে যাবে। আর যদি না সারে :—মণিকার নিঃশ্বাস খুব ভেতরের থেকে এল গাছের পাতার থেকে না এসে সমুদ্রের রাত্রির নিজের নিঃস্বপ্ন কোটরের থেকে চলে আসে যেমন বাতাস।

'এটা তো বেয়ারার চেক, এটাকে ক্রসড করে দাও।'

কেন, তাতে তোমার কি সুবিধে ?

'কখন ভাঙাব তা তো জানা নেই, চেকটা হারিয়ে যেতে পারে।'

'এক্ষুনি ক্যাশ করে নাও, ঐ তো রাস্তার ওপারেই তো ব্যাঙ্ক।'

'আমিই ক্রস করে নেব।' চেকটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল মণিকা।

'মুখার্জি তোমাকে খুনে প্রমাণ করে ছেড়ে দিল যে তবুও ?'

'কড়ার করে নিয়েছে। আমাকে ধর্মঘটের সংস্পর্শে থাকতে দেখলে স্ট্রাইকারদের বলে দেবে যে, আমি গয়ানাথ মালোকে খুন করেছি। ওরাই তখন খুন করবে আমাকে।'

'ওরা কি বিশ্বাস করবে ?'

'হাতে হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দেবে, বিশ্বাস করবে না ?' বিশ্বাস না করলে পুলিস তো আছেই ; আমার জামাজুতো গয়ানাথের লাসের কাছে পড়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়। কেন, তা তুমি জানো। সমস্ত রকম দরকারী ফোটোগ্রাফ ওদের আছে। ফোটো তোলবার আগে কর্তারা স্বচক্ষে দেখে গেছে সব—ডায়রি করে রেখেছে।'

'মোকর্দমা করবে তুমি ?'

'না। কি লাভ করে। করব না আমি।'

'স্ট্রাইকের নেশা ঘুচল তা হলে এবার তোমার ?'

'দেখা যাক ওরা কি করে।'

'ওরা ? কারা ?'

'মুখার্জি আমাকে খুনে প্রমাণ করলে হামিদরা কি চষে ফেলবে আমাকে ?'

'কিংবা সরকার কি ফাঁসি দেবে ? বড় বেল্লিক তুমি।'

মণিকা বললে, 'তোমার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর একটা আরম্ভ করবার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা দরকার। দেখ, দেশের হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের দরকার হবে—বিপ্লবেরও—হয়তো খুব বড় বিপ্লবের—হয়তো শান্তভাবে নয়, ফ্রান্সের মত, রাশিয়ার মত। কিন্তু তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে নাও। বয়স তো তোমার কম হয় নি। কিন্তু এখনও তুমি মোটেই তৈরি হতে পার নি।'

সুতীর্থ বিড়ি জ্বালিয়ে বললে, 'আমার তো লেখার দিকে, সাহিত্যের দিকেই বেশী নজর দেবার কথা ছিল। তুমিই তো আমাকে হল্লায় নামালে।'

'আমি ?'

'তোমাকে আমি চাই।'

'আমাকে ?'

'এখন নয়। বড় বিপ্লবের সময়।'

শুনে মরুভূমির মতন কেমন একটা লু-চলাচলের রূঢ়তা এসে পড়ল যেন মণিকার নিবিড় মাতা পৃথিবীর মত মুখে; সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিড়ি খাচ্ছ কেন ? দিশি বলে ? কিন্তু বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে, চলি তা হলে এখন।'

তেতলা যেন মহা নেপথ্য : যাত্রিনীকে দ্রুত নিবিড়তায় উঠে যেতে দেখল সুতীর্থ।

'কোথায় ছিলে কাল সারাটা দিন—সমস্তটা রাত ?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'নানা জায়গায়। এক্ষুনি মুখার্জির কাছ থেকে এলুম।'

'মিটমাট হল কিছু ?'

'না।'

'কোনো ভরসাও দিল না মুখুয্যে ?'

'কি করে দেবে, আমার তো বাইশ দফা দাবি।'

'ওগুলো কমিয়ে দাও, কেটেছেঁটে ফেলো তেজও গুটিয়ে নাও। ওরকম মারমুখো হয়ে সংসারে কোনো কাজই চলে না। তুমি দিনের পর দিন বড় লোহার কার্ত্তিক হয়ে পড়ছ।'

'তোমার লক্ষ্মীর মূর্তি খুলছে তো দিনের পর দিন—'

'কেন খুলবে না ? নাভির বদলে মৃগ নাভি নেই তো আমার—'

'আমাদের আছে। সেটা মানি। সেই জন্যেই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল জীবন, কোনো শান্তি নেই, দিকনির্ণয় নেই, ধরবার মত কিছু পাচ্ছি না।' কিন্তু এ খুনের সমস্ত প্রয়াস রক্তাক্ততা নিষ্ফলতা কিছুই ছোঁয়নি বুঝি ওকে, প্রশান্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, মৃগনাভি তো ইতর মানুষদের নষ্ট করছে; নিজের সমাহিত নিয়ে কতশত সাগরতীরের সভ্যতায় ঊষানারীদের দিব্যতায় জেগে রয়েছে মণিকা—ভাবছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ বললে, 'যে দেখে তার চোখেই এত ভালো লেগে যায় তোমাকে।'

সুতীর্থ ঠোঁটে হেসে বললে, 'তোমার কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছি—'

'কার কাছ থেকে ?'

'মুখুয্যে বলছিল—'

মণিকার সমস্ত শরীর ঘিরে একটা ফণা জেগে উঠছিল—দেখছিল সুতীর্থ।

'আমি ধর্মঘট করতে চাই-ই—'

'করবে। তাতে আমার কী।'

'করলে আমার খুন ধরিয়ে দেবে মুখার্জি।'

'দিক, আমার কী এসে যায়।'

'কিন্তু একটা কড়ার করে নিতে চায় মুখার্জি।'

মণিকা আঁচল দিয়ে গলায় বেড়ি পরতে গিয়ে আঁচলের চাবিটা ঝনঝন করে বাজাল একবার। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে, নাকের ছ্যাদা কাঁপছে না এখনও, কিন্তু মণিকার সমস্ত ফর্সা সুন্দর সত্তা কালকেউটের মতন কালো আগুন হয়ে রয়েছে যেন; সে ঝাঁঝের দিকে তাকানো যায় না যেন; সুতীর্থ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'সেদিন মুখার্জি এসে দেখে গেছে আমি এই বাড়িতে থাকি। এ বাড়ির ভাড়াটে ছিল সে একদিন। তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। বললে আমাকে।'

'বললে বুঝি ? ভগবান ঠাকুরের মত পণ্ডিত এ তল্লাটে আর পেলে না বুঝি মুখুয্যে—কাকে বলবে ভগা ঠাকুরকে ছাড়া ?'

'কিন্তু কাজ হাঁসিল করতে হবে তো—'

'কোন কাজ ?'

'স্ট্রাইকটা—'

'তার সঙ্গে ওর পূর্বশ্রমের খবর নেওয়ার কী সম্পর্ক ?'

'তা আছে।'

'আছে ?'

চড়িয়ে দাঁত ভাঙতে এগিয়ে এসে মাথায় খুব বেশি রক্ত চড়ে গেছে অনুভব করে মণিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভেতর আগুন পুড়ে গেছে। বরফও গলে গেছে মণিকার—একটা সুস্থ, ঠাণ্ডা আত্মহতায় সে পৌঁছে যাচ্ছে।

'তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ঠিকই ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি করছ এখন ?'

'চাকরি-বাকরির শাঁগপির কিছু করব না আর।'

'কি করে চলবে তা হলে ?'

'ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে।'

'আমি তোমাকে খাবার দিতে পারব না।'

'দিও না।'

'মাঝে মাঝে তুমি এমন পান্তবুড়ো হয়ে এ বাড়িতে ফিরে আস যে ছেলেমেয়ের মা হয়েছিলুম বলে তোমার তত্বতলব না করে আমি পারিনে। কোনো উচ্ছন্নে জিনিস দেখতে আমার ভালো লাগে না। তুমি ফের যখন এ বাড়িতে ঢুকবে ভদ্রলোকের ছেলের মতন ঠাঁট রেখে ঢুকতে হবে তোমাকে—'

'তোমার এ বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকব আমি।'

'ভাড়া না দিলে থাকতে দেব না।'

'ভাড়া দেব।'

'এক সঙ্গে কতগুলো ভজাবে, তারপর দেবে, তা হলে চলবে না। ফী মাসে চাই ; গোড়ার দিকে দিতে হবে।'

'বেশ তো, মাস পয়লাই দেব। আমাকে মুখার্জি সাহেব বলেছে ধর্মঘট যদি করতেই চাই এমন, তাতে তার আপত্তি নেই। আমি খুন করেছি তা প্রমাণ করতে পারলেও ও নিয়ে প্যাঁচে ফেলে স্ট্রাইক পণ্ড করতে যাবে না। এমনি লড়বে আমার সঙ্গে—সোজাসুজি কোনো আকস্মিক উটকো ঘটনার সুবিধা নিয়ে নয়—'

'ওর সঙ্গে এই চুক্তি ঠিক করে এলে ?'

'আপাতত।'

'ওকে মানুষে বিশ্বাস করে ?'

'এত বড় ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছে তো ; অনেকেই বিশ্বাস করেছে বলে।'

'ও তোমায় ডেকেছিল বুঝি ?'

'আমি নিজেই গিয়েছিলুম।'

'গরজ তোমারই বেশি—'

'আমাকে আজকালই ডাকত অবিশ্যি'—সুতীর্থ বললে, 'কই জ্যোতিকে দেখছি না।'

'কি দরকার ?'

'চা দিয়ে যাবে।'

'আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।

'ওঃ, তা বেশ করেছ। আমি একটা চুরুট জ্বালাই তা হলে। চা দুপুরে খাওয়া যাবে; বাইরে।'

সুতীর্থ চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে মণিকাকে বললে, 'লড়তে যখন নেমেছি তখন শেষ না করে ছাড়ব না, এরকম কথা বলতে পারতুম, কিন্তু ও সব জেদের কথা কাজের কথা নয়।'

'কাজ করতে নামলেই জেদ বেড়ে যায়—পেট থেকে চাঁচাছোলা কথা বেরুতে থাকে। সে কথা ঠেকাবে কার সাধ্যি। বাছুরের মা গোঁসাই মার মত তেরিয়া হয়ে উঠলে খাটালের লোকদের যেমন হয় আর কি—তোমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে তেমনি ঝামেলা হয়েছে মুখুয্যেদের।'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো কথা বললে না।

মণিকা সোফায় বসে বললে, 'এ ধর্মঘটে জিতে যদি তুমি মুখার্জিকে কাবু করতে পার, সেটাও বিশেষ কোনো কাজের কথা হবে না।'

আবার প্যাঁচ কষবে, তা জানি, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আজ ঘাড় নোয়ালে ওরা কালই গর্দান উঁচু করতে জানে আবার।'

'আমরাই করতে দিই বলে।'

'বুদ্ধি-সুদ্ধির সঙ্গে আহম্মকির লড়াই তো। কেন জিতবে না মুখুয্যে?'

সুতীর্থের চুরুটটা নিবে যায়নি একেবারে, কিন্তু যে আগুন আছে তা নিয়ে ফোঁকা অসম্ভব। ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল।

ত্রিশ

'তোমার বাইশ দফায় দশ দফা মেনে না নিলে যদি খুশি না হও, বাইশ দফাই মেনে নেবে, কিন্তু কালই প্রমাণ করে দেবে যে আইন ওদের দিকে—তোমার দিকে নয়।'

'বড় বেগতিক জীবন আমাদের—রাষ্ট্রে সমাজে সব দিকেই। এ অবস্থায় কিসের দরকার?'

'বিপ্লবের। যা কোনোদিন ভারতবর্ষ দেখেনি এমনি একটা বিপ্লবের।'

'জলের, না রক্তের?'

'রক্তের যাতে না হয় সেই চেষ্টা করাই দরকার। খুব বড় বিপ্লব, অথচ খুব শান্তভাবে হচ্ছে—এ জিনিসটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। কিন্তু কে করবে? উপকরণ কোথায়? গান্ধীজী নিরাশ নন। কিন্তু তিনি একা ছাড়া কেউই তো আর গান্ধীজী নন।'

'এসব লোক একক থেকেই বেশি কাজ করতে পারে। পথে ঘাটে গান্ধী জন্মালে কারু কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া খুব বড় কেজো রেভল্যুশান গান্ধীদের দিয়ে হবে না। ওঁরা সে সবের ঢের ওপরে—মানুষ ওঁদের চেয়ে নিচে বলতে পার, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষ ওঁদের চেয়ে ঢের আলাদা রকমের।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

'কে চা আনতে বলেছে জ্যোতি?' জ্যোতি ইতস্তত করছিল।

'বাবু কি করছেন?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—হয়ে এলুম তো এই।'

'কখন আসবেন?'

'একটা নাগাদ।' জ্যোতি চলে গেল।

'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে সুতীর্থ?'

'ঘড়িটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি।'

'মণিকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল; তরল গরম জিনিসে গলা পুড়িয়ে নিতে ভালো লাগছিল; টনসিলে কেমন ব্যথা। গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে নিতে নিতে বললে, 'আমার কাছে বিক্রি করলেই পারতে—,

'তোমার ঘড়ি কি হবে—তোমার তো টাকার দরকার।'

'তোমার ঘড়িটাকে আরো চড়া দামে বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকা পাওয়া যেত।'

নাও হতে পারে খাঁই, সত্যিই কেবলই টাকার দরকার মণিকার ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ বললে, 'চেকটা ভাঙিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওষুধ আর ডাক্তারের ভিজিটের বড় বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল। আমাদের তো রোজগার নেই, ব্যাঙ্কেও টাকা নেই। নিচের তলার ভাড়াটেদের টাকাই খেতে হয়।'

সুতীর্থ চিন্তিতভাবে চুরুট টানতে টানতে বললে, 'তোমার কথা কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে মুখার্জি। আমার সঙ্গে যাবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতে?'

'আমি? কেন?'

'আমরা তিনজনে মিলে কথাবার্তা বলব—আমার সঙ্গে চলে আসবে আবার।'

আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ; কিন্তু তারপরে কালো ছাই পড়ে থাকে। কালো ছাই ছড়াবে না মণিকা, মনকে উত্তেজিত করবে না, মূর্খদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করাই লিখন যখন এই ভীষণ দুর্ঘটনার গ্রহে তখন নিজেকে জ্বালিয়ে চড়িয়ে মনটাকে পীড়ন করতে যাবে না সে। শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিস এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর; বেশ তিরিক্ষে তামাসাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুখার্জির গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে তাহলে মণিকাদি?'

গাড়ি আসবে না—মণিকাকে যেতে হবে না; গাড়ি এলেও যেতে হবে না; জানে মণিকা। আগে বেশ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করত সুতীর্থ, কিন্তু স্পষ্টভাবে আবার চিন্তা করতে পারবে সুতীর্থ,—এ যুগের বাঙালী ও ঠিক নয়—আগেকার যুগের বাঙালীর বেশি ভালো জিনিস আছে ওর ভেতর।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদের শীগগিরই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—'

'কি কথাবার্তা হবে?'

'এমনি—ধর্মঘট সংক্রান্ত—'

'ওখানে কে কে থাকবে?'

'আমরা তিনজন—'

'অ্যাডজুডিকেটর কারা?'

'অনেকেই আছে—কিন্তু মুখার্জিই সব।'

'তুমি কথাবার্তা চালাবে তোমার নিজের প্রতিনিধি হয়ে?'

'না, না, তুমি আর আমি ধর্মঘটীদের প্রতিনিধি—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও—স্ট্রাইকাররা তোমাকে তাদের সর্দার মেনে নিয়েছে?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

'মনে হয়? তারা সব জেলে, আর তুমি জেলের বাইরে; তাদের স্ত্রী-সন্তান খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি খ্যাট মেরে প্রতিনিধিত্ব করছ। এ তো চারপেয়েদের প্রতিনিধি। হামিদ যদি ওখানে থাকে তা হলে তো তোমার জুতো ছিঁড়ে খুর বার করে নাল ঠুঁকে দেবে—'

সুতীর্থ ঈষৎ মুখ ফাঁক করে হেসে বাগেশ্বরীর দিকে তাকাল—ভাবের আশ্চর্য ঈশ্বরীর দিকে; মণিকা মুখ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে চুপ করেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুতীর্থ বললে, 'আমাকেই ওরা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে—'

'মুখার্জির ওখানে মদের ব্যবস্থাও থাকবে?'

'তুমি গেলে মুখার্জি মদ খাবে না।'

'এসব স্ট্রাইকভাইক ব্যাপারের কিছু বুঝি না আমি। অ্যাডজুডিকেটরের সঙ্গে আমি কি কথা বলব।'

'তুমি যতক্ষণ থাকবে তোমার ইচ্ছে না হলে স্ট্রাইকের কথা বলব না আমরা—'

'তবে?'

'পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে তোমার রুচি আছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হবে। বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে না যদি থাকে তোমার, বসেই থাকবে না হয়, আমাদের কথা শুনবে।'

'তোমাদের কথা তো বেড়ালেও শোনে না—'

সোফার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'চলো আমার সঙ্গে ওর এখানে;—দিনখন ঠিক করে নেয়া যাক।'

'তোমার মেয়েকে স্ত্রীকে নিয়ে যেও সুতীর্থ।'

'আমি বিয়ে করলে তো নিয়েই যেতুম আমার পরিবারকে।'

'তুমি বিয়ে করনি?'

'কবে করলুম?'

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে—'

'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে?'

'নেই?'

‘তুমি জান যে তা নেই।’

‘নেই? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই?’

‘নেই।’

‘কিন্তু ছিল একদিন সব। আমরা যে জায়গার থেকে রওনা হই চলতে চলতে সে জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছই আবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়—আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা বাঁকিয়ে চলে বলে যা ভোগ করেছে—অনুভব করেছে সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়। তুমি সুমুখে তো চলেছ সুতীর্থ—কিন্তু ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছ: যা দেখেছিলে বুঝেছিলে সেই সীতা—নাকি সেই সোনার সীতার দিকে।’

সুতীর্থ পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়েছিল; আবার পায়চারি শুরু করে বললে, ‘খুব আশ্চর্য কথা বলেছ তুমি। এরকম কথা সেকালের গ্রীসে সিবিলিয়া বলত। সফিংস বলত। ঈডিপাস ছাড়া কেউ স্‌ফিংসের হেঁয়ালির উত্তর দিতে পারেনি। তুমি যা বললে তার মানে বার করতে হলে অনেক দিন বসে চিন্তা করতে হবে।’

‘কর চিন্তা।’ মাণকা আস্তে আস্তে বললে।

‘কিন্তু আমি কি ঈডিপাস?’

‘তা তুমি জান।’

সুতীর্থ সোফায় এসে বসে যে সব বই অনেক আগে সে পড়েছিল, যে সব ছবি প্রতিনিয়তই চোখে এক সময় ভাসত তার, ইসকাইলাস সোফোক্লসের যে সমস্ত কোরাস প্রবহমান রোদসীর সবচেয়ে বড় বিশেষত্বের মত তার কানে ক্রন্দন করে বেজে উঠত, তার চিন্তা চেতনাকে প্রস্তুতি ও সুগভীরতা দান করতে এক সময় সেই সব কথা ভাবছিল। কোথায় থেকে সে কোথায় চলে এসেছে। অন্তরপীঠ ছেড়ে সে বাইরে এসেছে—বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে? সত্তার বেশি বিকাশ হচ্ছে তার? বেশি সত্যকে পাচ্ছে সে? না তা নয়। বরং আগেকার সেই অধ্যয়ন ভাবনা সংকল্পনার পৃথিবীতেই বস্তুকে বুঝি পেয়েছিল সে—বস্তুর অবচ থেকে একেবারে অন্তিম উঁচু অধিসমস্ত নিরতিশয় বিকাশের ভেতর; বস্তুর উচ্চ, নীচ, নীচকে মনে রেখে উঁচু মর্মমঙ্গলা ভিত্তিই যে যথার্থ সত্য ও উপলব্ধিকে ধারণ করবার মত নির্মল ও নিবিড় আধার হিসেবে নিজের মনকে পেয়েছিল সে; এ মন নিয়ে এতদিন মহাভারতের বড় অব্যয় গল্পকার হয়ে উঠবার কথা তার, সোক্রাতেস,

সোফোক্লেস ও প্লেটো আইনস্টাইনের বিমিশ্র এক আশ্চর্য আত্মা হয়ে উঠবার কথা। কি হয়েছে সে? কি বলছে? কি করছে?

'যেতে হবে কখন?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'কোথায়?' চারদিককার সময় ও পরিসরের ভাসমান বিশৃঙ্খলার ভেতর একজন নারী একটি কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে টের পেল সুতীর্থ যেন হঠাৎ।

'মুখুজ্যের ওখানে।' মণিকা বললে।

'যাবে তুমি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধুলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে; ধুলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে তাকে বাছের বাছ মর্দ চিনে এনেছে। কৌৎকা গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভালো লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতু মীরের ভাড়স লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে; মনে হয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

'হ্যাঁ চলো মুখার্জির ওখানে, কি করবে, বেড়ালের পায়েও তো ধরতো হয়।' সুতীর্থ বললে।

'কেন?'

'গলায় কাঁটা ফোটে যদি বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়।'

'আমার গলায় কোথায় ফুটল?'

'আমার ফুটেছে।'

গয়ানাথ মালোর খুনের ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইক চালানো নিয়ে সুতীর্থের গলায় কাঁটা ফুটেছে, উপলব্ধি করছিল মণিকা; চৈতন তো সুতীর্থ; মুখুজ্যে হয়তো চৈতনকে বলেছে, মণিকা দেবীকে মুখুজ্যের রাতের বৈঠকে নিয়ে গেলে সুতীর্থের গলার কাঁটা বের করে দেবে সে। যাবে কি সে? চৈতন বটে—তবুও চৈতনকে ভালোবাসে মণিকা; ভালোবাসে কি সুতীর্থকে? সত্যিই গলায় কাঁটা ফুটেছে—তুলে দেবে কি মুখুজ্যে? কাঁটা তোলবার অন্য কোনো উপায় নেই? বেড়ালের পায়েই ধরতে হবে গিয়ে?

'কখন যেতে হবে মুখুজ্যের ওখানে?'

'রাতের বেলায়।'

'দিনে হবে না?'

'না। বড্ড ব্যস্ত থাকে সারাদিন। অনেক লোকজনের হল্লা। রাত দশটা অব্দি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না।'

'কটা আন্দাজ যেতে হবে?'

'এই সাড়ে দশটা এগারোটা—'

'ফিরব কখন?'

'আড়াইটে তিনটের সময়—ওর গাড়ি নেই।'

মণিকার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। নিজের অনুভূতিকে বিদ্যুতের বাহক বানালে রক্ষা নেই আজকের এ পৃথিবীতে। প্ররোচনা ও উত্তেজনার হাত এড়িয়ে, সৎ রসিকতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও বা নিজেরই স্থিরতায় সহিষ্ণুতায় শান্ত হয়ে থাকতে হবে—সিদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

'তোমার সঙ্গে আমি যদি যাই মুখুজ্যের ওখানে যা চাচ্ছ পাবে তুমি সুতীর্থ?'

'গয়ানাথ মালোর ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে। কথা দিয়েছে আমাকে মুখার্জী।'

'যে মানুষকে তুমি খুন করনি, খুন করেছে মুখুজ্যে, সেই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তুমি দেবে ঘুষ?'

'তুমি তো ইতুপুজোর ঘট ভাসিয়ে দিয়ে কথা বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম গড়িয়েছে দেখছ না—'

'আমি কেন দেখতে যাব? আমি কে? আমি এ সবের ভেতর নেই তো।'

'নেই? মুখার্জিকে এখানেও ডেকে আনতে পারি। আনব? এ বাড়ির থেকে তুমি অবিশ্যি তাড়িয়ে দিয়েছিলে তাকে।' সুতীর্থ বললে।

সুতীর্থের কথার মর্মভেদী ছেলে-মানুষী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে চোখ বুজল মণিকা। কিন্তু বিষয়ই বিষ, বিষয় মাতায় মানুষকে, বিষয় নিয়ে মেতে দেখ, কেমন বড় গড়নের মানুষ কি রকম চিমসে হয়ে যায়—কি বলে, কিভাবে, কি করে।

'এ-স্ট্রাইক আমার চালাতেই হবে। তুমি সাহায্য করলে ভালোই হত। হয়তো কুড়ি দফাতেই রাজি হয়ে যাবে মুখার্জি। কিংবা তুমি যদি আর কিছু বেশি খুশি করতে পার তাকে—'

মণিকা সোফায় এক কিনারে মাথা কাত করে চোখ বুজে ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সুতীর্থকে স্বচ্ছ জিনিসের মত দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করে দূরতর

কোনো কিছুর দিকে যেন তাকিয়ে মণিকা বললে, 'খুশি করতে পারি যদি ? কি দিয়ে ?'

'বিরূপাক্ষকে কি দিয়ে করেছিল অন্ধকারের ভেতর ? আমি তো সেখানে ছিলুম না।'

কিছু যে করেনি, কিছু যে হয়নি, বিরূপাক্ষের ব্যাপারটা যে কিছু নয় সেটা খুব ভালো করে জেনেও সুতীর্থের রক্তে গোত্রান্তরের বিষ ঢুকেছে বলেই সে যা বললে সেই কথাটা বলা সম্ভব হল তার পক্ষে। কিন্তু নিজের রক্ত নির্মল—শুদ্ধ ছিল মণিকারও স্নিগ্ধ ছিল—ঠাণ্ডা ছিল ; সে চুপ করে রইল।

'সেদিন সেই বেশি রাতের অন্ধকারের ভেতরে কি হয়েছিল—কিনা হয়েছিল তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সুপ্ত শরীর জানে। এবারেও আধার—আধেয় নয়। তোমাকে নিজেকে কিছু জানতে হবে না।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সুতীর্থ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল মণিকা সেই জায়গাতেই সেইরকম ভাবেই কেমন যেন একটা সাদা নারী সারসের ছায়ার মতন নিঃশব্দ হয়ে বড়, গোল, রৌদ্র পরিবেষ্টনীর ভেতর বসে আছে।

'এখনও বসে আছ তুমি।' মণিকাকে বললে সুতীর্থ। মণিকার মুখোমুখি সোফায় বসে সুতীর্থ বললে, 'ছেড়ে দেব এসব। মল্লিকের কাছে যাব আজ—আমাদের ফার্মের। তাকে গিয়ে আমি বলব আমাকে কাজে বহাল করে নিতে। নেবে বলেই মনে হয়। না, যদি নেয় তাহলে কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়ব।'

'স্ট্রাইক হয়ে গেল ?'

'যারা বড় লীডার ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। কিন্তু আমার মতন চুনোপুঁটির তো সব সময় স্ট্রেচার নিয়ে হাজির থাকবার কথা : ওটা কে গেল ? ইয়াসিন বুঝি, এটা ? লছমন, আর ওটা বড়নাম সেটা মাকুরাম, এই লাসটা। পাঁচীর, ওটা খোকনার। কিন্তু মানবকে তরাতে গিয়ে মানুষগুলোকে গণ্যই করছি না আমি আজকাল। এটা খারাপ হচ্ছে। অবিশ্যি একটা বেশ ঘনিয়ে ফাটিয়ে বিপ্লব এলে কেই বা থাকবে ব্যক্তি, কোথায় থাকবে মানব। কিন্তু সেরকম বিপ্লবের একটা মাছিকেও তো উড়তে দেখা যাচ্ছে না এখনও ; মিছে-মিছি তবে কতগুলো ঘরপোড়া গরু নাচিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আজকের হাতের কাছের মানুষগুলোর দুঃখ দরদ

সম্বন্ধে কাঠ হয়ে থাকলে চলবে কেন! বিনিময়ে সে বিপ্লবের উজ্জ্বল উপকারগুলো পাওয়া যাবে না।'

সুতীর্থ বললে, 'সত্যিই কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। এই ধর্মঘটীদের বা তাদের জেনানাদের ছেলেপুলেদের দিনরাত্রির বস্তির দুঃখ-কষ্টের ওপরে চলে গেছি যেন, —কিংবা নিচে তলিয়ে গেছি; সেখানে মানুষ মরলে বাঁচলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যে চিন্তা—মানে ভাবনাগ্রন্থির সরসতাটা ঠিক থাকা চাই নিতান্তই নিজে চরিতার্থ করবার জন্যে। দেখলাম ও আমার ধাতে সয়না। হওয়া উচিত ছিল হয় তো অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি মানুষ আমি মানুষ, আমরা মানুষ মণিকা।'

সুতীর্থ চুরুট জ্বালাচ্ছিল—একটা দুটো তিনটে দেশলাই কাঠিতেও কিছু হল না।

'তুমি, গয়ানাথ। ইয়াসিন, হামিদ, মকবুল, বিশ্বম্ভর—সব—'

'তুমি নিজেও তো?'

হ্যাঁ, সে নিজেও তো ব্যক্তি মানুষ। চুরুট জ্বালিয়ে দিয়ে কিছু বললে না সুতীর্থ, যা বলবার একটু আগেই তা বলেছে।

'এদের সকলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে? একথা যদি মনে করে থাক তুমি তাহলে থুক কেটে চলে যাবে বুঝি?' মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, মানুষদের নিকেশ করে মানবতাকে মঙ্গল করবার মত ফরাসী রুশ বিপ্লবের নায়ক হবার সে দাবী আমার নেই; মহাত্মার অপর পথ আমি মোটেই ধ্যান-সাধ্য মনে করতে পারছি না। কোনো তৃতীয় পথ দেখছি না। মানুষ নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। মানবতাকে এগিয়ে কিংবা তলিয়ে দেবার জন্যে লোহার কার্ত্তিকের দরকার কিংবা মায়া কাজলের: লেনিন গান্ধী কবীর।'

একত্রিশ

দু তিন দিন পরে মণিকা সুতীর্থকে বলে, 'তোমার কোনো সুবিধে হত তোমার সঙ্গে আমি মুখুয্যের বাড়ি গেলে?'

'মনের এরকম অবস্থা নিয়ে তুমি ওসব জায়গায় যেওনা।'

'মনকে আমি তৈরি করে নিতে পারি।'

সুতীর্থ কাজে ব্যস্ত ছিল, বল্লে, ‘আচ্ছা, আরেক সময়ে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।’

পরদিন মণিকা বল্লে, ‘চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ?’

‘ছেড়ে দিয়েছি, বলেছিই তো তোমাকে।’

‘আর এটা ?’

‘স্ট্রাইক ? হামিদের হাতে ছেড়ে দেব।’

‘তারপর কি করবে তুমি ?’

‘কিছু টাকা হাতে আছে—কয়েকদিন লিখব পড়ব, ঘুরে বেড়াব, চিন্তা করব। এক সময় আমি আদি গ্রীকদের লেখা খুব পড়তুম আর আমাদের দেশের জীবন মনীষীদের, পড়তে হবে আবার এই সব। আজকাল অনেক নতুন বই বেরুচ্ছে: দেখব কিছু কিছু নেড়ে; ক্রয়েড ওপর ওপর পড়েছি, মার্ক্স দেখেছি, ফরাসী শিখছিলুম, বোদেলেয়র, ভিলোঁ, প্রুস্ত, ভার্লেন ফরাসীতে পড়া দরকার। অনেক দিন হয় লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিছু লিখব।’

‘তোমার লেখা পড়িনি আমি কোনোদিন।’

‘পুরনো পাণ্ডুলিপি হাতের কাছে কিছু নেই। নতুন কিছু লিখলে শোনাব তোমাকে।’

‘কোথায় যাচ্ছ ? বেরুবার যোগাড় করছ বুঝি ?’

‘বেলগাছিয়ায় যেতে হবে: ক্ষেমেশ চৌধুরীর কাছে।

‘সে কে ?’

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল; সোফার হাতলের ওপরে বসে বললে, ‘বিরূপাক্ষ আর আসেনি এখানে ?’

‘এলেও পারত। আমি নিষেধ করিনি।’

‘না এলেই তো ভালো হত।’

‘সেটা যেদিন সে বুঝবে সেদিন আসবে না।’

‘বুঝবে কি ?’

‘ও বুঝে ফেলেছে, সেই জন্যেই ভিড়ছে না আর। আসবে না আর। আমার কথাবার্তা হাবভাব মিষ্টি চায়ের মত জলের ভেতর ঝরে পড়েছিল। ও তো বোয়াল—গন্ধে গন্ধে টোপ খেতে এসে দেখল হ্যাঁচকা খাওয়ার মত কিছু নেই—মৃত্যু ছাড়া খাদ্য নেই—কেঁচোটা বঁড়শিতে গাঁথা।’

‘কেঁচো কে ?’

'ও যা চাচ্ছিল সেটা।'

'ন জিনিসকে ভিঁলো কেঁচো বলে না।' সুতীর্থ একটু হেসে বললে।

'ভিলোঁ কে?

'একজন ফরাসী কবি।'

'ফরাসী কবিদের পড়া নেই আমার।'

'পড়লে পারতে ভিলোঁ অবিশ্যি যদি ফরাসী জানতে।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কর?'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো উত্তর দিল না।

চুরুট নামিয়ে বললে, 'সেই দশ—বারো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি যেন আবার—সেই গ্রীকদের, ফরাসীদের আমলের সেই নাবিকে, ও তার পরের সময়ের মনীষীদের, এই সেদিনকার বাংলার পটের আমলের পৃথিবীতেও—কিন্তু আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার মনের একগুঁয়েমি—প্রাণের সেই এখন আর— মনটা জল, চিলের ডানা, আগুনের মত হয়ে উঠেছে।

'তুমি তো কেঁচো মনে কর জিনিসটাকে।'

'তা করি।' সুতীর্থ বললে।

'বিরূপাক্ষ টোপ খেতে এসে দেখল কেঁচোটা বঁড়শীতে গাঁথা। ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে কানকো কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে জল গিলে বুড়বুড়ি কেটে উপুড় চিত ফলিকাত প্যাঁচ কষে যখন দেখল কোনো ফয়সালা নেই, তখন ভুস করে বারো বাঁও জলে ডুব দিয়ে গেল বোয়ালটা।'

'এত বেশি জল ওর পৃথিবীতে?'

'বেশি টাকায় বেশি জল, বেশি তেল, বেশি হাঁসফাঁস; ও এক আশ্চর্য নিদেন পৃথিবীতে থাকে।'

'বিরূপাক্ষের স্ত্রী কোথায় গেছে? নিজেই তো বলছিল যে ছেড়ে গেছে না যাচ্ছে?'

'ক্ষেমেশ চৌধুরীর ওখানে আছে। বিরূপাক্ষ কাকে বিয়ে করেছে আমি জানতুম না। ক্ষেমেশ বললে জয়তীকে বিয়ে করেছে।'

সুতীর্থ চুরুটে দু-তিনটে টান দিয়ে বললে, 'আমি জয়তীকে চিনি।'

'বেলগাছিয়া থেকে কখন ফিরবে?'

'রাত হয়ে যাবে। নাও ফিরতে পারি।'

'তোমার ঘর সংসারের জন্তে একটা চাকর যোগাড় করবে না ?'

'আমি টাকা দেব—আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাদের সঙ্গেই হোক।'

'কত দেবে ?'

'যা চাও।'

'আজ রাতে ফিরবে ? ফেরবার সময় একটা চেক আনতে পারবে ?'

'কত টাকার।'

'চেক বই তো এখানেই আছে তোমার ? ক্যাশ আনলেই ভালো হয়।'

সুতীর্থ একটু ভেবে বললে, 'এক্ষুনি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি তোমাকে।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলছিল ; মণিকা বললে, 'এত টাকা পেলে কোথায় ? ঘড়ি বিক্রি করে ?'

'আমার উপায়ের কি অন্ত আছে ? কাল আর পাঁচশো টাকা দেব। টাকাগুলো হাতে নিয়ে মনিকা বললে, 'কিন্তু ওদের ছেলেপুলেদের জেনানাদের কি ব্যবস্থা হবে ?'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না '

'গয়ানাথ মালোকে যে মেরেছে সে তোমাকেও মেরেছে বটে।'

'হামিদ ইয়াসিন সত্যকিঙ্কর বিশ্বনাথ—লোক ঢের ভিড়ে গেছে ওদিকে। আমি কিছুদিন আত্মবিচারের—'

'আত্মবিচার—' মণিকা নদীর জলে কুল জলপাই পড়ার মতো এক ধরনের শব্দে হেসে বললে, 'ওটা বোধ হয় মনের অগোচরে পাপ—নাকি ধর্ম সুতীর্থ—অনেক দিন ধরে বাঙালীর ছেলেদের ? তাহলে মুখুয্যেই জিতল ! কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে ?'

'সবই ক্যাশ বাক্সে আছে—খুলে দেখ।'

'আমাকে যে পাঁচ শো টাকা দিলে তাও তো ঘুষের টাকা ?'

সিদ্ধার্থের মত গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় মাথা নেড়ে সারিপুত্রকে যেন বললে 'না না, ও আলাদা টাকা।'

'কেন ঘুষ দিয়েছে তোমাকে ? কেন ঘুষ খেলে ?'

সুতীর্থ নেবা নেবা চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার তাতে কি ক্ষতি হয়েছে ? তোমাকে তো যেতে হচ্ছে না মুখার্জি সাহেবের ডিনারে।'

'কত টাকা দিয়েছে আপাতত ?'

'পাঁচ হাজার। এ টাকার সঙ্গে তোমার যাওয়া-আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কথা মুখার্জি কোনদিন বলেওনি আমাকে।'

'আমরা ভাবুকরা' সুতীর্থ বললে, 'কাজের মানুষদের মত সোজা মোটা পথে চলতে পারি না। এই স্ট্রাইকের ব্যাপারটা হাতে নিয়ে তোমাকেও জড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলুম; থাকতে তুমি আমার সংগ্রামটাকে ঘিরে। কিন্তু মসলিন যারা তৈরি করত, যে সব রূপসীরা তা পরত কেউই অশুদ্ধ নয়—যাদের চোখ টাটাত সেই লোকগুলো ছাড়া। হয়তো আমাদের পৃথিবীই খারাপ—কোনো চিন্তা বা কাজের মিহি মসলিন জমিন এখানে স্বাভাবিক নয় তাই ভালো নয়, ঠিক নয়।'

মণিকা সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু কথার দিকে নয়, কোনো কথা শুনেছে' বলে মনে হল না।

'কি হিসেবে ভাঙল স্ট্রাইক?'

'ভাঙেনি এখনও। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুখার্জি আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুতীর্থ সোফায় বসেছিল উঠে গেল, চুরুট টানতে টানতে ফিরে এসে বললে, 'কোনটা চাকরির টাকা, কোনটা ব্যবসার আর কোনটাই বা ঘুষের সেকালের মানুষেরা টাকার উপর একটা পাঁচনের বাড়ি মেরে সেটা ঠিক করে নিতে পারতেন। ঘুষের টাকাটা সরিয়ে রাখতেন তাঁরা মদ, মালাই ইত্যাদি সাঁইত্রিশ রকম মাধুরীর জন্যে। সে পাঁচন এখনও আমাদের আছে, কিন্তু পাঁচন দিয়ে টাকার ওপর বাড়ি মারলে পাঁচন বলে যে সব টাকা ঘুষের আর জোচ্চোরির—সব সব টাকা; রসের মালপো হবে—দেশ দশের পাল চরানো হবে এ টাকা দিয়ে; ইস্কুল-কলেজ সাহিত্য জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরীক্ষা—ও সব কোনো জিনিসই হবে না। ও সব জিনিস হয়ে গেছে—আর হবে না। এখন থেকে টাকা হবে শুধু—না হলে মানুষের মৃত্যু হবে।'

'সে টাকাটা নিলে তুমি?' মণিকা বললে। 'ঘুষ হিসেবে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুষ ছাড়া টাকার চলাচল নেই: আজ কেউ কাউকে টাকা দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় মণিকা?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বেলগাছিয়ায়।'

খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বললে মণিকা মিনিট চারেক ; তারপর গলা খাকরি দিয়ে সহজ গলায় বলতে আরম্ভ করল। শুনে সুতীর্থ সাবধান হয়ে বললে, 'ওঃ—'

'কখন কি হয় বলা যেতে পারে না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন তুমি ?'

'না, না, এখন তখন কিছু নয় তবে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের থাকা দরকার।'

সুতীর্থের চুরুট নিবে গিয়েছিল। জানালার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল ; মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে ; অনেক দূরে পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেরঙের পালক কলমী কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল চারদিককার চাঁদাকাঁটা কেয়াকাঁটা দল ঘাসের জল উচ্ছল করে উড়ে যাচ্ছে নীলের থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণাকণিকায় উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগণের দিকে ফাল্গুনের বাতাস। এদিকে ট্রাম লাইন চকচক করে উঠছে, কোনো ট্রাম নেই, ফুটপাথে চীৎকার করে উঠছে গাধাটা ; গায় তার একজন ইমানদার নেতার নাম চক দিয়ে লিখে গিয়েছে কে যেন, রাস্তায় জিলিপি কচুরি ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছেলেটার ঠোঙায় চিলে ছোঁ মেরে গেছে বলে, সামনের লাল রঙের বাড়িটার ছাদে সাদা সাদা জামা কাপড় উড়ে পড়ছে, ছাদের দড়িতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সব, ইলেকট্রিক তার কাঁপছে, পাশের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল, কি একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা আছে যেন ; ঘোড়েল নেতাটির নাম পিঠে জাঁকিয়ে গাধাটা হাঁকড়াচ্ছে আবার, যেন নামটা মুছে না দিলে বেচারী ককিয়ে কূল পাবে না আর। বেঘোর হুল্লোড়ে ফাল্গুনের বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকার চোখে চুলে, সুতীর্থের দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুস করে ছুটে গেল তার আগে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেল—থেমে গেল বাতাস। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল তার দেশলাইয়ে শুধু একটা কাঠি আছে। ঘরের দরজা জানালা সবই বন্ধ করে দিতে লাগল সে তাই।

চোখ বুজে কুমারী মেয়ের ধ্যানের মত শান্তিতে বসেছিল মণিকা। শীত প্রথম যখন আসে দেশে তেমনই একটা আশা আমেজ চমকিত ভাবে টের পাওয়া যায় শীত প্রথম যখন ছেড়ে যায় দেশ থেকে।

অন্ধকারের ভেতর দেশলাইটা জ্বলে উঠল সুতীর্থের ; আগুনের ধ্বকে লাল হয়ে উঠতে লাগল চুরুটের মুখ। ভালো করে চুরুট জ্বলে উঠলে দরজা জানালা খুলে দিতে দিতে সুতীর্থ বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি ?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছ।'

মণিকা সেন স্বর্গের থেকে হারিয়ে স্বর্গে ফিরে এসেছে আবার, এমনই চোখে সুতীর্থের দিকে একবার তাকিয়েই ওপরে চলে গেল।

নাঃ, বেলগাছিয়ায় যাওয়া হবে না আজ আর। সুতীর্থ ঘণ্টাখানেক পরে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই নিয়ে বসল, তারপরে একটা ইকনমিকসের—একটা উপন্যাস টেনে নিল—একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করল—কিন্তু কাকে ?

একটা দীর্ঘ কবিতা ফেঁদে বসল—কিন্তু কেন ?—ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই হল না তার।

স্ট্রাইক অনেক দূরে কাঁদছিল। মণিকা তেতলার ঘরে নাক ডাকাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ক্ষেমেশের বেলগাছিয়ার বাড়িতে আকাশে বাতাসে পাখির পালকে সকালবেলার রোদ এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুতীর্থ গিয়ে পৌঁছল।

'এই যে তুমি এসেছ সুতীর্থ—বোস—বোস—'

'আমি তোমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় ক্ষেমেশ—'

'তাই কি ? আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আর আমি শিবের গুরু রাম'—ক্ষেমেশ একটু তেরচা কাস্নিক মেরে বললে, 'রামের গুরু শিব।'

'তুমি আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকবে আমার চেয়ে এত ছোট হয়ে, তা ডেকো। আমাকে সেদিন তুমি বলেছিলে বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে আছ—নিরিবিলিতে—এর চেয়ে বেশি কোনো দাবি তোমার নেই, চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই, অবসর আছে, রোদ পাখি মাটি ঘাসের কোলে সময় কেটে যায় ; এমনি নির্লিপ্ত নিকাজের ভেতর দিয়ে যদি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়—শান্তিতে—তা হলে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার—বলেছিলে—'

'এর চেয়ে বেশি সাধ কার আছে ?'

'সকলেরি প্রায়—তোমার মত দু-একজন ছাড়া।'

'থাকা কি উচিত ?'

সুতীর্থ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশের নীল ফিকে ধূসরতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো থিসিয়ুসের এথেনস নয়—এমন কি পট এঁকেছিল যে খুশি মানুষেরা আমাদের দেশে—সে দিনও নেই। তুমি দেখছ তো কি রকম পৃথিবীতে আছ। তোমার বাবার বাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা আকাশ আলো পাখি ফড়িঙের ভেতর ঘুরে ফিরে জীবন কাটানো খারাপ নয়। খারাপ নয়, খুব ভালো। কিন্তু চারিদিকের পৃথিবী এমনই বেয়াড়া যে এ রকমভাবে মৌচুষকির নীড় বানিয়ে শান্তি চর্চা করতে দেবে না তোমাকে—'

'কি করবে ? নীড় ভেঙে দেবে ?'

'শীগগিরই। এখুনি তো ভেঙে পড়ছে—'

'ভেঙে পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি না তো।'

'এক-আধটা পাখি থাকে, তাদের বাসার থেকে ডিম চুরি গেলে কিংবা পিছলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলেও টের পায় না।'

'কি ভেঙে যাচ্ছে আমার ?'

'এই তো আমিই এসে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মতন আরো অনেকে অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে লেগে আছে। ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলে এমন দল বেঁধে আসব যে এখন থেকেই নিজেকে যদি তুমি তৈরি করে না নাও বড় অঘটন হবে তোমার।'

'অঘটন ? মরে যেতে হবে ?'

'মরে যাওয়া সহজ জিনিস যদি শান্তিতে মরা যায়। কিন্তু খুব অশান্তিতে মরতে হবে। কত ভালো মানুষ রুশ বিপ্লবে জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরেছে, আমরা বাঙালীরা মন্বন্তরে যাচ্ছি। খুব খারাপ। কিন্তু এর চেয়েও সব বিকট রকমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে। এদিকেও আসবে।'

সুতীর্থ পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিল।

'ফেরারি যদি না হতে চাও তা হলে মানুষের ভেতর মিশে যেতে হবে তোমার, গঠন করতে হবে ; একদিকে বিরূপাক্ষের মতন ভাম আর একদিকে তোমার মতন খরগোশকে দেখে সুন্দরবনের পরীরা তামাশা বোধ করতে পারে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাদের—'

'ভামটাকে মারা কঠিন।'

'কেন ?'

'কি করে মারবে তুমি নিজেকে ?'

'তা হবে। কিন্তু তুমি তো খরগোশ।'

'তা হবে। কিন্তু খুব লম্বা কান নেড়ে নেড়ে কথা বলছ তুমি আজ সকালবেলা থেকে ধোপাবাড়ির ছাঁদন দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে। তুমি তো এ রকম ছিলে না। রুচি বিকার হয়েছে তোমার ; চরিত্রে বিকার দেখা দিয়েছে। আমাকে গুলি করবার কথা বলছিলে তুমি—'

'হ্যাঁ বলেছিলুম—'

'নিজের হাতে করবে ?'

'দরকার হলে করব।'

'তোমার চাকর কাকে গুলি করবে ?'

'আমার চাকর নেই—'

'আমার আছে। আমার কুকুরও আছে কিন্তু আমার কুকুরও আমার গুণীমানী বন্ধুকে গুলি করতে লজ্জা বোধ করে।'

'কুকুরটা আশ্রমে থাকে বুঝি ? মোহনভোগ খায় ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা আমাকে বলতে চায় না তোমার কাছেও ঘেঁষে না ; কি ছিলে তুমি ওর ? শুনেছি খুব মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল নাকি ?'

'ও যতদিন বাচ্চা ছিল ততদিন ছিল ; একটু সোমথ হতেই তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেমেশ—'

নরম, স্নিগ্ধ গলায় বলছিল সুতীর্থ ; গলায় আরো আন্তরিক আকুতি এসে পড়ল ; সুতীর্থ বললে, 'এটা তোমার বাড়ি ছিল একদিন, এখন আমার বাড়ি। আমি যাদের থাকতে বলব এখানে তাদের বাড়ি। এখানে ছ' হাজার লোক অনায়াসেই থাকতে পাবে। কলকাতার পথে ঘাটে ফুটপাথে ভাগাড়ে লেজ খসবার আগে ব্যাঙাচির মত কাতরাচ্ছে তারা। এইখানে জায়গা দিতে হবে তাদের'—সুতীর্থ বললে।

'দেখ। পুলিস কমিশনার কি বলে ?'

'পুলিস কমিশনারের দোহাই দিচ্ছ ?'

'দেখ। মন্ত্রীরা কি বলে—'

'মন্ত্রীরা ?'—

'জনসাধারণের প্রতিনিধি তো তারা।'

'বাড়ি রেকুইজিশনের অফিসার হিসেবে আমি আসিনি ক্ষেমেশ।'

'এসেছ স্বাধীনভাবে, কিন্তু শাসন কর্তাদের ডিঙিয়ে তো কিছু করতে পারবে না। কলকাতার প্রায় সব লোকই তো আজ সাদা দাঁত কেলিয়ে ঘোড়া হয়ে গেছে—ছ্যাকড়া গাড়ির। দিন রাত ছুটছে—নাদছে—কর্পোরেশনের চামচ দিয়ে শায়েস্তা করতে পারছে কি ঘোড়ার নাদগুলো ঝাড়ুদার? কর্পোরেশন ভেঙে পড়ছে—দানা পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। আমার বাড়িতে তো ঢের ঘাস, কিন্তু রি-হ্যাবিলিটেশন অফিসারকে ডিঙিয়ে ঘাস পাবে সেই ঘোড়াগুলো? কই, নোলা দেখা যাচ্ছে না তো সে সব ঘোড়ার। আসুক না অফিসার সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেহাতে চলে যাব—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে চুরুটের মুখে বেশ অনেকখানি ছাই জমিয়ে ফেলেছে ; চুপ করে বসেছিল সে, কোনো কথা বললে না।

'তুমি উদমহরের ঘোড়ার মত এসে দাবনা ঝাপটালে কি হবে সুতীর্থ—তোমার ডমফাই ঘোড়ারা কোথায়? পথে পথে না চেঁচিয়ে না নেদে, দলঘাস আর বুটের বদলে হাওয়া না চিবিয়ে সমস্ত ঘোড়াগুলো যদি একটা নিদারুণ হ্রেষাগর্জনে জেগে উঠত, তা হলে বেছে বেছে আমাকে এসে গুলি করতে চাইতে না তুমি, কাদের গুলি খেয়ে তুমি নিজেই লাট মেরে পড়ে থাকতে ভেবে দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমি বোকা বলেই আজ সকালবেলা আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এসে লেজ নাড়ছ। তোমাব মাথায় আগে ঢের জিনিস ছিল সুতীর্থ—কিন্তু আজকাল এই রকম হয়ে যাচ্ছ? যারা কাজের মানুষ তারা অন্য জায়গায় অন্যভাবে কাজ করছে।'

'রক্ত ছাড়া বিপ্লব করতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু সে রুচি বা ওজন শক্তি এখনও লাভ করেনি তো মানুষ।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বাতাসে বাতাসে কয়েকটা কাঠি পুড়ে গেল—বাতাস থেমে গেলে বললে, 'কিন্তু কিই বা হবে রক্ত বিপ্লব করে। অনেকবার তো সে সব করা হল। কিছু হল না তো। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন চীনের বড় বড় বিপ্লব সব এল গেল—কিন্তু কোনো দিকনিরূপণ মন পরিবর্তন হল না তো মানুষের। আরো খারাপ হল তো। এর চেয়ে আগেকার পৃথিবী ঢের ভালো ছিল : লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙ যুগের চীন, অশোক চক্র, হোয়েন সঙ ফা হিয়েন শ্রীজ্ঞানের ভারত আরো আগেকার স্নিগ্ধ ভাত কাপড়ের, মিহি চেতনার মহৎ চিন্তার ভারতবর্ষ থিসিয়ুস পেরিক্লিসের গ্রীস—মানুষ তখন

পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোতেই খেলা করত, কাজ করত, কথা ভাবত; মাটি খুঁড়ে ইঁদুর ছুঁচো শেয়াল ভোঁদড়ের মত থাকবার দরকার হয়নি তো তার মারণ শিল্পের ভয়ে।'

'হ্যাঁ, মৃত্যুশিল্পী হয়ে দাঁড়াল মানুষ, ভয়ের আকর সে শিল্প বটে সুতীর্থ, কিন্তু তবুও পরস্পরের ভয়। মারণশিল্প খারিজ করলেও মানুষকে মাটি খুঁড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে মানুষেরি ভয়ে—'ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার চুরুটটা বড্ড কড়া সুতীর্থ; অত ধোঁয়া ছেড়ো না; গাঁজা না কি?'

'মিঠে গাঁজা; কড়া বলেই মিঠে।'

'চা খাবে?'

'দাও—নেবুর রস দিয়ে।'

'রঞ্জন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি হয়তো। উঠলে চা হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'রঞ্জন কে?'

'আমার চাকর।'

'এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছে যে?'

'রাত জাগতে হয়।'

'তুমি তো একা মানুষ। অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখ চাকরকে?'

'না, তা নয়। ও রোজই প্রায় সিনেমা-থিয়েটার যায়। ন'টার শোতে যায়। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। আমি অবিশ্যি আগেই খেয়ে নিই। ও এসে গান গায়, গাজন গায়, ডালপাতায় পিরভু কাঁপে দেখে, তারাবনের তারা দেখে রাতের আকাশে, শিস্তাইয়ের কথা ভাবে—'

'শিস্তাই কে?'

'ওর আছে একজন। রাঁঢ় বলে ও। মেয়েটা বাঙালী নয়, বেহারীও নয় ঠিক—'

'যায় তার কাছে?'

'যায়, সে আসে; প্রায়ই তো।'

বত্রিশ

'ও, এই সব বুঝি? এই সব রকমারি বুঝি?'

'এই হচ্ছে একরকম—'

'তা, এর চেয়েও ভালো হবে। সবুর কর না তুমি।'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'এই যা হচ্ছে একেবারে তটের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিতে পারবে।'

'আমি নিজে সিনেমা থিয়েটারে যাই না, ও যায়, আমি টিকিটের পয়সা দিই; সৌজন টিকিট কিনে দিই ওকে নাচগান জলসা আসরে মজলিস দেখবার জন্যে—'

সুতীর্থ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'যেখানে তোমার অন্তত একটা নাইট স্কুল খোলা উচিত তোমার বাড়িতে, সেখানে তুমি এই সব করছ, ক্ষেমেশ—রঞ্জনকে নিয়ে। সেকালে কলকাতার বনেদী ঘরের বাবুরা বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালের বিয়ে দিত খুব ঘটা করে। তুমিও তাই-ই করছ দেখছি। রক্তটা রয়ে গেছে এখনও তোমার নাড়ে—'

সুতীর্থের বুদ্ধিবিবেকের দৌড় কেমন যেন তামাশা অনুভব করছিল ক্ষেমেশ, ক্লান্ত লাগছিল, করুণা বোধ করে বললে, 'মিছেই তুমি কথা বলছ সুতীর্থ। রঞ্জন তুচ্ছ, ছোটলোক মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শখ থাকবে না তার?'

'থাকবে বই কি। শখ না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ কি। আমার তো মাঝে মাঝে শখ হয় রাশিয়ায় আবার জারের এলেম ফিরিয়ে আনি—'

'স্ট্যালিনই তো জার—'

'খাঁটি জার নয়। ইচ্ছে করে আমি জার হই, রাসপুটিন হয়ে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করি, এদের সকলকে রুখবার জন্যে হয়ে দাঁড়াই লেনিন, চার্চিল হয়ে বলশেভিক শায়েস্তা করি, রুজভেল্ট ট্রুম্যান হয়ে শাঁখের করাতে কেটে ফেলি চার্চিলকে ইংরেজদের—এই সবই তো শখ, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না;—কিন্তু এইবার হবে, শখের খিদমতদারদের সঙ্গে আমার বেশ লটকাচ্ছে—'

জয়তী কখন ঘরের ভেতর ঢুকেছিল সুতীর্থ দেখেনি। ঘরের ভেতরে

সোফা সেটি কৌচ কুশনের ঠাসাঠাসি ; এরই একটায় গিয়ে বসেছিল জয়তী। সুতীর্থ ঘাড় কাত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, জয়তীকে দেখল না ; সুতীর্থের থেকে খানিকটা দূরে—আড়াআড়িভাবে—একটু পিছিয়ে বসেছিল জয়তী।

'খুব বেশি কথা বলা অভ্যেস নয় তোমার—' জয়তী বললে। ঘরে যে আরেকজন লোক এসেছে বুঝল সুতীর্থ। কিন্তু জয়তীর দিকে মুখ না ফিরিয়ে যেমনিভাবে জানালার ভিতর দিয়ে আকাশ পাতা পালক আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিভাবে চেয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'বেশি কথা বলছি আজকাল। কম কাজ করছি—।'

'বাটখারাটাকে টায়টোয় রাখতে পেরেছ তাই!'

'হ্যাঁ। তুমি বেশি কাজের বহর দেখতে চাও জয়তী?'

'তোমার তরফ থেকে? আমাকে দেখিয়ে লাভ কি?'

জয়তী বললে, 'কি কাজ করছ তুমি আজকাল?'

'কিচ্ছু না।'

'দেশের কাজ করছ?'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি—আমি—খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে।' জয়তী একটু হেসে বললে। গালে টোল পড়তে না পড়তেই হাসি ফুরিয়ে গেল তার।

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি আমি আমরা ভেল্কি লাগাতে পেরেছি বলে এল না। এল কতকগুলো লোক প্রাণপাত করেছে বলে। স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়েছে তারা অনেকেই আজ মৃত। দেশ দু ভাগ হয়ে যাবে খুব সম্ভব। স্বাধীন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে মুনাফা পাবে—আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে ও বড় বড় সিধে পাচ্ছে। দেশ যতদিন অধীন ছিল এরা ব্রিটিশদের যেমন রাজভক্তি দেখিয়ে এসেছে—দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতা নিয়ে এরা ঠিক তেমনই মাতামাতি করবে। স্বাধীনতা ও তার নিয়মানুগত্য নিয়ে এদের মাতামাতির কেলেঙ্কারিতে কোনো ভদ্রলোক রাস্তায় মুখ দেখাতে পারবে না আর।'

'এই সব হবে?' জয়তী বললে।

'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।'

স্বাধীনতা তো উনিশ শো আটচল্লিশের জুনে আসবে।'

'শুনেছি আগেই আসবে—সাতচল্লিশের আগস্টেই,' ক্ষেমেশ বললে।

'কে বলেছে তোমাকে ক্ষেমেশ?'

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না, তবুও আমার কানে আসে।'

'তাহলে এ বছরই আসছে স্বাধীনতা? স্থতীর্থ?'

'আসছে। জওয়ার ক্ষেতের থেকে পাখি তাড়িয়ে দিচ্ছে নাকি নেতারা।'

'তোমার নিরাশার একটা কারণ হচ্ছে এ স্বাধীনতায় তোমার কোনো লেনদেন নেই; পাচ্ছ অথচ দাওনি কিছু; এই তো বলতে চাও তুমি? কিন্তু আমাদের কারুরই কোনো দান নেই। ক্ষেমেশের আছে? নেই। আমার নেই। কোটি কোটি লোকের নেই। তাই বলে যারা এ জিনিস সম্ভব করে তুলেছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খুব কৃতার্থ তো আমরা।'

'জয়তী স্থতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, স্বাধীনতায় তোমার কোনো দান নেই? কিন্তু তুমি তো কয়েকবার জেলে গিয়েছ স্থতীর্থ?'

'শখের জেলে যাওয়া। কোনোদিন পিস্তল না ধরেই জেলে গিয়েছি আমি।'

'গিয়েছ তো। উদ্দেশ্যও মারাত্মক ছিল তো?'

'শুধু উদ্দেশ্য দিয়েই কি আমাদের যাচাই হবে ক্ষেমেশ?' স্থতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ওরকমভাবে যাচাই করত, তা হলে মুনিদের মধ্যে বেছে বেছে জরৎকারু মুনি আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এরকম ঢুকে পড়তে পারত কি আজ?' ক্ষেমেশ বললে স্থতীর্থের দিকে তাকিয়ে; 'পনেরো কুড়ি বছর আগে খতম হয়ে যেতে।'

'দিশী সরকারও অগাধ জলের মীন নিয়ে মাথা ঘামাবে না—তাদের অনেক সরকারী শহীদ আছে।'

'শহীদ হতে চায়নি কোনোদিন,' জয়তী বললে, 'হতেও পারল না, সেইজন্যেই তো ক্ষেমেশ খুব স্বাধীনতা বোধ করছে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমি বিরূপাক্ষ—আমাদের এইরকম ধাত জয়তী। আমরা গোড়ার থেকেই স্বাধীন—সবরকম ফসকা গেরোর পায়জামায়:—পাঁচ দরজিতে মিলে আমাদের কি আর নতুন স্বাধীনতা দেবে।'

'সাতচল্লিশের আগস্টে স্বাধীনতা আসছে তুমি তো বললে ক্ষেমেশ।'

'সেইরকমই শুনেছি আমি।'

স্থতীর্থ বললে, 'প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন কানাইলালের মত শহীদ হতে

চেয়েছিলুম আমি, কে তোমাকে বলেছে জয়ন্তী? ঘোষ কতবার আমাকে পিস্তল দিতে চেয়েছিল—সেই বারীন-অরবিন্দদের সময়ের কথা—মহাত্মা গান্ধীর নামও শোনেনি কেউ তখন—কিন্তু আমি কিছুতেই পিস্তল নিলুম না। কিছুতেই মন উঠল না আমার। ওরকম ধরনের বিপ্লবের জন্য কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতে পারিনি। আশ্চর্য পিস্তল না ছুঁড়ে দু-চারটে সাহেব না মেরে দেশ কি করে স্বাধীন করতে পারা যায় সে কথা ভাবতেই পারত না কেউ তখন। এমনই, একটা দুর্বার সন্তাপ ছিল—এত মুখিয়ে চলছিল সব যে, কেউই না ভেবেই পারত না যে, দু-চারশটা পুলিস জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের (চা-বাগানের ক্লাইভ স্ট্রীটের বা মিলিটারির সাহেবদের কে চায় কে পায় এই-রকম ভাব) খুনের সরগরম পথেই স্বাধীনতার রণপায়ে ছুটে আসবার কথা। কিন্তু তবুও আমি পিস্তলের—অপূর্ব—জেল্লা—স্বীকার করতে পারিনি সেই দিনও।'

'তারপরে পেরেছ?'

'না।'

'কোনোদিন পারবে না আর?'

'সে কথা বলতে পারছি না এখন।'

'তখন তোমার বয়স কত?'

'সাত আট।'

'এত অল্প বয়সে এসবের ভেতর জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'আমার বাড়ন্ত গড়ন ছিল: তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের মত দেখাত আমাকে। বারীন ঘোষ তো তাই মনে করেছিল। আমি পিস্তল সরবরাহ করতুম। নানারকম জায়গা থেকে চুরি বাটপাড়ি, মাঝে মাঝে জবরদস্তি করেও পিস্তল যোগাড় করতে হয়েছে। ভারী জিনিস তো পিস্তল। বেশ গায়ে জোর ছিল তখন আমার এক একটা ধু-ধু ফাঁকা জায়গার চখাচখীর ধানী জমিতে গলায় দড়ির মাঠে বৌবাতাসির চরে গাছগাছালি চাঁদমারি তাক করে পিস্তল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তবুও কোনো প্রাণী মারিনি, মানুষ খুন করিনি। যেসব ইংরেজরা তখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসত, তাদের দু-চারজনকে মেরে গভর্নমেন্টকে তরাসে বানিয়ে দিয়ে কিছু ধকল হয় বটে—কিন্তু যুদ্ধ না করে, স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব এই আমার ধারণা ছিল—'

‘এই ধারণার জোরে সুতীর্থ শহীদ হতে পারল না আর,’ ক্ষেমেশ সরতে সরতে লম্বা সোফাটার কিনারে সরে গিয়ে বললে, ‘দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু সরকারী শহীদদের ভেতর সুতীর্থের নাম নেই।’

‘কাদের নাম আছে সেখানে?’

‘প্রায় সবারই আছে—অনেক পর্ব—অনেক পর্যায়—তোমাকে দেখাব জয়তী একদিন।’ ক্ষেমেশ বললে।

‘শহীদদের অনেকেই তো মরে গেছে—’জয়তী বললে।

‘সকলেই,’ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে, ‘মেরে মরা চাই, না হলে শহীদ হয় না কখনো—’

‘কেন, বারীন ঘোষ তো বেঁচে আছেন, উল্লাসকর আছেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী আছেন। শহীদ কাকে বলে সুতীর্থ?’ জিজ্ঞেস করল জয়তী।

‘খুব সম্ভব অধীন দেশে যারা দেশের প্রভুভক্তদের নষ্ট করবার জন্যে লড়াই করে মরে, কিংবা বেঁচে থাকে, মরে বেঁচে থাকে—তাদের শহীদ বলে। যেসব শহীদ মরে গেছে দেশ স্বাধীন হলে তাদের লিস্টি তৈরি করা হয়—খুব ভালো করে চেক করা হয় যাতে কারুর নাম বাদ না পড়ে; পুরোপুরি তালিকা তৈরি হলে তাদের ফোটো, ছবি, অস্থি পাওয়া গেলে অস্থি চিতের ছাই এটা-ওটা সংগ্রহ করা হয়। সভাসমিতি মিছিল-টিছিল বেশ জাঁকিয়ে তুলতে পারা যায় শহীদদের নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে আমাদের দিশী সরকার তাই করবে মনে হচ্ছে।

‘বেশ আঁটঘাট বেঁধে করবে সব; দেখে আমাদের খুব ভালো লাগবে।’ ক্ষেমেশ বললে।

‘কিন্তু যেসব শহীদ বেঁচে আছে তাদের সম্বন্ধে কি হয়?’ জয়তী বললে, ‘তাদের নাম লিস্টিতে থাকে খুব সম্ভব। থাকে না ক্ষেমেশ?’

‘তা তো তুমি জানো সুতীর্থ। নেই তোমার নাম লিস্টিতে?’

সুতীর্থ জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘তাদের নামও থাকে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে বলে দেশ তাদের সম্বন্ধে খানিকটা চক্ষুলজ্জা বোধ করে—দেশের জন্য রিভলবার হাতে লড়েছিল এইসব শহীদরা; দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে; এসব শহীদরাও বেঁচে আছে। বেঁচে থেকে কি করছে? ঘিয়ের ব্যবসা করছে;

কিংবা পুরানো ক্যানেস্তারা বিক্রির কাজ: করুক; মরে যাবে তো একদিন। তারপর সব হবে।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'শহীদ কাকে বলে জিজ্ঞেস করছিলে জয়তী। এইসব লোকদের শহীদ বলে।'

'তা হলে ভারী বিচিত্র তো।'

জয়তীব কথা কানে গেল না সুতীর্থের চুরুট টানতে টানতে নিজের কথার জের টেনে সুতীর্থ বললে, 'এরা শহীদ।'

'শহীদের লিস্টিতে তোমার নাম নেই সুতীর্থ?'

'না।' সুতীর্থ বললে।

জয়তী বললে, 'নেই কেন? তুমি তো কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে লড়াই করছ। কয়েকবার জেলে গেলে—দমদম সেণ্ট্রাল জেলে ছিলে—প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলে—হিজলী ক্যাম্পে ছিলে—বক্সার ক্যাম্পে ছিলে—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'আমি নিজের মনের খুশিতে লড়াই করেছি, ওরা ভালো বুঝে আমাকে জেলে দিয়েছে। রিভলভার চুরি করেছি, পৌঁছে দিয়েছি ঢের, কিন্তু রিভলভার উঁচিয়ে মানুষ মারি নি, চেষ্টাও করিনি। তখনকার সেসব দিনে যে কিরকম দিনকাল ছিল তা তুমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। পিপাসা পেলে আমরা জল খাই, ঠিক সেরকমভাবে চোঁ চাঁ বোমা পিস্তল ছুটত তখন। পিপাসায় ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হত, অথচ আমার কোনো তেষ্টা নেই—এক ফোঁটা জল খাওয়া নেই তখন। বোমা চালান দিচ্ছি, রিভলবার যোগান দিচ্ছি খুব সাত্ত্বিকভাবে, কাউকে মারছি না দেখেশুনে ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে কেউ কেউ আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিনি বিশেষ কিছু, কিন্তু তবুও তো বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত—'

সুতীর্থ চুরুটের দিকে মন দিল, বার কয়েক টেনে জয়তীকে বললে, কেন মরিনি—কেন মরিনি—এতগুলো বছর নিশির ডাকের ভেতর দিয়ে বারীন ঘোষের আমল থেকে বিনয় বোস দীনেশ গুপ্তদের চাটগাঁ আর্মারি রেড—তারপর গান্ধীজীর—তোমরা তো সোদপুর নোয়াখালির কথা বলবে—আমি বলছি সেই অদ্ভুত ডাণ্ডি-চোরি- চৌরার ভেতর দিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে এলুম—কিসে বিশ্বাস ছিল আমার—কিসে অবিশ্বাস ছিল—ভালো করে বুঝবারও সময় পাইনি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল সুতীর্থের বেশী কথা বলে চলেছে সে, এটা

তার স্বভাব নয়: অনেকদিন পরে জয়ন্তীকে দেখে এইরকম হচ্ছে; সুতীর্থ নিজেকে থামিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'এইবারে বুঝে দেখতে হবে সব।' তারপর চুপ করল।

'কি বুঝে দেখবে?'

'এক বছর আমি বিদায় নেব সব কিছুর থেকে।'

'তার মানে?'

'আমার গত তিরিশ বছরের বৃত্তান্ত তুমি তো জান।'

'এইবারে ভালো করে শুনতে হবে সব।' জয়ন্তী বললে।

'সুতীর্থের বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশী জানা ছিল তোমার জয়ন্তী। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি?' ক্ষেমেশ চশমা খুলে নিয়ে জয়ন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে।

'কিছু কিছু জানি।'

তেত্রিশ

সুতীর্থ ঠাণ্ডা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'প্রায় সাত-আট বছর বয়সে আমি কাজে নেমেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য সব জায়গায় চলে যেতুম। আমার বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আমাকে ঘিরে অন্য যেসব ছেলেমেয়েরা থাকত তাদের কাছ থেকে আমি মন্ত্রগুপ্তি পেলুম যে, ইস্কুল কলেজ কিছু নয়—বাঙালী ছেলের পক্ষে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। আমাদের দলের তিরিক্ষে সরপুটির মত রূপমতী একজন মেয়েও এই কথা বলেছিল আমাকে—বলবার কি ঠাট! কি ওজন! আহা! প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে গুলি খেয়ে সেই মেয়েটি মরে গেছে—আজো যখন তার কথা মনে হয়—' সুতীর্থ ক্ষেমেশের জয়ন্তীর চার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েও আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলুম, আট নয় বছর বয়স হবে, সেই মেয়েটির পনেরো ষোল, আমাকে চুমো খেয়ে খেয়ে পুদিনা পাতা মরীচ তেঁতুল আর লবণের যে পাঞ্জাবী চাটনী বানাত—উফ! যখনি এর পরে একা পড়ে যেতুম, আমাকে কোলে টেনে মাইয়ের ওপর নিয়ে যেত সে; এমনই

স্যাতা জোবড়া মনে হত, এত বিরক্তি লাগত, এত রাগ হয়েছিল একবার—যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলুম তার নাক মুখ—'

সুতীর্থ একটা ঢোক গিলে বললে, 'মানুষের ইচ্ছা খুব দেরিতে আসে, তার ভালবাসাও ; আট ন' বছরের একটা কুকুর তো ছেলেপুলের ঠাকুর্দা, কিন্তু ন' বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলেও ওরকম টানাহেঁচড়া পছন্দ করতুম না। শিবের মাথায় সিন্দুর ছিলুম। তিনচারজন বেশ রায় রায়ান গোছের পুরুষও ছিল সেই বিপ্লবীদের দলে, খুবই শ্রদ্ধা করতুম তাদের ; ভালোবাসতুম মেয়েটিকে, কিন্তু তবুও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চালিয়ে ইংরেজ খুন করে দেশকে স্বাধীন করবার যে সব পথ দেখিয়ে দিত তারা, যে সব মোক্ষম জবানী ঝাড়ত—আমি সে সব মোটামুটি বিশ্বাস করলেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি কিছু ক্ষেমেশ—'

'সেই মেয়েটির কি নাম ছিল ?'

'দুটো নাম ছিল ; একটা রম্ভা, আর একটা কিনা গোতমী। অদ্ভুত নাম। গোতমী বলে ডাকত তাকে কেউ কেউ। কেউ কেউ কিশা বলত।'

'কে গুলি করেছিল তাকে ?'

'বিপ্লবীদেরই কেউ।'

'কেন ?'

'সন্দেহ করেছিল কিশাকে। সে একজন ছোকরা ডেপুটিকে ভালোবেসেছিল—রটে গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। কিশা ষড়যন্ত্র সব ফাঁস করে দেবে আশঙ্কা করছিল ওরা।'

'নাগার্জুনের মত স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কোনোদিকেই কোনো পিঠ খুঁজে পেলে না বুঝি সুতীর্থ ? তবুও তো দলে ভিড়লে তাদের।' জয়ন্তী বললে।

'হ্যাঁ, কিন্তু দলের জন্যে সব দিলুম না তো, ইস্কুল কলেজ তো ছাড়লুম না।'

'জেলে তো গেলে বারবার।'

'কিন্তু পরীক্ষায়ও পাশ করতে লাগলুম। হিজলী ক্যাম্পেও গিয়েছি, বি-এ অনার্সও যুতেছি, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে রিভলভারও জুগিয়েছি, খুব মন দিয়ে পড়ে এম-এ পাশও করা গেল—কিন্তু রিভলভারে বিশ্বাস ছিল না আমার—ইউনিভার্সিটিতেও না। এক সময় আমি ছড়া কবিতা গল্প লিখতুম ; বেশ সাড়া পড়ে যাচ্ছে আমার লেখা নিয়ে—দেখছিলুম। তবুও অনেক দিন

হয় লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যে আমার বিশ্বাস যদি থাকত তাহলে এরকম হত না।'

'বিপ্লব' করলে, জেলে গেলে, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী নিলে, সাহিত্য করলে, কিন্তু কিছু হল না বলতে চাও?'

'কিছু হল না জয়ন্তী, আমার ধর্ম নেই বলে।'

'ধর্ম নেই মানে? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই? ঈশ্বরে বিশ্বাস তো আমারও নেই।'

সুতীর্থ বললে, 'পৃথিবী যে খারাপ নয়, মানুষ যে সত্যিই ভালো. প্রাণের গঙ্গা যে রক্তে নাওয়াবে না মানুষকে আর, কোনো বিপ্লবেরই দরকার হবে না একদিন সমাজ যে সুস্থ ও শুভ হয়ে উঠবে সকলের জন্যে, জীবন যে বাস্তবিকই আশা-ভরসার, এসব জিনিসে কোনো আপ্ত বিশ্বাস নেই আমার। সেটা থাকলেই ভালো হত; এ যুগে বিশ্বাস কাঁচিয়ে গেলে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না আর।'

আজকালকার বাজারে দিনরাত লেনদেন চলছে যে সব ব্যাপারের ব্যাঙ্কগুলিকে সাক্ষী রেখে—গাদা বাজারকে ঘুষ দিয়ে ওপরওয়ালাদের সার্টিফিকেট যোগাড় করে, দরকার মত অসংখ্য মেয়েমানুষের মাংস খেয়ে নতুন মাংসের জন্যে বেড়াজাল পেতে রেখে; এসব যখন একটা মস্ত বড় কালান্তক ঢেউয়ের মত উনিশশো সাতচল্লিশ আগস্টের পিঠের ওপর গিয়ে থুবড়ি খেয়ে পড়বে তখন তো আমরা স্বাধীনতা পাব। মানুষ যদি খুব ভালো মনে কাজ করে তাহলে পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে এতকালের ঘোলা আঁশটে মলমাংস ঝেড়ে কিছু নিরালতা লাভ করতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো বুদ্ধি প্রেরণার কাজ করবে— একটানা পঞ্চাশ বছর করবে? আমি শুনিনি তো কোনোদিন কোনো ইতিহাসে এরকম হয়েছে—' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতে করতে পারে, কিন্তু এক্ষুনি করবে বলে মনে হয় না।' জয়ন্তী সুতীর্থকে বললে।

'তাহলে কি দলিলে স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পাবে মানুষ?' ক্ষেমেশ তার পোড়া সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'দেখা যাক। —উনিশশো সাতচল্লিশ এসে নিক।'

'দশ বারো বছর আগে আমি শবরমতীতে গিয়েছিলুম একবার', সুতীর্থ বললে, 'মনে কোনো প্রত্যাশা, সংকল্প কিছুই ছিল না আমার; কঠিন মন নিয়ে গিয়েছিলুম ভেবেছিলুম, গান্ধীজীকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভক্তি

ছাড়া কেউই বিশেষ কিছু ভাবে না তাঁর সম্বন্ধে মানুষটার খুব বাইরের সুখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু এত বড় সুখ্যাতি কেন এ সন্দেহ বাইরের পৃথিবীতেই শুধু নয়, খুব সম্ভব ভারতবর্ষেও সব জায়গায় প্রায় দানা বেঁধে আছে—একটু আঁচড়ালেই টের পাওয়া যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। তিনচার দিন ছিলুম আশ্রমে। সত্যিই একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগল মনের ভেতর—মন নয় আত্মার ভেতরেই যেন—ভারতবর্ষের, পৃথিবীর আজ না হোক, কাল পরশু যে ভালো হবে মানুষের মানে যে খারাপ নয়, সত্যিই ভালো : সেটার প্রতি। তারপরে কলকাতায় ফিরে ছ'মাস খুব বিশ্বাসের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করেছিলুম আমি ; গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলুম গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু টিঁকল না ; কাজেই শুধু অবিশ্বাস হল না ; মানুষকেই শুধু না, মোহনদাস করমচাঁদকেও বিশেষ কোনো সারাৎসার হিসেবে উপলব্ধি করতে পারলুম না আমি।'

'সে রকম সারাৎসার কে আর থাকে পৃথিবীতে ?' জয়তী বললে।

'কে আর থাকে পৃথিবীতে : পৃথিবীর মানুষ তো সব।' ক্ষেমেশ ভুরুর উস্কানিতে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে।

ক্ষেমেশের মুখ ভুরুর দিকে তাকিয়ে দেখল জয়তী, হাসলেও হাসতে পারত ; কিন্তু গম্ভীর হয়ে ছিল তার মন, সুতীর্থ ঠিকই বলেছে, হয়তো সারাৎসার কেউ নেই, কিছু নেই, খুব ছোট তিলের মত পরিসরেরও ভেতর প্রতি মানুষের নিকটতম পরিজনটি ছাড়া।

'কিন্তু ছ'মাস—এত অল্প সময়ের মধ্যে—এত বড় একটা প্রভাব—তোমার মনে বেল কুড়িয়ে রাইয়ের সামিল হয়ে গেল—এটাও খুব আশ্চর্য সুতীর্থ।'

'বেল কুড়িয়ে রাইই বটে', বললে সুতীর্থ, 'বেশ বলেছ তুমি ক্ষেমেশ।'

'তুমি গিয়েছিলে আর শবরমতীতে ?'

'না, আর যাই নি।'

'শুনেছিলুম তুমি পর্ণকুটিরে গিয়েছিলে বছর কয়েক আগে—' ক্ষেমেশ বাইরের চারদিককার উজ্জ্বল ঝলসানির আর ঘরের ভেতরের একজন নারীর কোথায় যেন সৃষ্টির ঢলের ভেতর রোদে স্পর্শে শব্দে মিল হয়ে গেছে অনুভব করে আলোবাতাসে চোখ বুজে বসে থেকে সুতীর্থকে বললে।

'না, যাইনি।'

'এই তো সেদিন সোদপুরে এসেছিলেন—গিয়েছিলে ?'

'না।'

'কেন?'

'বিশ্বাস নিজের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়—বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস। চলাফেরা চিন্তা অর্থের আমার মনে হয় আমার জীবনের ছোট আধারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা জমিয়েছি সব। এখন ব্রহ্মাণ্ডের ঝাঁপি এলেও ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। কী দেবে তা? যা দেবে জানা আছে আমার। মোহনদাস করমচাঁদজীকেও আবার দেখবার দরকার নেই। দেখেছি। এখন বছরখানেকের জন্যে তোমাকে বলছিলুম জয়তী, গ্রামে চলে যাব আমি। ভেবে দেখব সব। অভিজ্ঞতার থেকে কি বেরুবে আমার? বিশ্বাস না অবিশ্বাস? দেখব, বুঝব, এর পরে কি করতে হবে ঠিক করব।'

'কোথায় কোন গ্রামে যাবে তুমি?'

'ঠিক করিনি।'

'কবে যাবে?'

'আজকালই।'

'তুমি তো অফিসে চাকরি করতে?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছিলুম একটা স্ট্রাইক নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে?'

'ছিলুম। আমার চেয়ে ভালো হাতে তুলে দিয়েছি বিধান ব্যবস্থা সব।'

'স্ট্রাইকটা ক'দিন চালিয়েছিলে?'

'মাসখানেক।'

'ও, তারপর ব্যাণ্ডের আধুলি দেখিয়ে চলে এলে বুঝি। তোমার বয়স হয়েছে সুতীর্থ—এখন চুপচাপ বসে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী পড়া উচিত তোমার।' ক্ষেমেশ বললে।

'একত্রিশটা দাঁত আছে তোমার ক্ষেমেশ', সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি কঙ্কাবতী পড়ি—'

'তাহলে বত্রিশটা দাঁত হবে ক্ষেমেশের?' জয়তী একটু তামাশা বোধ করে বললে, 'ভারি মজার কথাই তুমি বলতে চাচ্ছ সুতীর্থ।'

'ক্ষেমেশের লাইব্রেরী থেকে ও বইগুলো যোগাড় করে দেবে আমাকে জয়তী', সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের লাইব্রেরীটা বেশ ভাল, অনেক রকম বইই নেই, কিন্তু যা আছে রঞ্জনেরও ভালো লাগবে।'

'তুমি কোথায় থাক আজকাল?' জয়ন্তী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

'লেক বাজারের দিকে।' সুতীর্থ বললে।

'ফ্ল্যাট ভাড়া করে? ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে গ্রামে? তাহলে ফিরে এসে তো বাড়ি পাবে না আর কলকাতায়।'

'কলকাতায়ই যে ফিরে আসব এমন তো কোন কথা নেই।'

'এখানে না ফিরলে কাজ করবে কোথায়?'

'কাজের জায়গা দেশগাঁয়ে নেই?' সুতীর্থ একটু তেরছা চোখে জয়ন্তীর দিকে তাকাল।

'কিন্তু তোমরা তো বড় কাজ করবে। গাঁয়ে কাকে নিয়ে কাজ করবে? গাঁয়ে লোক কোথায়?'

সুতীর্থ পকেট থেকে একটা নতুন চুরুট বার করে বললে, 'তুমি পাড়াগাঁ দেখনি কোনো দিন জয়ন্তী—'

চৌত্রিশ

'আমি হালিশহর, সোনারপুর, মজিলপুর, লক্ষীকান্তপুর—গিয়েছি তো অনেক জায়গায়।'

ক্ষেমেশ—চা আসছে না রঞ্জন আসছে না, দাড়ি কামাবার ক্ষুরটুর আসছে না, একটু বিরক্ত হয়ে, 'এই রঞ্জন—এ—ই—এই—ই' বলে গলাজলে দাঁড়িয়ে গানের গলা সাধবার মত চিৎকার করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'বালিগঞ্জ গিয়েছি, টালিগঞ্জ গিয়েছি, ঢাকুরিয়া গিয়েছি, চেতলা গিয়েছি, বেহালা গিয়েছি—তুমি কার গাড়ি হে বুইক? আমি আগে ছিলাম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের; এখন কার? এখন বিরূপাক্ষ রাজবংশীর; আরে কার গোরব্যাটা! কার? আজ্ঞে জয়ন্তী দেবীর। তবে চল, চল, আমাকে খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, আলিপুর, পাকপাড়া নিয়ে চল—আমি বাংলাদেশের গ্রামগ্রামালি দেখব—আমি গাঁয়ের ডাক শুনেছি—আমার হিলম্যান মিংকর্স-এর ডাক—দশ গ্যালন পেট্রলে হবে?—না বেশী লাগবে ধনদা ঠাকুর?—বেশী লাগবে?—আবার কালোবাজারের শেয়ারের ডাক শুনিয়ে ছাড়বে দেখছি—'

ক্ষেমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু ওপরের থেকে আসছি জয়ন্তী।'

'কেন ?'

'আমার ভোরাইটা সেরে আসি।'

'তোমার ঘড়িতে কটা ক্ষেমেশ ?'

'সাড়ে আটটা, এইবারে মুখ ধোব, দাড়ি কামাব, বাথরুমে যাব, রঞ্জনকে ওঠাব ঘুমের থেকে, চায়ের ব্যবস্থা হবে—'

'ক্ষেমেশ, কাল রাত চারটা অবধি বাইরে ছিল রঞ্জন ?' জয়তী জিজ্ঞেস করল ?'

'কড়া নাড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি ? তখন পাঁচটা। এই তো সবে বারান্দার শান চেলে সাত পাক খেয়ে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছ—চলো জয়তী আমার সঙ্গে ওপরে—'

'কেন ?'

'বারোটার আগে রঞ্জন ঘুম থেকে জাগবে বলে মনে হয় না—হিটারে চা করে নেবে চল।'

'আমি চা খেয়ে এসেছি।' সুতীর্থ বললে।

'তোমাকে তো ভোর পাঁচটায় চা করে দিলুম—তুমিও এসো ক্ষেমেশ, আমি যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ঠিক হয়ে নিতে তোমার ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবে—তারপরে নিচে এসো—আমি চা ঠিক করে রাখব।'

ক্ষেমেশ চলে গেল।

'বিরূপাক্ষের সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায় ?'

'তার বাড়িতে—সে যে তোমাকে বিয়ে করেছে তা তো আমি জানতুম না। কবে বিয়ে হল ?'

'বছর তিনেক আগে।'

খানিকটা চুরুটের ছাই সুতীর্থের শার্টের ওপর ঝরে পড়ল, জামার ছাইটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা না করে, চুরুট না টেনে—কথা ভাবছিল সুতীর্থ—কি কথা সে নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। অনেক দূরে একটা বটগাছের ডালপালার ভেতর একটা কালো পাখিকে আবিষ্কার করল তার চোখ। সুতীর্থ ভাবছিল, আমার চোখের বাহাদুরি আছে বটে ; কিন্তু তবুও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে, কেমন একটা ব্যথা : স্নায়ুর ভেতরে না মনোময়তার রক্তে না হিরন্ময়তায় রক্তে না হিরন্ময় কোষে ? জয়তী তাকিয়ে

আছে সুতীর্থের দিকে। চোখ জয়তীর দিকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করে তবুও কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'না।'

'তবে?'

'আমি বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি। আইন আদালতে তো যেতে হবে এ জন্যে।' জয়তী বললে।

'কেন?'

'বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি—বললাম তোমাকে—শোননি?'

'শুনেছি।'

'আমি আলাদা থাকতে চাই এখন থেকে। সেটা আইন দিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে হবে না?'

'তা হলে তো ক্রিশ্চান হয়ে নিতে হয়; ক্রিশ্চান—মুসলমান—'

'হতে রাজি আছি আমি।'

'কি জানি, আইনের মারপ্যাঁচ আমার জানা নেই। খুব কঠিন হবে', সুতীর্থ বললে; ডান হাতটা খানিকটা তুলে নিয়ে দেখল চুরুট নিবে গিয়েছে, জ্বালাতে গেল না, চোখ দিয়ে দেশলাই খুঁজল দুচারবার, চোখে পড়ল দেশলাই সুতীর্থের, কিন্তু চোখে যে পড়েছে সেটা টের পেয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার আগে অন্য বিষয়ের দিকে চলে গেল চোখ—জয়তীর দিকে নয়; স্ট্রাইক, মণিকা, মল্লিক, মুখার্জির কথা ভাবতে ভাবতে জয়তীর কথা মনে পড়ল আবার। সুতীর্থ বললে, মন যখন তোমার বিরূপাক্ষের দিকে নেই, আইন ওর দিকে থাকলেও কি আর হবে।'

'কিছু করতে পারবে না?'

'কিছু করতে চাইবে না।'

'আমার ওপর সব স্বত্ব ছেড়ে দেবে ও?'

চুরুট নিবে গিয়েছে টের পেল সুতীর্থ।

সোফাগুলোর আনাচে কানাচে কি যেন খুঁজে তাকাতেই দেশলাইটা চোখে পড়ল তার; জ্বালিয়ে নিল চুরুট।

'পাঁচ লাখ টাকা আমি নিয়ে এসেছি। বালিগঞ্জের বাড়িটাও আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনে পাকাপাকি করে নিয়েছি।'

'ভালোই তো।' সুতীর্থ বললে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল সে। পাতা—অনেক ঘন পাতা ছায়ার আড়ালের কালো পাখিটাকে কোনো অনুমান বলে ঠিক করে নিতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ওটা কি পাখি: কোকিল না নীলকণ্ঠ না কি; কোকিল যদি হয় মকর সংক্রান্তি কেটে গেলেও এমন চুপ করে আছে কেন? ওটা পাখি তো? একটা ছোট কালো মেরজাই নয় তো দেশোয়ালীদের? পাখী না হয়ে মেরজাই? পাখি হোক।

'আমি এখন কি করব?'

কে—জয়তী কথা বলছে? সুতীর্থ চুরুট ফুঁকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জয়তীর দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ওপরে চলে গেছ স্টোভ জ্বালতে।' স্টোভ তো নিচেও জ্বালানো যায়; সুতীর্থ ঘরের চারদিকের প্লাগের ছ্যাঁদাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে যাবে চলো।'

গ্রামে কোনদিন যায়নি জয়তী; গ্রামের নিমিত্ত নিধান কাকে বলে জানে না। গ্রামগুলো মরছে; তুইয়ে বুইয়ে নতুন গ্রাম নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে যায় নি। গ্রাম কোথায়—কি রকম—কি করতে হবে এই সব গ্রাম নিয়ে—এ সম্বন্ধে কোনো স্বভাব-কৌতূহল কোনোদিন ছিল না, তার। কিন্তু সুতীর্থ তাকে গ্রামে যেতে বলেছে। হঠাৎ যেন অনেক চাপা জলোচ্ছ্বাসে শুকনো ফাঁকা একটা প্রান্তর ভরে উঠল। এটা কি প্রান্তর? না সমুদ্র?

'কোন গ্রামে যাবে সুতীর্থ?'

'ঠিক করিনি এখনো।—তবে কোন একটা গাঁয়ে নয়—অনেক গ্রামে যাব।'

'ভারতবর্ষকে তো এখনও দুভাগ করা হয়নি। কিন্তু হবে শুনছি। ওদের ভাগে যে অংশ পড়বে সেসব গ্রামেও যাবে?'

জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহরে তো অনেক বোকা লোক আছে; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতির কসুর নেই। তাদের ওপরয়ালা আছে, আরো খারাপ। আরো ওপরে—সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা

নিরেস অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখবে এরা সকলে মিলে আমাদের দুজনকে পালে চাপা দিয়ে লাট করে ফেলতে চেষ্টা করছে—'

'এরা সকলে মিলে নয় এদের অনেকে—'

'কলকাতা দিল্লিরও চাঁই লোক আছে ওদের মধ্যে।'

আমরা তো কোনো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছি না—ভালো কাজ করব। আমাদের দিকেও লোক থাকবে। আমি যাব গ্রামে।

'কদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকতে বল।'

সুতীর্থ চুরুটে টান দিয়ে শেষে বললে, 'এতদিন তুমি থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'গ্রামে গ্রামেই থেকে যাব—কলকাতায় ফিরব না আর। মহা সরীসৃপের মত বিরাট পাথরের গায়ে আঘাত করে জল নিজের জলের দেশে ফিরে যাচ্ছে এমনই একটা আশ্চর্য আদি পৃথিবীরই নাদ যেন বেজে উঠক সুতীর্থের কথায়।

সেই জলের শব্দ শুনল জয়ন্তী।

কলকাতায় তোমার বাড়ি আছে, টাকা আছে, মানুষ আছে, যারা তোমাকে টানে।' সুতীর্থ বললে, 'গ্রামে গিয়ে বরাবর তুমি থাকতে পারবে না।'

'সুতীর্থ চুরুটের মুখের আগুনের দিকে তাকিয়ে নিল একবার—টানবার আগে। আস্তে আস্তে টানছিল।

মাঝে মাঝে এক-আধ মাসের জন্যে যদি আমি কলকাতায় আসি তাতে তোমার আপত্তি আছে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বললে।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু রেখে ঢেকে বলেছি সুতীর্থ?'

'আমাদের সঙ্গে গেলে দু-চারটে শর্ত আছে।'

'বললেই তো।'

সব শর্তগুলোর কথা কি বলেছি তোমাকে?'

'কেন? বলবার কি দরকার? এটা কি দুপক্ষের ব্যাপার।'

'তাহলে বুঝেছ তুমি সব।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষের গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেতর বুনো হাঁস-দম্পতির মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়ন্তীর বুকের ভেতর থেকে।

'গ্রামে গিয়ে আমি বিয়ে করব তো জয়তী'—সুতীর্থ চুরুটের আগুনের দিকে তাকাল আবার চুরুটটা অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে; জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেন, বিয়ে করবে কেন এত বয়সে?'

মাথার ওপরে দোতলার ঘরে ভুরর-ঠটক টক ঠক ঠট্রাক ট্রাক—শব্দ হচ্ছিল; কেউ চেয়ার টেবিল টানাটানি করছে মনে হল।

জয়তী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোনো কিছুতেই আপ্তবিশ্বাস ফিরে পাবে না তুমি। সেরকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ এ যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। খুব বিপন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।'

'তা চাইতে পারে, কিন্তু আপ্ত বিশ্বাস আমার নেই।'

'জানি, বললে তুমি কোনো রকম বিশ্বাসই নেই তো?'

সুতীর্থ হাল্কা চোখে আলো রোদের দিকে তাকিয়েছিল, চোখে গভীরতা আসছিল তার ক্রমে ক্রমে। জয়তী দেখছিল মস্ত বড় ঝাড়নটা পূর্ব দিকের দেয়ালে কাঠ হয়ে আছে; আনাচে কানাচে ময়লা আছে; অনেকদিন ঝাড় সাফ করা হয়নি।

পঁয়ত্রিশ

'আছে।' জয়তী বললে, 'না হলে ওরকম স্ট্রাইকটায় হাত দিতে যেতে না তুমি।'

'স্ট্রাইক। আমি তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় কাজ করতে সুতীর্থ?'

'সাপ্লাই কর্পোরেশনে।'

'কত মাইনে পেতে?'

'পাচশো।'

'আরো উন্নতি হচ্ছিল নাকি?'

'টাকাকড়ির? তা হত।'

'কেন ছেড়ে দিলে সব?'

'আমরা জোট পাকিয়ে পরিশ্রম করে মল্লিকদের ফার্ম দাঁড় করিয়ে দিলে ধনী-মানী লোকদের তো সুবিধে হবে, যারা না খেতে পেয়ে মরছে সে-সব কেরানী মজুর মাস্টার বেকারদের কোনো লাভ হবে না।'

'এই তোমার বিশ্বাস ?'

চুরুট খেতে গিয়ে—চুরুটটা ফেলে দিয়েছে মনে পড়ল সুতীর্থের। আর একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল, কোথায় রেখে দিল যেন তারপর দেশলাইটা জয়তীর কথা শুনেছে বলে মনে হলো না, চুরুট না টেনে বাইরের রৌদ্রের বড় ঝিলিকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ধন্য সত্য তোমার সুতীর্থ। অথচ সত্যে অবিশ্বাসীর বদনাম্ তোমার ?'

যে হাঁস আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার মত চোখে যে গহন জলে সাঁতার কেটে চলেছে মাঝগাঙের সেই গৃহ বলিভুক রাজ-হাঁসিনের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

নিবে গেছে চুরুট, সুতীর্থের চোখ দেশলাই খুঁজে ফিরছিল ; নেই ; আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সহজ চোখের পথে কোথাও নেই ; আচ্ছা পরে দেখা যাবে।

'কলকাতায় একটা লোককেও তুমি খুঁজে পাবে যে এ-জন্য পাঁচশো টাকার চাকরী ছেড়ে দেয় ?'

'কেন, তুমিই তো ছেড়ে দিচ্ছ জয়তী।'

'আমি ?' সুতীর্থের নেবা চুরুটটার দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে, 'তুমি দেশলাই খুঁজছিলে ? পেয়েছ ?'

'না।'

'কোথায় গেল দেশলাইটা ?'

'লাখ টাকার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ তো তুমি ; আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে বলছ। এত শ্রদ্ধা তোমার পৃথিবীর ওপর ? এত বিশ্বাস মানুষকে ?'

জয়তীর চোখ দেশলাই খুঁজছিল, কোনো কোণে খামচি—কোনো দিকে দেখতে পেল না সেটা।

'অথচ আমার কি মারাত্মক অবিশ্বাস দেখ। আমি জানি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।' বলে আস্তে আস্তে চুরুটটাকে মুখে তুলে টানতে গিয়ে সুতীর্থ টের পেল নিবে গেছে ; অনেক আগেই নিবে গেছে, দেশলাই খোঁজা হচ্ছে, এত সব ভুলে গিয়েছিল সে। দেশলাই পেল কি জয়তী ?

জয়তী রোদের ভেতর চোখ বুজে কেমন গাঢ় লাল বর্ণের সুধা স্রোতটাকে-

খানিকটা তিতোর মত অনুভব করে চোখ মেলে বললে, 'আমি এই ক্ষেমেশের বাড়িতেই থাকব তবে ?'

'থাকো। এ বাড়িটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, ইটের ওপর ইট চড়িয়ে বেশ গেঁথেছে, কিন্তু আমার মাটির দেয়াল হলেই হবে।'

'কোথায় ?'

গ্রামে। আজই চলো।'

'আজহ ?'

দেশলাইট খুঁজে পেয়েছে জয়ন্তী, দিই দিই করে সুতীর্থকে দেওয়া হল না। চুরুট নাই বা জ্বালাল সুতীর্থ। না; জ্বালাবার কোনো তাড়া নেই। দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'পেলে খুঁজে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিল ?'

'গদির কিনারে; ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।'

সুতীর্থ নেবাচুরুটের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ হবে না, তবে আজ-কালই যাব গ্রামে।'

'কোন গ্রামে যাবে ঠিক করেছ ?'

'স্টেশনে গেলে ঠিক হবে।'

'তা হবে। সব গ্রামই গ্রাম, একরকম অন্ধকার, একটা সম্ভাবনা, একই রকম শূন্যতা। আলোও আছে ?' জয়ন্তী বললে, 'সুতীর্থ, ওদিকে পাকিস্তান হচ্ছে নাকি ?—আমাদের যশোর খুলনা চাটগাঁ নোয়াখালির দিকে যাবে ?'

'চলো !' সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল জয়ন্তী হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দিচ্ছে। হাতের থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটি কি দুটি সন্তানের দরকার আমার।'

কোনো কথা বললে না জয়ন্তী; মুখের ভেতর তার কোনো ভাব নেই; যেন কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ কোনো কথা বলেনি যেন।

সুতীর্থ চুরুটের মুখের থেকে সাদা ঠাণ্ডা ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আচ্ছা থাক, কোনো দরকার নেই।'

'কেন ?'

'এক-আধটা চাষাভুষোর ছেলেকে আমাদের ঘরে এনে মানুষ করলেই হবে।'

চুরুট জ্বালাল সুতীর্থ।

জয়তী একটু হেসে বললে, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক চাষাভুষোর ছেলেগুলোকে নিজেদের ঘরে নিয়ে সন্তানের সাধ মেটাচ্ছে বুঝি? তাই যদি করে তাহলে আমরাও তা করব। কিন্তু না করে যদি তাহলে পৃথিবীর লোকেরা যা করে সেই নিয়মে চলব আমরা। সেই নিয়মে চলবে তুমি সুতীর্থ?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে খুব গভীর তো সেই নিয়ম—।' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুরুট হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?'

'পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীর সেই নিয়ম। কি যে গভীর। পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত ঋতু বাঁচব আমরা—তুমি আর আমি।'

জয়তীর মুখে একথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুতীর্থ, তারপর অন্য চিন্তা এল, সুতীর্থের মনে—অন্য ভাব; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'পৃথিবীটা আজকাল খুব খারাপ, আমার মতন মানুষের মন সেই পৃথিবীর মতই খারাপ। মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গিয়ে গ্রামে। আমরা একটু বড়—প্রামাণিক চাষা হব বলে, বেশি সাহস, বেশি বুদ্ধি, বেশি সহানুভূতি নিয়ে কাজ করব—যত বেশি লোকের জন্যে সম্ভব করব। কিন্তু কোনো নতুন সূর্য নতুন সমাজ আর পুরোনো সমাজের আকাট ভাঁওতার কেলেঙ্কারি থাকবে না আমাদের রক্তের ভেতর কোনো বিষ থাকবে না কোনো বিষ থাকবে না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে; কাজ করব, উপলব্ধি করব—সেবা করব—সন্তানেরা আসবে—শেখাব তাদের; ফুরিয়ে যাব পৃথিবীর থেকে।'

'এই তো পৃথিবীর কথা।' জয়তী বললে।

'না, পৃথিবীর কথা এর চেয়ে ঢের খারাপ।'

'সব সময় না; যা বলেছ তুমি এইরকম ভালো অনেক সময়—'

জয়তীর শরীরে রোদ এসে পড়েছে তার ভেতরে বসে থেকে সে বললে, বলে ভালো লাগল তার; কথা ভেবে, বলে, ভালো লেগেছে মুখে হাসি রয়ে গেছে তাই জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে এসেছি এবার; যা এত চেষ্টা করে পারনি এতদিন—আমি এসেছি বলে সব পারবে।'

শুনে মন খানিকটা আতস কাচের রোদের মত স্থিত, অক্ষুণ্ণ হয়ে এল, কাঁচে

পূর্ণ ফলিত হয়ে চলেছে, সুতীর্থ বললে, 'আমরা যদি পারি—' বলতে বলতে তবুও চুপ করে রইল সে।

'তুমি পৃথিবীকে ভালো মনে কর সুতীর্থ। আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাসী তুমি।'

'আমি?'

'কেউ তোমাকে বলেনি এই কথা এতদিনেও, তেমনভাবে বলেনি।' জয়তী নিজেকেই আস্তে আস্তে বলছিল যেন। 'জীবনের ভালো জিনিসগুলো আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ করাব।' বললে জয়তী—এত চাপা গলায়—যে একটা ফিসফিস শব্দ হল শুধু; নিজেকেই বলতে চাচ্ছিল জয়তী, আর কাউকে নয়। কিন্তু তবুও শুনতে পেল সুতীর্থ; বললে, 'আমাদের জীবন প্রমাণ নিয়ে নয়। প্রমাণ ট্রমান নিয়ে নয়। না।'

'তবে?'

'যে জিনিস নিজের থেকে হয় তাই নিয়ে।'

'কি জিনিস?'

বিরূপাক্ষের টাকাকড়ি, বাড়ি যা তুমি নিয়েছ তার কাছ থেকে, ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি আজ—' জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কি ফিরিয়ে দেবে?'

'দলিলপত্র সব।'

'তোমার নিজের হাতে টাকা আছে?' অনেকক্ষণ পরে বললে জয়তী।

'না। নেই।'

'কি করে চলবে তবে সব?'

সুতীর্থ হাসতে লাগল। 'আমি একা মানুষ। তুমি তো নেই জয়তী—সে সব গাঁয়ে। আমি একা তো।'

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও জয়তী বিরূপাক্ষের সব জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা সে রাখতে চাইল, আর বালিগঞ্জের বাড়িটা। এ বিষয়ে জয়তীর মতামত স্থির তো। আরো ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যে একমাস বা অনন্তকাল সময় চায় না সে; তাতে মত বদলাবে না। সে জানে তা; সুতীর্থও জানে। মানুষের জীবনের এইরকম সব ধরণ ধারণ, নির্ধারণ।

'সুতীর্থ, কিছু হাতে রেখে তোমার সঙ্গে চলি আমি;—তেমন বেশি কিছু

নয়, আমি বলছি তোমাকে—'

'তা হতে পারে না', সুতীর্থ বললে।

কিন্তু বিরূপাক্ষকে টাকাকড়ি সব ঝেড়েপুছে দিয়ে আপোসে আসতে হবে সুতীর্থের সঙ্গে? বিরূপাক্ষকে সেরকম করে সব ফিরিয়ে দিতে পারবে না জয়তী।

'তুমি ক্ষেমেশের এ বাড়িতে থাকো। ক্ষেমেশের ভাবে নয়—নিজের মনে। সেটা সম্ভব হবে। পাখিটাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘর-বার। যেন সব মানুষ পাখি হয়ে গেলে ভালো হত, স্বচ্ছমনের সাদা পাখি সব—' বলতে বলতে জানালা আলো বাতাস সূর্যে চমৎকার দিঙমণ্ডলের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

সুতীর্থ আবার দেশলাই হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় রেখেছে সেটা? নিবে গেছে চুরুট। নিজের সোফা জয়তীর সোফা চারদিকে তাকাচ্ছিল সে। পেল না দেশলাই। পেল না যে সেটা টের পেল না জয়তী; সে মেঝের দিকে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়েছিল।

দেশলাই উড়ে যায়নি, ছিল; খুঁজে পেল সুতীর্থ; চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'না, বিয়ে করব না আমি। শীতকালে গাঁয়ে একা থাকাই সব থেকে ভালো। একা থাকা। শীতকালে। পাড়াগাঁয়ে।'—চোখের সামনে যেন সবুজ ঘাস—ফর্সা ধুলোর পথ—ফসল—শীতের আমেজ—বিকেলের সূর্য দেখা যাচ্ছে—এমনিভাবে বলল সুতীর্থ। কিন্তু চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল তার; গ্রাম মানে—গ্রামের নাড়ীনক্ষত্র—যা অন্ধকারে ও হালকা ও মন্তর—সেই সব নিয়েই তার কাজ—যতদূর সম্ভব সঙ্গতি আনতে পারা যায়—সেইজন্যেই যাচ্ছে সে।

'ক্ষেমেশের এখানে আমি থাকব না।' জয়তী বললে।

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'বাবার ওখানে গিয়ে থাকব। আমি টিচারি করব।'

'ও—সুতীর্থ যেন লিকলিকে ট্রাম লাইনের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বললে, আচ্ছা উঠি জয়তী।'

'আজই তুমি গ্রামে যাবে?'

'হ্যাঁ, আজই।'

'আজই?' জয়তী কি যেন এক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পেয়েও পাচ্ছে না এমনি চোখে দেয়াল মেঝে চারিদিককার ঘাস গাছ পৃথিবীর মানুষের শেষ আশার মত সমস্ত সূর্যের পিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'জিনিসটিনিস কোথায় তোমার?'

'গাঁয়ে গিয়ে যোগাড় করব।'

'এখন বুঝি টিকিটের টাকা হাতে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

সুতীর্থ চলে গেল।

মানুষের চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। চোখ ঝলসে পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জয়তীর সূর্যের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু তবুও তাকিয়ে রইল সে; কোনো অশেষ প্রণিধান, অজেয় অমেয় স্থিরতা অমর আশা লাভ করবার জন্যে নয়; কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না—পৃথিবী বলছে, সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে—এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে;—কিন্তু পারছে না—সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার—।

ঠাণ্ডা হাত এসে লাগল জয়তীর চোখের ওপর। কারা যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে—ক্ষেমেশ—সঙ্গে কে—বিরূপাক্ষ—

কী করেছিলে জয়তী—সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলে যে!—'

ছত্রিশ

'আমি কিছু দেখছি না ক্ষেমেশ।'

'ঝলসে গেছে তোমার চোখ। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পারবে।'

'কে হাত রেখেছিল আমার চোখের ওপর?'

'আমি।'

'ওদিকে দাঁড়িয়ে কে?'

'রঞ্জন।'

'আর কে?'

'আর কেউ নেই।'

'ও—' না বিরূপাক্ষ নেই। এক ঝলক স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জয়তী?' খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসে ক্ষেমেশ বললে।

'ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একটু দেরি হবে—'

'তোমার তো গ্লুকোমা ছিল। ওরকম কটকটে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে জয়ন্তী—'

'আকাশে মেঘ করেছে ক্ষেমেশ ?'

'মেঘ ? না তো, খুব কড়া রোদ ; মেঘ নেই, খুব নীল।'

'ও—' জয়ন্তী বললে, 'হ্যাঁ, রোদ গায় লাগছে—কিন্তু—'

ক্ষেমেশ জয়ন্তীর গরম রসস্থ চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—সূর্যের দিকে—কয়েকটা পাখির দিকে তারপর। ভুলেই গিয়েছিল জয়ন্তী ঘরের ভেতরে বসে আছে ; অনেকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, তোমার খুব পুরু লেনস চাই।'

শাড়ির আঁচল মাটিতে পড়েছিল, উঠিয়ে নিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে জয়ন্তী বললে, 'অনেকদিন থেকেই চশমার দরকার। কিন্তু খুব পুরু না হলেও চলবে।'

'চশমা নাও নি কেন এতদিন ?'

'এইবারে নেব।'

'মোটা পাথর লাগবে তোমার।'

'কেন, আমি ছানি কাটিনি তো। পুরু লেনস কেন লাগবে ?'

'ছানি নয়—'

'চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার—'

'তারপরে অন্ধ হয়ে যায়।' ক্ষেমেশ বললে, 'এর কোন ওষুধ নেই জয়ন্তী ?'

'না। ক্ষেমেশ।'

'আমি ভাবছি কোনো ওষুধ আছে কিনা—'

'তোমার ঘড়িতে কটা ?'

'একটা বেজেছে।'

'আমি গ্রামে যাব ভেবেছিলাম।' জয়ন্তী বললে।

'সময় হলে যাবে—'

রঞ্জন চা নিয়ে এল।

'বড্ড রসিয়ে চা করেছি আজ—' রঞ্জন বললে, 'সুতীর্থবাবু গরম গরম চেখে গেলে পারতেন। এ জিনিস হবে কি আর কোনোদিন।'

চা সাজিয়ে রেখে রঞ্জন চলে গেল। চায়ের কাপ শেষ করে টিপইয়ের ওপর সরিয়ে রেখে ক্ষেমেশ খুব তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছছিল।

'লিপটন বুঝি ?'

'না খুচরো সব—এ পাতা সে পাতা মেশানো—কোথেকে বেছে আনে রঞ্জন।'

দুপুর। ফিকে নীল ছিল, এইবারে. গাঢ় নীল হয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ—কানায় কানায়; সাদা মেঘগুলো আরো বেশি সাদা, ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে।

দু'এক চুমুক খেয়ে জয়ন্তী আর চা খাচ্ছে না দেখে ক্ষেমেশ জয়ন্তীর পেয়ালাটা তুলে নিয়ে আকাশ রোদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল সব—কোথায় সে আছে, ওদিককার সোফায় কে বসে আছে—হাতের তার ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা জয়ন্তীর না তার নিজের। হঠাৎ তার মনে হল পেয়ালার ডাঁট খুব শক্ত করে ধরে আছে সে—পেয়ালার ভেতরে চা নেই আর। সমস্ত চা খেয়েছে সে? কখন খেল?

'আমার পাইয়োরিয়া আছে।'

'তোমার?' ক্ষেমেশ চোখ তুলে একবার তাকিয়ে বললে 'মাড়ির দাঁতে?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে। আমার মুখের চা তুমি না খেলেই পারতে।'

'চাই তো খাই আমি—বেছে বেছে মুখ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে।' হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে।

চারদিকে খুব বেশি নিঃশব্দতা। মেঝের ওপর দিয়ে মড় মড় করে এক চিলতি কাগজ বাতাসে উড়ছে—ঘুরছে—

'আমার পাইয়োরিয়া নেই—' জয়ন্তী চোখ তারিয়ে হেসে উঠে বললে। এবার সে আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখছে।

'একটা দাঁতে পোকা কুরছে। তামাকের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ভালো হবে—'

'খেয়ো দাঁতটা নড়ছে?'

'স্টপ করিয়ে নিলেও খাবে ক্ষেমেশ?'

'আর একটা দাঁত ধরবে।'

'আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না। কেন পোকা হচ্ছে?'

'তা হয়।'

'স্বভাব?'

ক্ষেমেশ উঠবে ভাবছিল; রঞ্জনকে বলে আসতে হবে—আরো চা করে দিতে।

কি জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ঠিক শুনতে পেল না ; উঠল না ; রঞ্জনকে কিছু বলবার দরকার নেই ভাবছিল ক্ষেমেশ, যা করবার নিজেই করবে ও, চা দিতে হলে দেবে।

দাঁতের কথা হচ্ছিল, স্বভাবেরও কথা, অন্য এক আধটা কথা মনে হল ; জয়তী বললে, 'কেউ আমাকে বলেনি যে মানুষের স্বভাব ভালো—তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে মানুষের—'

ক্ষেমেশ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, ঘরের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে টেনে বললে, 'এর পরে বলবে।'

'পরে ?—কবে ?—'

যে প্রশ্নের দুরকম উত্তর চলে আসছে অনেকদিন থেকে, সেইটে জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ; কোন উত্তরটা বেশি সত্য এখনও ঠিক করেনি ক্ষেমেশ ; তবুও এটা ঠিক যে এখন কিছু হবে না, পরে হবে ; ক্ষেমেশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের মৃত্যুর পরে।'

'কটা বেজেছে ?'

'চা খাবে ?'

'আমাদের মৃত্যু—আমাদের এই যুগের ?'

'আরো আসছে কয়েকটা যুগের—'

'ও—' জয়তী বললে, 'কিন্তু তখনও ক্ষেমেশের মত হয়তো কেউ বলবে, এখনও হল না, আরো কয়েক যুগ পরে হবে।'

'বুঝেছ তুমি।' বলে ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চশমা খুলে নিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল : 'একেই জ্ঞানা বলে,' বোজা চোখের ওপর আঙুলের আলতো চাপ রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'কিন্তু তবুও তুমি জ্ঞানী নও।'

'জ্ঞানীর দুঃখ সুতীর্থ অনুভব করেছে ? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছি না।' বলতে বলতে চশমা পরে নিল ক্ষেমেশ।

'ওর কথা আর না বলাই ভালো।'

'কেন ?'

'কেন নেই।' জয়তী বললে, 'চায়ের কথা বলেছিলে—'

চায়ের জল চাপিয়েছে হয় তো রঞ্জন।

সুতীর্থ স্টেশনে পৌঁছে গেছে ? পূর্ববঙ্গের দিকে যাবে হয় তো ; আসামের দিকে যাবে, নাকি ঢাকার দিকে, না খুলনা রূপসা পেরিয়ে—

'মৈত্রেয়ীর কথা মনে হচ্ছে আমার—' জয়তী বললে, 'তোমার কাছে উপনিষদ আছে ?'

'না। চায়ে মাঝে মাঝে বেশি মিষ্টি দেয় রঞ্জন। কিন্তু সব সময়ই দেখছি তোমার মিষ্টির হাত ঠিক থাকে—'

'কেউ কেউ বিনে চিনিতে চা খায়—'

'আমি নেবুর রস দিয়ে চা খাচ্ছি মাঝে মাঝে—বেশ ভালো লাগছে।'

'নেবুর রস দিয়ে কাঁচা চা ? চিনি নেই ?'

জয়তী কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে বললে, 'সুভাষ বোস কি সত্যিই নেই আর ক্ষেমেশ ?'

'হ্যাঁ, কালো রঙের চা ; চিনি কম ; মৈত্রেয়ীর কথা কেন মনে পড়ল তোমার জয়তী ?'

'নেবুর রস দিয়ে চা বানিয়ে দেখিনি কোনোদিন আমি।'

'কিছুই না—শুধু নেবুর রস দিয়ে চা বানানো।'

'সহজ—কিন্তু নেবুর রস উনিশ-বিশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চা।'

'তোমার হাতে চায়ের চিনির কোনো উনিশ-বিশ হয় না তো জয়তী ; কেন নেবুর রসের হবে ?'

'কটা বেজেছে ক্ষেমেশ ?'

কিন্তু ক্ষেমেশ ঘড়ি না দেখে দূরে পাঁচিলের শ্যাওলার দিকে তাকিয়েছিল ; সবুজ মখমলের মত পুরু হয়ে উঠেছে ; রোদ এসে পড়েছে।

'এটা কার চুরুট ?'

'সুতীর্থ ফেলে গেছে—'

ক্ষেমেশ বললে, 'আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি !'

ক্ষেমেশ চুরুট খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোনো কথা বলবার ছিল না জয়তীর।

'চুরুটের মুখে সাদা ছাই জমেছে সেগুলো—'

'সেগুলো ? ফেলে দেব না আমি—যদি নিজের থেকে পড়ে না যায়।'

'নিজের থেকেই পড়ে যাবে—কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে।'

'ও'—ক্ষেমেশ বললে।

'ব্যাঙ্কে যাবার সময় আছে ?'

'না—' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে। 'ব্যাঙ্কে যেতে তুমি জয়তী ?'

'দরকার ছিল—'

'আগে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন আজই উঠে যাবে বুঝি সব, কোনো ব্যাঙ্ক থাকবে না আর কাল?'

ক্ষেমেশ চশমা খুলে মুছছিল, মুছতে মুছতে বললে, 'যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাদের অদল-বদল হবে খানিকটা; কিন্তু মানুষের হাতে টাকার কোনো মানহানি হবে না কোনোদিন। জান তুমি। খুব জ্ঞানের কথা আর শান্তির কথা এইসব।'

চশমা মুছে ঠিক করেছে, পরল ক্ষেমেশ।

'আমিও তাই বলছিলাম ক্ষেমেশ। বেশ শান্তিতে আছি। আজো আমাদের চীনের মত অবস্থা হয় নি।'

'প্রথমে দেশ স্বাধীন হবে।'

'তারপরে?'

'চীনের মত অবস্থা? ভাবছি আমি তাই। কিন্তু কি হবে চীনের মতন হলে? যারা মানুষকে মেরেছে সেই সব মানুষ শায়েস্তা হবে হয় তো। কিন্তু টাকা মার খাবে না কোনোদিন। এই দেবতাই ব্যাধি। মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।'

'কিন্তু প্রতিটি শতকই আশা করে যে এইভাবে জ্ঞান হবে। চীন কি আশা করছে না? তোমার চুরুট নিবে গেছে ক্ষেমেশ—' কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত। গিয়েছে। মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই থাক টিপাইয়ের ওপর—এখন জ্বালাব না আর।'

'আমরা আশা করছি? সুতীর্থ নিজে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই জ্ঞান নিয়ে ঘাস গজাতে গেল—' জয়তী বললে, 'আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী তাই সুতীর্থ আমরা দু'একদিনের হিসেবে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি ও হাজার বছরের হিসেবে।'

'খানিকটা চাপা আগুন রয়েছে চুরুটের ভেতর, এখুনি নিবে যাবে।' চুরুট হাতে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'জ্বালাবে?'

'তুমি উঠলে—?'

'হ্যাঁ, এইবারে—'

জয়তী আস্তে অত্রস্তভাবে বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?' ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষের ওখানে নয় ; সুতীর্থের কোনো ঠিকানা নেই—'

'না। বাবার ওখানেও যাব না আর ; আমি নিজে কিছু কাজ করব, নিজে যা ভালো বুঝি সেই হিসেবে।'

'কি কাজ ?'

'এই যে তোমার চুরুট—'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'দেশলাই পাচ্ছ না ক্ষেমেশ—'

'কাজ নিয়ে কলকাতায় থাকবে ?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে গ্রামে যাবার দরকার নেই। আমার কাজ অন্যরকম ; একজন মানুষের নিয়ে শুধু, কিন্তু তবুও সাজ করতে সময় লাগবে—'

'ও—' জয়তীর হাত থেকে দেশলাই তুলে নিল ক্ষেমেশ।

'বিরূপাক্ষের বাড়ি টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দেব। আজই ফিরিয়ে দিলে ভালো হত—কিন্তু কোনোদিন দিতে পারব কিনা সেই নিয়েই সংগ্রাম—একজন মানুষের ; সাহায্য করবার কেউ নেই ; এতে সমাজের কোনো উপকার হবে না, পৃথিবীর তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমার নিজের উপকার হবে। মানুষের জীবনের ওপর এখন মানুষদের নানারকম দাবি ; কিন্তু আমি টাকাওলা মানুষ বলে এই একটা পরীক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সুযোগ আমার আছে। তাড়াতাড়ি এর একটা রফা হতে পারলেই ভালো হয় ; অন্য কাজ করবার অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু জানি না কতদূর কি হবে। হয় তো সত্তর বছর টাকাকড়ি আঁকড়ে থাকতে পারি—হয়তো সত্তর দিন'—জয়তীর চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এখন। 'দেশলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে ক্ষেমেশ—'

'সুতীর্থের সঙ্গে এই সব কথা হয়েছিল বুঝি তোমার ?'

ক্ষেমেশ বললে ; মেঝের ওপর দেশলাইটার দিকে তাকাল সে, তুলল না।

'চীন আমাদের চেয়ে বেশী জেগে উঠেছে।' বলে বাঁ-হাতি জানালার শার্সিগুলোর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ। রোদ ছিল ওখানে, নেই এখন আর।

'তা হতে পারে—'

'সমস্ত এশিয়াই জেগে উঠবে।'

'কিন্তু কিরকমভাবে ? কি হিসেবে ?—'

'সেটা ভারতবর্ষ স্থির করবে ? ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এই বেলা বোধ হয় ভারতবর্ষেরই স্থির করা উচিত। কিন্তু এ সব আন্দোলন থেকে আমি ঢের দূরে সরে রয়েছি।'

'আন্দোলনও এখনও ঢের দূরে। চীন আজকাল দুঃখের দেশ। অবশ্য পুরস্কার পাবে শীগগিরই—আমার মনে হয়। কিন্তু রাশিয়ার হাতে পুরস্কার না নিলেই ভালো হত—' জয়তী বললে।

একটু থেমে বললে, 'মানুষের খাঁটি মঙ্গল মানুষের হাতে মানুষ যদি নেয়—আমার বলবার কিছু নেই অবশ্য তাহলে—'

'চীনের নিজেরও 'আত্মা আছে।' জয়তী বললে।

'ছিল একদিন।'

'আমাদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক হয়ে যাবে হয় তো।'

জয়ন্তী বললে, 'চীন রাশিয়ার কাছ থেকে কি নিচ্ছে—রাশিয়া ভারতের কাছ থেকে কোন জিনিস—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না তখন। কিন্তু খুব দেখিতে হবে এ সব জিনিস—যদি হয়। আমাদের মাথা ব্যথা সত্যিই রাশিয়া বা আমেরিকা বা অন্য কেউ—কে আমাদের বিপদগ্রস্ত করবে তাই নিয়ে। কেমন একটা অন্ধকারের যুগে আছি আমরা—'

'রাশিয়া আলো পেয়েছে, চীন পাচ্ছে তার কাছে। আমেরিকা নিজেই আলোকিত।' বলে, চশমাটা খুলে ফেলল ক্ষেমেশ; চশমার পাথরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে—তাকিয়ে দেখছিল।

'ভারতবর্ষও'—জয়তী হেসে বললে, 'অন্ধকারটা এইরকম।'

মেঝের থেকে কুড়িয়ে ক্ষেমেশের হাতে দেশলাই তুলে দিয়ে জয়তী বললে, 'এটা খেয়ো, চুরুট; এক বাক্স ভালো কিনে নিও তুমি।'

দেশলাই নেবার সময় জয়তীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর আটকে নিবিড়ভাবে চেপে দিল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘনিয়ে এসে ক্ষেমেশের হাত তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে গেল।

চুরুট জ্বালাল ক্ষেমেশ।

জয়তী চলে গেল।

সমাপ্ত